প্রসঙ্গ ডেভিড হেয়ার

বিনয়ভূষণ রায়
সংকলিত ও সম্পাদিত

অঙ্কুর প্রকাশন
কলিকাতা

Prasanga David Hare
A Collection of Essays etc. on David Hare

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ১৯৬০

প্রকাশিকা
শ্রীমতী মীরা কর
অঙ্কুর প্রকাশন
সি ৭, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

পরিবেশক
ইন্ডিয়ান বুক মার্ট
১২/১বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট (দ্বিতল)
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
শ্রীঅরুণকুমার রায়
শ্রীকমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫৪/১বি, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৪

প্রসঙ্গ ডেভিড হেয়ার

নিবেদন

বাংলাদেশে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, সীমাবদ্ধ হলেও, যে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল তার মূলে ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিঘাত। সেকালে যাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের কর্মকাণ্ডে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন ডেভিড হেয়ার তাঁদের মধ্যে নানা কারণেই বিশিষ্ট। তাঁর মতো সর্বস্ব উজাড় করে কেউ এ-কাজে এগিয়ে আসেননি। তাঁর জীবনের ধ্যান-জ্ঞান সবকিছুই ছিল এদেশের ছাত্রসমাজকে ঘিরে। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনে তারা যাতে য়ুরোপীয়দের সমকক্ষ হতে পারে, অগ্রগামী পৃথিবীর সমতালে চলতে পারে এই ছিল তাঁর একমাত্র অন্বিষ্ট। হিন্দু কলেজ, মেডিকেল কলেজ, স্কুল সোসাইটি, স্কুল বুক সোসাইটি, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, এগ্রি-হর্টি-কালচরাল সোসাইটি, এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি—সেকালের কলকাতার নানা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় ছিল সেই মানুষটির নিয়ত উপস্থিতি পেশায় যিনি ছিলেন ঘড়ির ব্যবসায়ী, হৃদয় যাঁর ছিল বাঙালি মায়ের মতো স্নেহপ্রবণ।

শুধু বিদ্যাচর্চায় নয় এদেশে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষেও তাঁর সহযোগী ভূমিকার কথা অনস্বীকার্য। প্রয়োজনে শাসকশ্রেণীর বিরোধিতা করতেও পিছপা হননি তিনি। যেমন, প্রেস আইনের বিরুদ্ধে সভা, জুরির বিচার চালু করার দাবিতে সভা, বিলাতে আপিলের অধিকার হরণের বিরুদ্ধে সভা, সরকারি দপ্তরে ও আইন-আদালতে ইংরেজি ভাষা প্রচলনের সপক্ষে আন্দোলন, বিদেশে কুলি চালানের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রভৃতি।

এদেশের মানুষকে তিনি ভালোবেসেছিলেন, এদেশের মানুষও তার প্রতিদানে পশ্চাৎপদ হয়নি। মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার নানা প্রচেষ্টা তারা করেছিল।

ডেভিড হেয়ারের জীবন ও কর্মকাণ্ড এবং তাঁর স্মৃতিরক্ষার বিচিত্র সব প্রয়াসের বিবরণ পুরনো পত্রিকার কালজীর্ণ পৃষ্ঠা থেকে এই গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে। একালের যুবসমাজকে সেই বিচিত্রকর্মা মানুষটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

এই গ্রন্থে সংকলিত প্রথম প্রবন্ধটিতে আমরা ডেভিড হেয়ারের বহুমুখী কর্মপ্রয়াসের বিবরণ সংগ্রহ ও মূল্যায়নের প্রয়াস করেছি। স্মৃতিরক্ষা অংশে সংকলিত হয়েছে বিভিন্ন সংবাদপত্রে মুদ্রিত সংবাদ। স্মারক বক্তৃতাগুলিও বিভিন্ন সাময়িকপত্র থেকে সংগৃহীত। স্মারক গ্রন্থ অংশে নমুনা হিসাবে

দুটি পুস্তিকা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। ডেভিড হেয়ার প্রাইজ এসে হিসাবে অন্য যে-সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি হল :

১ অধ্যাত্মবিজ্ঞান—শিবচন্দ্র দেব, ১৮৬৭

২ মহিলাবলী—গোপীকৃষ্ণ মিত্র, ১২৭৪

৩ বামা রচনাবলী—বামাবোধিনী পত্রিকায় পকাশিত রচনার সংকলন

৪ নারী শিক্ষা (২ খণ্ড), ১২৭৫

পরিশিষ্টে প্রকাশিত প্রবন্ধ দুটির মধ্যে পূর্ণচন্দ্র দের প্রবন্ধটি মূল রচনার প্রয়োজনীয় অংশের পুনর্মুদ্রণ। লেখক পরিচিতি অংশে নবকৃষ্ণ ঘোষের (১৮৬৮-১৯৪১) পরিচিতি দেওয়া সম্ভব হয়নি। ইনি প্যারীচরণ সরকার, দ্বিজেন্দ্রলাল ও বিহারীলাল চক্রবর্তীর জীবনী লেখেন। এছাড়া ১৩ খানি উপন্যাস, ২টি গল্পসংকলন, ২টি শিশুপাঠ্য বই এবং 'তর্পণ' নামে একটি সনেট সংকলনও আছে

এই গ্রন্থ প্রকাশে শ্রীঅশোক উপাধ্যায় যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। নির্দেশিকা তৈরি করেছেন শ্রীমতী সীমা মুখোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ও জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী ও কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় আনুকূল্য পেয়েছি। বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী সুপ্রিয়া গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবিমল সমাদ্দার ও শ্রীসীতারাম মাঝি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রীশঙ্করলাল ভট্টাচার্য। এঁদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

'প্রসঙ্গ ডেভিড হেয়ার' গ্রন্থের প্রচ্ছদ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এঁকে দিয়েছেন শ্রীমান শমীন্দ্র ভৌমিক, তাঁর কল্যাণ কামনা করি। বইটি প্রকাশের ভার নিয়ে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন সদ্যোজাত 'অঙ্কুরের পরিচালক শ্রীঅনিল কর' তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

বিনয়ভূষণ রায়

প্রয়াত প্রমথ চন্দের স্মরণে

এই লেখকের অন্য বই ঃ

স্যার যদুনাথ রচনাপঞ্জী

শিক্ষাসংস্কারে বিদ্যাসাগর ও বর্ণপরিচয়

বাংলায় সতীদাহ ঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন

উনিশ শতকের বাংলায় বিজ্ঞান সাধনা

The Socio-Economic Impact of Sati in Bengal and the Role of Raja Rammohan Roy

সূচি

বিচিত্রকর্মা ডেভিড হেয়ার

উনিশ শতকের গোড়া থেকেই বাংলা তথা ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের চিন্তাভাবনা শুরু হয়। তার আগে এদেশে শিক্ষা দেওয়া হত যে পদ্ধতিতে তা ছিল দু'রকম প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চবৃত্তিগত শিক্ষা। বাড়ির বয়স্ক ব্যক্তি অথবা পাঠশালার গুরুমহাশয়দের কাছে শিশুরা এই শিক্ষা গ্রহণ করত। তখন প্রতি ভদ্রগ্রামে একটি পাঠশালা থাকত। পাঠশালায় ভর্তি হওয়ার আগে কোন শুভদিনে 'হাতেখড়ি' দিয়ে শিশুদের 'বিদ্যারম্ভ' হত। হাতেখড়ির পর প্রথমে বালি অথবা মাটিতে আঁক কেটে তারা অক্ষর ও সংখ্যা লিখতে এবং চিনতে শিখত। কিছুদিন এভাবে অভ্যাস করার পর কলাপাতায় খাগের কলম ও কালি দিয়ে একই অক্ষর বারবার লিখে রপ্ত করতে হত। হাতের পেশী ও শিশুর চঞ্চল মনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। তারপর ক্রমে ক্রমে তালপাতা ও কাগজের উপর লিখতে হত।[১] সে সময়ে এদেশে ছাপাখানা ছিল না। অপরদিকে পুঁথি নকল করাও ছিল ব্যয়সাধ্য। ফলে এইসব পাঠশালায় কোন ছাপা বই অথবা হাতে লেখা পুঁথির প্রচলন ছিল না। পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের কাছে অক্ষর ও সংখ্যা লেখা শেষ করে শিশুরা বিভিন্ন স্বরবিশিষ্ট বাক্য লিখত এবং 'শুভংকরী', 'আর্যা', ও নামতা মুখস্থ করত। এরপর উচ্চবর্ণের ছাত্ররা সংস্কৃত পড়ার জন্য টোলে যোগ দিত অথবা ফার্সি শিখত। কারণ ফার্সি শিখলে সে-সময়েও আদালতে চাকরি পাওয়া যেত।[২] এ দুটি পথ যারা অনুসরণ করতে পারত না, জমিদারের কাছারিতে কাজ করার জন্য বা বিভিন্ন দোকানের খাতা লেখার জন্য তারা শিখত চিঠিপত্র লেখা ও হিসাব-নিকাশ করার কাজ।[৩] এভাবে অনেকেই বংশগত অথবা অপর কোন বৃত্তিতে যোগ দিত।

এই পটভূমিতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের প্রয়োজন হল কেন? এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা নানাভাবে দেওয়া যেতে পারে। যেমন, (১) ধর্মান্তরকরণের উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন মিশনারি সম্প্রদায় এদেশে আসে এবং খ্রীস্টধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে দেশীয় ব্যক্তিদের কাছে বাধা পায়। ঐসব মিশনারিদের মধ্যে অনেকেই তখন ভারতবাসীর মনের কুসংস্কার দূর করার জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের দিকে দৃষ্টি দেয়। কেননা তারা মনে করত খ্রীস্টধর্মের মাধ্যমেই যে-কোন মানুষের পক্ষে প্রকৃত মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তারা মনে

করত পাশ্চাত্য শিক্ষা পেলে দেশীয় ব্যক্তিদের মন থেকে অন্ধ কুসংস্কার দূর হয়ে যাবে এবং তারা তাদের মুক্তির পথ খুঁজে পাবে অর্থাৎ খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করবে।

(২) বিদেশী বণিকদের সংস্পর্শে এসে দেশীয় সমাজের এক অংশ অর্থকরী দিক থেকে লাভবান হন। সেই লাভের মাত্রা এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁরা ইংরেজি শিখতে আগ্রহী হন। এঁদের উদাহরণে উৎসাহিত হয়ে এবং বিচার ও শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র কলকাতায় স্থাপিত হওয়ায় দেশীয় সমাজের অনেকে ইংরেজি শিখতে উৎসুক হন। কিন্তু মফস্বলের আদালতে ১৮৩৫ পর্যন্ত ফার্সি ভাষার প্রচলন থাকায় সেখানকার জনসাধারণ ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেনি। পরবর্তীকালে আদালতে ফার্সি ভাষার পরিবর্তে ইংরেজির প্রচলন হওয়ায় সুদূর মফস্বলেও ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়।

(৩) প্রথম প্রথম বিদেশী সরকার নিরপেক্ষতার ভান করে এদেশের সামাজিক আচার, ব্যবহার, শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। পরবর্তীকালে অবশ্য তারা এ-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ, (ক) মিশনারিরা এদেশে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল, কিন্তু ১৮১৩-র আগে কোন মিশনারিকে কলকাতায় বসবাসের সুযোগ দেওয়া হত না। তাই কলকাতায় বসবাসের সুযোগ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী অর্থব্যয়ের দাবিতে তারা ইংলন্ডের পার্লামেন্টে অনবরত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। এর ফলে সরকার মিশনারিদের ইংরেজ-শাসিত ভারতে বসবাসের সুযোগ দিতে এবং শিক্ষার জন্য বছরে এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করতে বাধ্য হন।

(খ) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন এদেশে শাসনভার গ্রহণ করে তখন এখানে কৃষিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা চালু ছিল। অপরদিকে শিল্পবিপ্লব ইংলন্ডের সমাজব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে। সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য শাসকেরা বাধ্য হয়েই এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন করে। কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন না করলে ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশকে শাসন করা ইংলন্ডের পক্ষে সম্ভব হত না। এই ব্যাপারে ডেভিড হেয়ারই ছিলেন তৎকালীন সরকারের প্রধান সহায়ক। রামমোহন, আলেকজান্ডার ডাফ ইত্যাদি আরো অনেকেই যদিও সে-সময়ে ইংরেজি শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু কর্মকুশলতা, সক্রিয়তা ইত্যাদি বিভিন্ন দিক দিয়ে এঁরা কেউই ডেভিড হেয়ারের সমকক্ষ ছিলেন না।

১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডে ডেভিড হেয়ারের জন্ম হয়। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলকাতায় আসেন এবং ঘড়ির ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন। কলকাতায় তখন এই ব্যবসায় তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হন। ব্যবসায় নিয়োজিত হয়ে হেয়ার সন্তুষ্ট ছিলেন না। ব্যবসাসূত্রে এদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন এবং তাঁদের মাধ্যমে এইদেশীয় সমাজ ও অধিবাসীদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানলাভ করেন। ফলে ভারতীয় সমাজ ও ভারতবাসীদের সম্পর্কে তাঁর সহানুভূতির মাত্রা ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে। তিনি মনে করতেন ভারতে সমস্ত কিছুই উৎপন্ন হয়, সম্পদেরও কোন অভাব নাই, এখানকার লোকেরা বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী এবং যোগ্যতার দিক থেকে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশের লোকেদের সমকক্ষ। তবে বহুদিনের অত্যাচার ও কুশাসনের ফলে তাঁরা তাঁদের শিক্ষা ও দর্শনকে হারিয়ে ফেলে সম্পূর্ণ অন্ধকারে নিমগ্ন হয়েছেন। সুতরাং এদেশের উন্নতির জন্য জনসাধারণকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।[৪]

কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানই তখন কলকাতায় স্থাপিত হয়নি। ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে কিছু কিছু ইংরেজি শব্দের অর্থ মুখস্থ করতে পারলেই দেশীয় ব্যক্তিদের কাজ চলত।[৫] গুটিকয়েক ইংরেজি শব্দ শিখে বিদেশী বণিক ও শাসকের সংস্পর্শে এসে অর্থাগমের পথ সহজ করে কর্মস্থল থেকে বাড়িতে ফিরে জামাকাপড় ছেড়ে এবং হাত-পা ধুয়ে ম্লেচ্ছসংসর্গদোষ কাটানো যেত। এইভাবে তাঁরা 'শ্যাম ও কুল' বজায় রাখতেন। অর্থোপার্জনের বৃদ্ধি অনুসারে সামাজিক প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পেত। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য একটি পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা হেয়ার উপলব্ধি করেন।

সেজন্য ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে ঘড়ির ব্যবসাটি সহকর্মী এডওয়ার্ড গ্রের কাছে বিক্রি করে[৬] তিনি এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যখনই দেশীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে এদেশের উন্নতির উপায় নিয়ে আলোচনা হত, তখনই তিনি ছাত্রদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের আবশ্যকতার কথা বলতেন। রামমোহন ও তাঁর বন্ধুদের একটি সভাতেও অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। ঐ সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মূর্তিপূজা লুপ্ত করার জন্য একটি সমিতি গঠন করা। হেয়ার ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করে তিনি মন্তব্য করেন, প্রস্তাবিত সমিতি গঠনের চেয়েও একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করা আশু প্রয়োজন।[৭] কারণ শত প্রচারের মধ্যে দিয়েও বয়স্ক ব্যক্তিদের মন থেকে মূর্তিপূজার চিন্তাধারাকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। সেজন্য তিনি ছাত্রদের বেছে নেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের মনে যুক্তিবাদী চিন্তার আবহাওয়া যদি সৃষ্টি করা যায় তাহলেই তারা মূর্তিপূজার অনাবশ্যকতা বুঝতে পারবে। মনে হয়, হেয়ার পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না; একমাত্র শিক্ষার প্রভাবকেই প্রাধান্য দিতেন। যাইহোক কোন বিষয় সম্পর্কে শুধুমাত্র চিন্তা করেই তিনি চুপচাপ বসে থাকতেন না। সেই চিন্তাকে কাজে পরিণত করার জন্যও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাই ঐ সভায় তাঁর মত প্রকাশ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও বিচারপতি স্যার হাইড ইস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি হিন্দু কলেজ স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হন। শুধুমাত্র রামমোহন ও তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিলেই ইংরেজি স্কুল বা কলেজ স্থাপন করা সম্ভব হবে না হেয়ার একথা ভালোভাবেই জানতেন। রক্ষণশীল সমাজের সম্মতি আদায় করাও যে প্রয়োজন তাও তিনি বুঝতেন। কারণ, তৎকালীন দেশীয় ব্যক্তিদের দলাদলির সঙ্গে তিনি ভালোভাবেই পরিচিত ছিলেন। রামমোহন রায়ের সঙ্গে যেমন সনাতনপন্থীদের বিরোধ ছিল তেমনি সনাতনপন্থীরাও তখন বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল।

বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য কলকাতার দেশীয় ব্যক্তিরা ১৮২৩-এ নেটিভ লিটারারি সোসাইটি (Native Literary Society) স্থাপন করেন। রামকমল সেন এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর সোসাইটির সম্পাদক পদ অলংকৃত করেন। রামদুলাল সরকার ও রাধাকান্ত দেবের মত ব্যক্তিরাও প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ঐ সভা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বই বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৮] দেশীয় ব্যক্তিদের নৈতিক উন্নতির জন্য বাংলা ও ইংরেজিতে ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশের পরিকল্পনাও ঐ সভায় গৃহীত হয়। যতদিন পর্যন্ত নিজস্ব বাড়ি না হয়, ততদিন সোসাইটি হিন্দু কলেজে সভা করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং নিজেদের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে একখানি ইস্তাহারও ওই সভার পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়।

সেই ইস্তাহারের বক্তব্য নিম্নরূপঃ জ্ঞান-পিপাসা ও পরোপকারিতায় প্রাচীন ভারতবাসীরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। মনুষ্য বসতির পক্ষেও এই অঞ্চলই ছিল সবচেয়ে উপযুক্ত। এখানকার লোক ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী, সক্রিয়, দয়ালু ও জ্ঞানী। এর ফলস্বরূপ জনসাধারণ সুখী, স্বাধীন এবং সম্মানজনক কর্মে নিযুক্ত থাকত। কিন্তু বিভিন্ন কারণে হিন্দু রাজত্বগুলি ধ্বংস হওয়ায় হিন্দুরা নিজেদের শিক্ষা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে অতিশয় আত্মাভিমানী, আবেগপ্রবণ, জ্ঞানবিমুখ ও স্বার্থান্বেষী হয়ে পড়েন। তাই তাঁরা পর-নির্ভরশীল হয়ে যান এবং তাঁদের সম্মান হ্রাস পায়, দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধি পাওয়ায় অত্যন্ত হীন জীবন-যাপনেও তাঁরা অভ্যস্ত হন। অন্যান্য জাতির তুলনায় সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় তাঁরা অত্যন্ত

পিছিয়ে পড়েন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে অনেক অসার প্রথা হিন্দুসমাজে প্রবেশ করায় তাঁদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিই হল এর অন্যতম কারণ।

(ক) সামাজিক ও পারস্পরিক মেলামেশার সুযোগের অভাব,
(খ) পারস্পরিক ঐক্যের অভাব,
(গ) দেশভ্রমণের বাধা,
(ঘ) বিভিন্ন শাস্ত্রপাঠে অনিচ্ছা,
(ঙ) জ্ঞানলাভে অনীহা,
(চ) পারস্পরিক সদিচ্ছার অভাব,
(ছ) ধনীদের মধ্যে আলস্যের জন্ম এবং অতৃপ্ত ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করার ইচ্ছা,
(জ) পদ-মর্যাদার প্রশ্ন, জাতিভেদ এবং পারিবারিক সম্পত্তির উপর নির্ভরশীলতা, তার ফলে সমাজের মধ্যে অনেক দোষ প্রবেশ করে। উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিরা নিজের প্রয়োজন ব্যতীত অন্যদের সঙ্গে খুব অল্পই মেলামেশা করতে থাকেন। আবার যাঁরা তাঁদের সঙ্গে বাধ্য হয়ে মেলামেশা করতে চান, তাঁদের সঙ্গেও তাঁরা কদাচিৎ আন্তরিক ব্যবহার করতেন। স্বার্থসিদ্ধিই মেলামেশার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়।

তাই নেটিভ লিটারারি সোসাইটি যৌথভাবে জ্ঞান প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পদমর্যাদাসম্পন্ন ও ধনী দেশীয় ব্যক্তিদের কাছে আবেদন করে।[৯] এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের জ্ঞানপিপাসার বৃদ্ধি এবং উন্নতি ঘটানো।

এই প্রচেষ্টাটি কিন্তু মোটেই সাফল্যলাভ করেনি। আবেদনটি প্রচারিত হওয়ার কয়েকমাসের মধ্যেই কিছু ব্যক্তি লিটারারি সোসাইটির অনুরূপ আরেকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং তাঁরাও আরেকটি আবেদন-পত্র প্রচার করেন। দীর্ঘ বিশ বছর ধরে বাঙালি হিন্দুসমাজের প্রতি খ্রীস্টান মিশনারিদের কি রকম ব্যবহার ছিল তা ব্যাখ্যা করে দ্বিতীয় আবেদন-পত্রটি রচিত হয়েছিল। নিজ ধর্ম ত্যাগ করে যে-সব দেশীয় ব্যক্তি খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন তাঁদের দুর্গতির কথা প্রচার করাই এই আবেদনপত্রটির মূল উদ্দেশ্য ছিল।[১০] এর কিছু কিছু অংশ এখানে আলোচনা করা হল।

সোসাইটির মতে, দেশীয় ব্যক্তিদের শাস্ত্র, দেবতা ও নিয়ম-কানুন সম্পর্কে খ্রীস্টান মিশনারিদের সঠিক ধারণা নেই। সেজন্যই সমস্ত পৃথিবীতে বিক্ষিপ্তভাবে প্রচারিত (হিন্দুধর্মের অংশবিশেষের অনুবাদ সহ) তাঁদের আক্রমণাত্মক প্রচার পুস্তিকাগুলি ভুলে ভরা।

উপরন্তু ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও অন্যান্য হিন্দুদের উপেক্ষা করে তাঁরা দেশের অভ্যন্তরে যথেচ্ছভাবে ঘুরে বেড়ান, প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে হিন্দু-শাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচার করেন, ইউরোপীয়দের ভয়ে ভীত ব্যক্তিদের সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে বিতর্কমূলক আলোচনা এবং তাঁদের সঙ্গে ভয়ানক অপমানজনক ব্যবহার করেন। আওরঙ্গজেব, হুমায়ুন এবং অন্যান্য মুসলমান ও ম্লেচ্ছ রাজারা বেদ, স্মৃতি ও অন্যান্য শাস্ত্র সম্পর্কে যেরকম মন্তব্য প্রকাশ করতে কখনো সাহস করেনি, এঁরা হিন্দুধর্মে আঘাত হানার জন্য ঐ সমস্ত ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে সেইসব মন্তব্য করে থাকেন। দেশীয় ব্যক্তিদের যন্ত্রণা দেওয়া ও অপমান করার জন্যই তাঁরা ঐসব গ্রন্থ থেকে স্ব-মত বিরোধী অংশগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে অনুবাদ করেন। হিন্দুদের বিশ্বাস ও শিক্ষাকে ধ্বংস করে তাদের কুপথগামী করার জন্যই তাঁরা বিভিন্ন ভাষায় বাইবেলের অংশবিশেষ অনুবাদ করে এবং ছাপিয়ে বিভিন্ন মেলায়, বড় রাস্তার ধারে ও অন্যান্য স্থানে বিনা পয়সায় বিতরণ করেন।

অবশেষে নিম্নশ্রেণীর কিছু লোককে, সত্য ও মিথ্যা সম্পর্কে যাদের ধারণা নেই, কিছু প্রাপ্তির লোভ দেখিয়ে খ্রীস্টান হওয়ার জন্য তাঁরা প্রলুব্ধ করেন। হিন্দুধর্মকে গালাগালি দেওয়ার জন্যই ঐসমস্ত দুর্ভাগা লোক এবং বই নিয়ে তাঁরা প্রকাশ্য রাস্তায় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত ঐসব লোকদের দুর্ভাগ্যের কথা তাঁদের মুখ থেকে না শুনলে কেউ অনুমান করতে পারবেন না।

যে-সব হিন্দু এককালে নিরীহ নম্র ও বাধ্য ছিল, বর্তমানে তারাই তাঁদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের দ্বারা আক্রান্ত, দুর্নামগ্রস্ত এবং তাঁদের রুজিরোজগারের পথও প্রায় বন্ধ। তা সত্ত্বেও তাঁদের উপর আরোপিত ঐ মিথ্যা অপবাদ ও নিষ্ঠুরতাকে তাঁরা মোটেই গ্রাহ্য করেন না। এই অত্যাচার নিবারণের জন্য খুব অল্প প্রচেষ্টা হয়েছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যদি এরকম আক্রমণ হত, তাহলে একযোগে তাঁরা রুখে দাঁড়াতেন। যে-সমস্ত ধনী ও শ্রদ্ধেয় হিন্দুরা নিজেদের শাস্ত্রের উপরে আঘাত হানলে উল্লসিত হন না বরং তাকে রক্ষা করার জন্য কৃতসংকল্প, বর্তমানে তাঁদের উচিত এই কুৎসাগুলির উপযুক্ত জবাব দেওয়া অথবা সরকারের কাছে নিজেদের অভাব-অভিযোগ জানানোর জন্য একজোট হওয়া।[১১]

সেজন্যই রামমোহনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হিন্দু কলেজ থেকে দূরে রাখতে হেয়ার কুণ্ঠা বোধ করেননি।

প্রথমে দেশীয় ও বিদেশী ব্যক্তিদের যে কমিটি তৈরি হয় তাতে ডেভিড হেয়ারের নাম ছিল না। কারণ, জনসাধারণের কাছে নিজের নাম প্রচারে তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। তবে চাঁদা আদায়, ছাত্র সংগ্রহ এবং অন্যান্য কাজের

ব্যাপারে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। স্যার এডওআর্ড হাইড ইস্ট এবং জে. এইচ. হ্যারিংটন যথাক্রমে উক্ত কমিটির সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে মনোনীত হন। ইউরোপীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁরা হলেন—ডবলিউ. সি. ব্ল্যাকার; ক্যাপ্টেন জে. ডবলিউ. টেলার; এইচ. এইচ. উইলসন; এন. ওয়ালিচ; লেফটেনান্ট রোবাক এবং লেফটেনান্ট ফ্রান্সিস আরভিন। দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন—চতুর্ভূজ ন্যায়রত্ন; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার; রঘুমণি বিদ্যাভূষণ; তারাপ্রসাদ ন্যায়রত্ন; গোপীমোহন ঠাকুর; হরিমোহন ঠাকুর; গোপীমোহন দেব; জয়কৃষ্ণ সিংহ; রামতনু মল্লিক; অভয়চরণ ব্যানার্জী; রামদুলাল দেব; রাজা রামচাঁদ; রামগোপাল মল্লিক; বৈষ্ণবদাস মল্লিক; চৈতন্যচরণ শেঠ; শিবচন্দ্র মুখার্জী রাধাকান্ত দেব; রামচরণ মল্লিক এবং কালীশঙ্কর ঘোষাল। উক্ত দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে সকলেই একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানে যোগ দেননি প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক চিন্তাধারা ছিল। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটিতে সংকটের সৃষ্টি হয়। যেমন,

(ক) ছাত্র সমস্যা ঃ—স্থাপিত হওয়ার প্রথম সাতমাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটির ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ২০। পরবর্তী তিনমাসে অনেক চেষ্টায় ২০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সংখ্যাটি ৬৯ হয়। তার মূলেও ছিল ডেভিড হেয়ারের অবদান। কারণ তিনি সেই সময়ে কলকাতা স্কুল সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সমিতির পক্ষ থেকে ২০ জন এবং আরো ২০ জন অবৈতনিক ছাত্র সে-সময়ে ভর্তি হয়। পরবর্তী ছয় বছরে ওই সংখ্যার আর কোন হ্রাসবৃদ্ধি হয়নি।

(খ) পাঠ্যসূচী ঃ—প্রথমদিকে ইংরেজির প্রতি অধ্যক্ষদের বিশেষ কোন মনোযোগ ছিল না। বরং দেশীয় ব্যক্তিদের দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রথম প্রথম বাংলা, ফার্সি এবং আরবী পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়।

(গ) স্থানসমস্যা ঃ—১৮১৭-১৮২৩ পর্যন্ত হিন্দু কলেজের কোন নির্দিষ্ট গৃহ ছিল না। ৩০৪ নং চিৎপুর রোডে প্রথমে স্থাপিত হলেও ১৮২৩ পর্যন্ত অনেকবার স্থান পরিবর্তন করতে হয়। প্রথমে ৩০৪ নং চিৎপুর রোডের গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ি থেকে রূপচরণ রায়ের বাড়িতে (চিৎপুর রোডে), তারপর ডঃ ডাফের জেনারেল অ্যাসেম্বলি যে বাড়িতে ছিল সেখানে কলেজটি স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে মদ্যপ নাবিকদের আড্ডার কেন্দ্র বৌবাজার স্ট্রীটে এবং সেখান থেকে আবার টেরেটা বাজারে কলেজটি স্থানান্তরিত হয়।

(ঘ) শিক্ষক সমস্যা ঃ—ঐ ছয় বছরে হিন্দু কলেজের শিক্ষকদের নাম এবং তাঁদের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুই জানার উপায় নাই।

অধ্যক্ষদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার সমর্থকেরা ইংরেজি শিক্ষার অভাব লক্ষ্য করে ভয়ানক হতাশ হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁদের হাতে কোন ক্ষমতা ছিল না। কারণ দেশীয় অধ্যক্ষদের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। পরন্তু দেশীয় অধ্যক্ষদের মধ্যে অনেকেই সন্দেহপ্রবণ, ঈর্ষাপরায়ণ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অধিকাংশেরই কোন আকর্ষণ ছিল না। তাঁরা অনেকেই কলেজটিকে তুলে দিয়ে নিজ নিজ অর্থ ফেরত নিতে ইচ্ছুক ছিলেন। একমাত্র ডেভিড হেয়ারই নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল ছিলেন। তাঁর জন্যই অধ্যক্ষদের সে ইচ্ছা তখন পূর্ণ হয়নি। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে ব্রিটিশ সরকার তখন প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসেন।[১২]

ইতিমধ্যে ১৮২১-এ কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন এবং ১৮২৩-এ এই দুটি প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি গৃহনির্মাণের সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করে। সে-সময়ে হেয়ারের প্রচেষ্টায় কলেজের স্থান সমস্যা মিটে যায়, কিন্তু দেয় অর্থের যথাযথ ব্যয়ের তদারকি করার জন্য একজন পরিদর্শক নিয়োগের প্রস্তাব সরকার দেয়। তখন দেশীয় অধ্যক্ষদের মধ্যে অনেকেই সেই প্রস্তাবের ভয়ানক বিরোধিতা করেন। কেবলমাত্র রামকমল সেন, রসময় দত্ত এবং রাধাকান্ত দেবের মত কয়েকজন ব্যক্তি সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন। রসময় দত্ত অধ্যক্ষ সভার কাছে এক জোরালো বক্তৃতায় বলেন, দীর্ঘ সাত বছরে কলেজটি কেবলমাত্র কয়েকজন কেরানি তৈরি করেছে। কিন্তু তাঁদের সন্তানদের সংস্কারমুক্ত ও উপযুক্ত জ্ঞান দিতে হলে ইউরোপীয় কর্মশক্তি ও দক্ষতার সাহায্য অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। অধ্যক্ষ সভা ঐ প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য হন এবং বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ এইচ. এইচ. উইলসনকে সরকার কলেজের পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। এরপর থেকে ক্রমে ক্রমে কলেজটির উন্নতি ঘটে। প্রথম বছর ছাত্রসংখ্যা ৬৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০ হয়। শিক্ষার সময় দ্বিগুণিত এবং পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। উৎসাহী শিক্ষকেরা পাঠদানে নিযুক্ত হন। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে কলেজের ছাত্রসংখ্যা ২০০ থেকে ৪০০ হয় এবং তাদের মধ্যে অনেক ছাত্রই তখন বৈতনিক ছিল। এই পরিবর্তনের স্বীকৃতি স্বরূপ হেয়ার কলেজে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির ছাত্রদের তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যক্ষ সমিতির সদস্য পদে মনোনীত হন।[১৩]

কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যাতে শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় সেদিকেও তিনি নজর দেন। একবার কলেজের কিছু ছাত্র সহপাঠীদের অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করে। কোন প্রকারে সেই সংবাদটি তিনি পান এবং আর হ্যালিফ্যাক্সকে একখানি পত্র দিয়ে জানান, "আপনি ওদের বুঝিয়ে দেবেন, বদ্ অভ্যাস কখনো বরদাস্ত করা হবে না।" যে-সমস্ত ছাত্রের ঐরূপ দোষ

ছিল তাদের কলেজের মধ্যে ১½ ঘণ্টা ধরে টুলের উপর দাঁড় করিয়ে রাখা হত এবং তাদের বুকে আঁটা একটি প্লাকার্ডে লেখা থাকত, "এ অশালীন ভাষা ব্যবহারের দোষে দুষ্ট।"

আরেকবার তিনি শুনতে পান, ছাত্ররা মনিটারের কথা অমান্য করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি হ্যালিফ্যাক্সকে একখানি পত্র দিয়ে জানান, কোন শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে হেডমাস্টার মহাশয় যদি তাঁর ক্লাসগুলির প্রতি নজর দেন তাহলে মনিটার প্রথাটিও যেমন তুলে দেওয়া যায় তেমনি ক্লাসের গণ্ডগোলও বন্ধ হয়।[১৪]

হিন্দু কলেজের সঙ্গে কলকাতা স্কুল সোসাইটির নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ, আগেই বলা হয়েছে যে কলকাতা স্কুল সোসাইটির ছাত্রদের একাংশ হিন্দু কলেজে পড়ার সুযোগ পেত। এককথায়, সোসাইটির ছাত্ররাই ছিল হিন্দু কলেজের মধ্যমণি। এই সমিতির সঙ্গেও হেয়ারের সম্পর্ক ছিল অবিচ্ছেদ্য, ছাপা বইয়ের অভাব মেটানোর জন্য যেমন কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়, তেমনি গুরুমহাশয়দের পাঠ পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য কলকাতা স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হয়। প্রথমদিকে পিয়ার্স এবং রাধাকান্ত দেব ছিলেন যথাক্রমে ইউরোপীয় ও দেশীয় সম্পাদক। ১৮২১ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি হেয়ার সমিতিটির ইউরোপীয় সম্পাদকের পদে যোগ দেন এবং শেষদিন পর্যন্ত সংস্থাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গৌরমোহন বিদ্যালংকার তাঁর সহকারী ছিলেন। দায়িত্ব গ্রহণের পরই হেয়ার পরীক্ষা পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করেন। তার মধ্যে প্রথম হল ছাত্রদের বেঞ্চে বসার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়, উপস্থিত বিদেশী ব্যক্তিদের ছাত্র ও পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য একটি স্মারকলিপি তৈরি করা। ঐ স্মারকলিপির কয়েকটি কপি পরিদর্শকদের জন্য প্রথম সারিতে রেখে দেওয়া হত। স্মারকলিপিটির গোড়ায় পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি সম্পর্কে একটি নির্দেশিকা থাকত। দেশীয় পাঠশালা ও তার ছাত্রদের প্রসঙ্গে আলোচনা করে কিভাবে তাদের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় তার বর্ণনাও থাকত। দেশীয় পাঠশালার ছাত্রদের বেল অথবা ল্যাংকাস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিলে কি কি অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে তাও সেখানে আলোচনা করা হয়। তিনি আরও জানান, পাঠশালার সংখ্যা বেশী হওয়ায় এত অর্থব্যয় করে একই রকম শিক্ষা পদ্ধতি সর্বত্র চালু করা সম্ভব নয়। পরিবর্তে পাঠশালার ছাত্রদের সামগ্রিক উন্নতির দিকে মোটামুটি নজর দেওয়ার জন্য কমিটি বাংলা ভাষার সঙ্গে পরিচিত পরিদর্শকদের কাছে আবেদন করেন। কারণ তাহলে তাঁরা এই পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে হতাশ হবেন না। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের

পরীক্ষা ইংরেজিতে গ্রহণ করা হলে পরিদর্শকদের বুঝতে অসুবিধা হবে না বলেও আশা প্রকাশ করা হয়।

ইতিপূর্বে দেশীয় সম্পাদক রাধাকান্ত দেব ছাত্রদের পড়াশোনার উন্নতি এবং কাজের সুবিধার জন্য কয়েকজন পণ্ডিত নিয়োগের সুপারিশ করেন। অধীনস্থ পাঠশালাগুলি ঘুরে ঘুরে সেখানকার ছাত্রদের শুদ্ধভাবে লেখা ও পড়া শেখানো এবং পাঠের অর্থ বোঝানোই ছিল সেইসমস্ত পণ্ডিতদের প্রধান কাজ। এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে ডবলিউ. এইচ. পিয়ার্স পরীক্ষামূলক-ভাবে প্রতিটি বিভাগের জন্য একজন করে পণ্ডিত নিয়োগের সুপারিশ করেন। সকালে দুটি ও বিকালে দুটি করে পাঠশালা পরিদর্শন করাই ছিল ঐ সমস্ত পণ্ডিতদের প্রধান কাজ। তারপর সাল, তারিখ ও পরিদর্শনের স্থান অনুসারে ছাত্রদের অগ্রগতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করে প্রধান পণ্ডিতদের মাধ্যমে তা দেশীয় সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল তাঁদের উপর। ১৮২৪-এর ১১ অক্টোবর ডেভিড হেয়ার সোসাইটির কাছে এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করে চারজন পণ্ডিতের মাসিক বেতন একত্রে ৫০ টাকা ধার্য করার সুপারিশ করেন। প্রস্তাবটি আলোচনা করে সোসাইটির পরিচালকমণ্ডলী এক বিস্তারিত কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। তাতে সুবন্দোবস্তের জন্য সোসাইটির অধীনস্থ পাঠশালাগুলিকে চারভাগ করে এক একজন দেশীয় ব্যক্তির উপর প্রতিটি ভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং প্রতিটি পাঠশালা পরিদর্শনের জন্য প্রতিটি ভাগে একজন করে সরকার নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন পাঠশালার মধ্যে দূরত্ব বেশী থাকায় সকাল ও বিকালে একজন সরকারের পক্ষে পরিদর্শনের কাজ চালানো অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। তাই প্রতিটি বিভাগের জন্য একজন করে পণ্ডিত নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই পণ্ডিত ও বিভাগীয় সরকারের প্রধান কাজ স্থির হয় প্রতিদিন স্বতন্ত্রভাবে চারটি করে পাঠশালা পরিদর্শন করা। সকাল ও বিকালে দুটি করে পাঠশালা পরিদর্শনের সুযোগ থাকায় প্রত্যেকে প্রতিটি পাঠশালার জন্য প্রত্যহ এক ঘণ্টা করে সময় দিতে এবং গুরুমহাশয়দের পাঠশালার পাঠ্য-বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দিতে পারবেন। এমনকি প্রয়োজন-বোধে যে-কোন ছাত্রের জ্ঞানের গভীরতা পরীক্ষা করতে পারবেন। এভাবে প্রতিদিন তাঁদের পক্ষে এই পাঠশালা পরিদর্শন করা সহজ হবে।

পৃথক পৃথক ভাবে একটি রেজিস্টার খাতা তৈরি করে তাতে মাস, দিন ও পাঠশালা পরিদর্শনের সময় লিখে রাখার জন্য প্রত্যেককে নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট বইয়ের কোন্ পৃষ্ঠা থেকে লেখা ও পড়া এবং বানান ধরা হয়েছে তাও লিখে রাখতে এবং পরবর্তীকালে হেডপণ্ডিতের কাছে সেই খাতা জমা দিতে বলা হয়। হেডপণ্ডিত ও তত্ত্বাবধায়ক মাঝে মাঝে

পাঠশালাগুলি পরিদর্শন করে রেজিস্টার খাতায় উল্লিখিত বিভিন্ন বিবরণের সত্যতা যাচাই করতেন এবং নিজস্ব মতামত সহ দেশীয় ও ইউরোপীয় সম্পাদকের কাছে প্রতি সপ্তাহে সেইসমস্ত খাতা ফেরত দিতেন। পণ্ডিত, সরকার এবং গুরুদের মধ্যে যাতে অনৈক্যের সৃষ্টি না হয় সেইদিকে সম্পাদকদ্বয় নজর রাখতেন এবং তাঁদের অজ্ঞাতে প্রত্যেকের গন্তব্যস্থানের ঘন ঘন রদবদল করে দিতেন। এর ফলে পাঠশালাগুলির অনেক উন্নতি ঘটে।

ইতিমধ্যে সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ জোসেফ ব্যারেটোর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ায় সোসাইটির গচ্ছিত ৫,৯৭৬ টাকা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সোসাইটির কাজকর্ম মন্থর হয়ে পড়ে। সোসাইটিকে তখন রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসেন ডেভিড হেয়ার। তিনি নিজে সোসাইটিতে দান করেন ৬,০০০ টাকা। এর ফলে সংস্থাটির কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়।

জোসেফ ব্যারেটোর পতনের পর সোসাইটির অর্থ গচ্ছিত রাখা হয় ম্যাকিনটোস কোম্পানিতে। ঊনিশ শতকের চতুর্থ দশকে কলকাতার এজেন্সি হাউসগুলি এক অভাবনীয় আর্থিক সংকটে পড়ে। তারা একের পর এক দেউলিয়া হয়ে যায়। ১৮৩৩-এ ম্যাকিনটোস কোম্পানিও দেউলিয়া হয়। তাতে সোসাইটির চরম অর্থনৈতিক সংকট আবার দেখা দেয়। সোসাইটির চাঁদাদাতাদের মধ্যে অনেকেই বড় বড় হাউসের অংশীদার অথবা আমানতকারী ছিলেন। সুতরাং তাঁদের কাছ থেকে চাঁদা পাওয়ার আশা ক্রমশই ক্ষীণ হতে থাকে। সরকারের মাসিক সাহায্য পাঁচশো টাকা এবং লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক প্রমুখ কয়েকজনের চাঁদাই ছিল সোসাইটির একমাত্র সম্বল। অবস্থা সামাল দিতে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মাসিক বেতন নেওয়া ও পটলডাঙা স্কুল ছাড়া আর সব কিছুই বন্ধ করে দেওয়ার জন্য হেয়ার প্রস্তাব করেন। তখন আরপুলি পাঠশালাটিকে বন্ধ করে এর ইংরেজি বিভাগটি পটলডাঙা স্কুলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়।

সোসাইটির বহু সদস্য ডেভিড হেয়ারের প্রস্তাব মেনে নিলেও রাধাকান্ত দেব বিরোধিতা করে লেখেন, "দেশীয় পাঠশালাগুলির সাহায্য বন্ধ করা কোন মতেই সমীচীন নহে। একমাত্র ইংরেজি স্কুলগুলি রক্ষায় যে ব্যবস্থা সোসাইটি করিয়াছেন তাহা রদ করা উচিত। কেননা শহরে এখন ইংরেজি স্কুলের অভাব নাই, ইহার সংখ্যা অতি দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু দেশীয় পাঠশালাগুলি রক্ষার জন্য স্কুল সোসাইটি ভিন্ন অন্য কোন প্রতিষ্ঠানই এ পর্যন্ত মনোযোগী হয় নাই। যে পাঁচশত টাকা সরকারী সাহায্য পাওয়া যাইতেছে তাহা হইতে হিন্দু কলেজে সোসাইটির ছেলেদের পড়াইবার জন্য ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট দুইশত টাকা পাঠশালা বিভাগের জন্য খরচ করা হউক।"[১৫]

। হেয়ারের মত ছিল যে দেশীয় পাঠশালাগুলি বন্ধ করে দিলে ক্ষতির আশংকা সামান্য। কারণ সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় পাঠশালায় ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত করে গুরুমহাশয়দের গড়ে তোলা। এতে দেশীয় ব্যক্তিরা উৎসাহিত হয়ে নিজেদের বাড়িতে মাতৃভাষায় উন্নত ধরনের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। বহু বছর ধরে পরিকল্পনাটি প্রচলিত থাকায় সোসাইটির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল। ১৮৩০-এর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে বিভাগটি বন্ধ করে দেওয়ায় সোসাইটির তহবিলে মাসিক ২০০ টাকা সঞ্চিত হতে থাকে।[১৬]

এইভাবে পাঠশালাগুলিকে বন্ধ করে দিয়ে ইংরেজি স্কুলগুলির উন্নতির জন্য হেয়ার মনোনিবেশ করেন। এই উদ্দেশ্য বিধানের জন্য বহুদিন আগে তৈরি করা তাঁর পরিকল্পনাটির মধ্যে লুকিয়ে আছে তাঁর কর্মদক্ষতার পরিচয়।

দেশীয় পাঠশালাগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করার পর স্কুল সোসাইটি আরপুলি অঞ্চলে একটি কেন্দ্রীয় বাংলা এবং ইংরেজি পাঠশালা স্থাপন করে। ছাত্রদের উভয় বিষয়ে জ্ঞানার্জনের সুবিধা দেওয়ার জন্য পাঠশালা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বসত। সূর্যোদয় থেকে সকাল নয়টা এবং বিকাল সাড়ে তিনটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসত বাংলা পাঠশালা এবং সকাল সাড়ে দশটা থেকে বিকাল আড়াইটা পর্যন্ত বসত ইংরেজি পাঠশালা। এর ফলে ছাত্ররা একই সঙ্গে উভয় স্কুলে পড়ার সুযোগ পেত।[১৭] তাদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে হিন্দু কলেজে ভর্তি হত।[১৮]

সোসাইটির ব্যয়ে হিন্দু কলেজে ৩০ জন ছাত্র পড়ার সুযোগ পেত। সেই স্থান পূরণের জন্য ব্যবহার ও দক্ষতার ভিত্তিতে অন্যান্য স্কুল থেকে ছাত্র মনোনীত হত। এর ফলে ছাত্রদের উৎসাহের সৃষ্টি হয়।[১৯]

এই ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে স্কুল সোসাইটির ইংরেজি স্কুলের শিক্ষকের পদে যোগ দেন। এই পরিকল্পনার পিছনে ডেভিড হেয়ারের যে চিন্তাটি সজাগ ছিল তা হল ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষা দিতে হলে শিক্ষকদের ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তা না হলে তাঁরা ছাত্রদের মাতৃভাষার মাধ্যমে ইংরেজি পড়াতে পারবেন না।[২০]

অন্যান্য ইংরেজি স্কুলগুলিকেও সে-সময়ে সোসাইটি বিভিন্নভাবে সাহায্য করত। শিবরাজতলার ইউনিয়ন স্কুলটির নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে জগমোহন বসু ভবানীপুর অঞ্চলে বন্ধুবান্ধবদের সহায়তায় একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন। ঠিক অনুরূপ সময়ে খিদিরপুর অঞ্চলেও আরেকটি ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়। প্রথম থেকেই ঐ স্কুল দুটি স্থানীয় ভদ্রলোকদের সহায়তায় পরিচালিত

হত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় বই ও আসবাবপত্র কিনতে এবং শিক্ষকের উপযুক্ত বেতন দিতে কর্তৃপক্ষ অক্ষম হন। তখন বাধ্য হয়ে স্কুল সোসাইটির কাছে তাঁরা আবেদন করেন। স্কুল দুটির পরস্পরের মধ্যে এবং হিন্দু কলেজের থেকে দূরত্ব ছিল অনেক। তাই কয়েকবার পরিদর্শন এবং অনেক বিবেচনার পর সোসাইটি স্কুল দুটিকে শর্তাধীনে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আরোপিত শর্ত অনুযায়ী প্রত্যেক ছাত্রের কাছ থেকে মাসিক ৩ টাকা বেতন গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর পরিবর্তে সোসাইটি স্কুল দুটিকে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, বই এবং উপযুক্ত শিক্ষকদের জন্য প্রতি মাসে ১০০ টাকা দিয়ে সাহায্য করতে রাজী হয়। দুটি ভিন্ন কমিটির উপর স্কুল দুটির পরিচালনা ও পরিদর্শনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সহ আরও তিন-চারজন উভয় কমিটিরই সদস্য ছিলেন। এভাবে ১৮১৯-এর মে থেকে শুরু করে ১৮৩০-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্কুল দুটি টিকে ছিল। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়ায় শর্ত অনুযায়ী অর্থাগম কম হচ্ছিল। তখন সমস্ত দিক বিবেচনা করে সোসাইটি ঐ দুটি স্কুলের পরিবর্তে ভবানীপুর ও খিদিরপুরের নিকটবর্তী বিরজিতলায় একটি স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৮৩৩ পর্যন্ত স্কুলটির ছাত্রসংখ্যা ছিল ৮০। আরপুলি ও পটলডাঙার শিক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী এই স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হত এবং বছরে তিনটি নিজস্ব এবং দুটি প্রকাশ্য মোট পাঁচটি পরীক্ষা গ্রহণ করা হত। ঐসমস্ত পরীক্ষায় ছাত্রদের উত্তর শুনে পরীক্ষক ও উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী সন্তোষ প্রকাশ করেন।[২১]

ইতিমধ্যে আরপুলির ইংরেজি ও বাংলা স্কুল দুটি যে বাড়িতে ছিল তা ব্যবহারের অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। তখন সোসাইটি অদূরে কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে পড়োবাজারে দুটি স্কুল বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। স্কুলটিতে আরপুলির ইংরেজি স্কুলের সমস্ত ছাত্র এবং বাংলা স্কুলগুলি থেকে বাছাই করা ২০০ ছাত্রের পড়ার বন্দোবস্ত হয়। অন্যদিকে আরপুলি স্কুলের জন্য সোসাইটিকে যে টাকা ভাড়া দিতে হত তাও বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সিদ্ধান্তটি অনুসরণ করে সোসাইটি ৯০ ফুট লম্বা এবং ২২ ফুট চওড়া একটি বাংলো তৈরি করে। আগেকার আসবাবপত্রগুলি জারুল কাঠের তৈরি ছিল বলে অল্পদিনের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়। তাই পরবর্তীকালে নতুন বাংলোর জন্য সেগুন কাঠের আসবাবপত্র তৈরি করা হয়। সেখানে ১৮৩০-এর সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৮৩৪-এর মে মাস পর্যন্ত আরপুলির ছাত্ররা পড়াশুনা করে। কিন্তু

১৮৩৪-এর ২৭ মে ভোরবেলা উঠে দেখা গেল বাংলোটি আকস্মিক আগুনে সম্পূর্ণই পুড়ে গেছে। ঠিক ঐ সময়ে নতুন করে বাড়ি তৈরি করার অর্থ সোসাইটির হাতে ছিল না। ওই বাজারের মালিক ছিলেন রাজা নরসিংহচন্দ্র রায়। বাজারের উত্তরদিকে তাঁর একটি সংস্কারযোগ্য পাকা বাড়ি খালি পড়ে ছিল। বাড়িটি ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য সোসাইটির পক্ষ থেকে একটি আবেদনপত্র তাঁর কাছে পাঠানো হয়। সোসাইটির আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজা ঐ বাড়িটি সোসাইটিকে মাসিক ৫০ টাকায় ভাড়া দেন। সংস্কার করে সোসাইটি বাড়িটিকে ব্যবহারের উপযুক্ত করে নেয়। তারপর সেখানে ইংরেজি স্কুলটি খোলা হয়। কিন্তু স্থান সংকুলান না হওয়ায় বাংলা স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে সেই স্কুল আর খোলা হয়নি। অধ্যক্ষদের সহায়তায় হিন্দু কলেজ থেকে অনেক আসবাবপত্র স্কুলটিকে ধার দেওয়া হয়। এইভাবে বাড়িটিকে পঠন-পাঠনের উপযুক্ত করে নিয়ে ১৮৩৪-এর ১৩ জুন ইংরেজি স্কুলটি নতুন করে চালু করা হয়। পূর্ববর্তী দুটি স্কুলের প্রায় ৩৫০ জন ছাত্রকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন ক্লাসে ভর্তি করে নেওয়া হয়।

পরবর্তীকালে ডাক্তার ও'শানেসীর অনুমতি নিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের মেডিকেল কলেজে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার ক্লাস করার সুযোগ দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য ছিল বক্তৃতা শুনে মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের মত উপকৃত না হলেও তারা অনেক কিছু জানতে পারবে এবং পরবর্তীকালে হিন্দু ও মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাদের মনে জেগে উঠবে।

ছাত্রদের জন্য একটি ছোট লাইব্রেরিও স্কুলের সঙ্গে যুক্ত ছিল। চিত্ত-বিনোদনে ও বিভিন্ন কাজে লাগে এমন ৭০০ বই সেখানে ছিল। অবসর সময়ে ঐসমস্ত বইগুলি পাঠ করে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা বিভিন্ন বিষয়ে যাতে জ্ঞানলাভ করতে পারে এবং ছুটির দিনে নিজেদের বাড়িতে তা কার্যকর করতে পারে সেজন্য তাদের উৎসাহিত করা হত।

শুধুমাত্র পাঠের মধ্যেই ছাত্রদেরকে আবদ্ধ রাখা হয়নি। খেলার সুযোগও তাদের দেওয়া হত। শারীরিক ব্যায়াম ও মানসিক আনন্দের জন্য তাদের ক্রিকেট, ট্রাপবল, স্কিপিং, দোলনায় চড়া ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের খেলার সুযোগ দেওয়া হত। তারা যাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে সেইদিকেও দৃষ্টি রাখা হত। বাংলা ভাষায় উপযুক্ত জ্ঞান আছে এবং বয়স যাটের ঊর্ধ্বে নয় পাঠশালার এমন ছাত্ররাই পরবর্তীকালে ঐ স্কুলে পড়ার সুযোগ পেত। ইংরেজি ও বাংলায় সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন

অল্প কয়েকজন ছাত্র অবশ্য সেখানে পড়ার সুযোগলাভ করেছিল। এর ফলে পাঠশালার গুরুমশায়দের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি হয়। কারণ ছাত্রেরা ঐ স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগলাভ করলে অভিভাবকদের কাছ থেকেও তারা পুরস্কারলাভ করত। ১৮৩৩-এর আগে সোসাইটির যে-সমস্ত ছাত্র হিন্দু কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল তাদের মধ্যে ৫৫ জন পরবর্তীকালে পরীক্ষা দিয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়। সেই সময় অন্যান্য স্কুল থেকে মাত্র ৩০ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পেরেছিল।[২২]

আগেই বলা হয়েছে যে কুসংস্কার দূর করার জন্যই হেয়ার ইংরেজি শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। সেইজন্য শুধুমাত্র ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করেই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। অবসর সময়ে তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন।

সঙ্গদোষে যাতে ছাত্ররা বিপথগামী না হয় সেদিকেও হেয়ারের দৃষ্টি ছিল। যে-সব ছাত্রকে উচ্ছৃঙ্খল বা সন্দেহজনক চরিত্রের বলে মনে হত, তাঁদের প্রতি হেয়ার বিশেষ দৃষ্টি দিতেন।

তিনি কখনো ছাত্রদের অন্যায় আচরণ সহ্য করতেন না। কোনো অন্যায়ের কথা জানতে পারলেই তিনি প্রতিবিধান করতেন। এর ফলে ছাত্রদের অনেক দোষ সংশোধিত হয়েছিল।

কোন ছাত্রকে স্কুলে অনুপস্থিত দেখলে হেয়ার লোক পাঠিয়ে তার অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করতেন। তিনি বেত হাতে ছাত্রদের ভয় দেখাতেন কিন্তু তাদের বেত্রাঘাত করতেন না।[২৩]

শুধুমাত্র পাঠশালা স্থাপন করলেই হয় না, ছাত্রদের উপযুক্ত বইয়েরও প্রয়োজন আছে। হেয়ার সে-সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। তাই প্রথম থেকেই কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। প্রথম বছর উক্ত সোসাইটিকে এককালীন ১০০ টাকা দান করেন। পরের বার থেকে ১৮৩৫ পর্যন্ত প্রতি বছরই সোসাইটিকে তিনি ১০০ টাকা করে চাঁদা দিতেন।[২৪] সোসাইটিকে তিনি বিভিন্নভাবে পরামর্শও দিতেন। তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হল। যেমন,

১। ১৮২৮-এর ৫ মার্চ ওল্ড চার্চে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির ৭ম বার্ষিক সভা হয়। সেই সভায় ডেভিড হেয়ার শুধু উপস্থিত ছিলেন না, সোসাইটির কর্মকর্তাদের কাজের প্রশংসা করে এক ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবও উত্থাপন করেছিলেন। সেই প্রস্তাবটি সকলেই সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।[২৫]

২। ১৮২৭-এর ২৯ সেপ্টেম্বর কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির

কার্যনির্বাহী সম্পাদক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের কাছে একখানি পত্র লেখেন। তাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে তাঁদের মতামত চাওয়া হয়।

(ক) দেশীয় ব্যক্তিদের শিক্ষার উন্নতির জন্য সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত বইগুলি কতটা কার্যকর এবং যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁরা যুক্ত আছেন সেখানেই বা সেগুলির উপযোগিতা কতটুকু।

(খ) পরবর্তীকালে সোসাইটির প্রকাশিত বইগুলির উন্নতির জন্য পরামর্শ দেওয়া এবং দেশীয় যুবকদের উন্নতির সহায়ক এরূপ কোন পাণ্ডুলিপি থাকলে প্রকাশের জন্য সোসাইটিকে তা দান করা।

৩। পারিতোষিকের উপযুক্ত বই প্রকাশ সম্পর্কে পরামর্শ দান।[২৬]

১৮২৭-এর ৬ অক্টোবর ডেভিড হেয়ার ওই পত্রখানির একটি উত্তর দেন। তাতে তিনি বলেন ঃ

(ক) কলকাতা স্কুল সোসাইটির অধীনস্থ পাঠশালাগুলিতে কেবলমাত্র স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বইগুলিই পাঠ্য করা হয়েছে এবং এর ফলে প্রচুর সুবিধা হয়েছে। ঐসমস্ত বই না পেলে পাঠশালাগুলির শিক্ষার মান কখনোই উন্নত হত না।

(খ) এইরকম উচ্চ মানের বই প্রকাশের উপযুক্ত আর কোন প্রতিষ্ঠানই কলকাতায় নেই এবং শিক্ষাব্রতীরা সকলেই সেইজন্য উক্ত সোসাইটির কাছে কৃতজ্ঞ।

(গ) স্কুল সোসাইটির পাঠশালাতে যে-সমস্ত বই পাঠ্য করা হয়েছে, তার কোন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন না।

(ঘ) গোল্ডস্মিথের লেখা ইংলণ্ড, গ্রীস ও রোমের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত ইংরেজি সংস্করণ এবং স্পেলিং বুক শেষ করার পর ছাত্রদের পাঠোপযোগী ছোট ছোট ইংরেজি গল্পের বই সুলভ মূল্যে প্রকাশ করতে তিনি পরামর্শ দেন।

(ঙ) পুরস্কারের উপযুক্ত বই প্রকাশিত হলে পরিশ্রমী ছাত্ররা যেমন উৎসাহিত হবে তেমনি নিজ নিজ বাড়িতে তা পাঠ করার আকাঙ্ক্ষা দেশীয় যুবকদের মনেও দেখা দেবে। এইজন্য তিনি ইংরেজি ও মাতৃভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অনুবাদের কাজে নিয়োগ করার পরামর্শ দেন। তা নাহলে ঐ পরিকল্পনাটি মোটেই কার্যকর হবে না।

(চ) স্কুল সোসাইটিও ঐসমস্ত বই কিনে বিভিন্ন পরীক্ষায় পুরস্কার দেবে। তবে এগুলির মূল্য যাতে সোসাইটির ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে সেদিকে দৃষ্টি দিতে তিনি স্কুল বুক সোসাইটিকে অনুরোধ করেন।

(ছ) প্রকাশের উপযুক্ত কোন পাণ্ডুলিপিই তখন তাঁর হাতে ছিল না।

তবে ভবিষ্যতে ঐরূপ কোন পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করার জন্য সোসাইটিকে দিতে পারলে তিনি খুশী হবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।[২৭]

শুধু এইসব বক্তব্য রেখেই হেয়ার চুপ করে বসে ছিলেন না। জেনারেল কমিটি অব পাব্লিক ইনস্ট্রাকসনের সম্পাদক এইচ. এইচ. উইলসন, হিন্দু কলেজের হেডমাস্টার ডি. অ্যান্সলেম এবং স্কুল বুক সোসাইটির সম্পাদকের সহযোগিতায় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি ইংরেজি বইয়ের তালিকা তৈরি করেন এবং ঐসমস্ত বইগুলি প্রকাশের জন্য ১৮২৮-এর ১ জুলাই উইলসন স্কুল বুক সোসাইটির কার্যনির্বাহী সম্পাদকের কাছে একখানি পত্র লেখেন।[২৮]

১৮৩০-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় টাউন হলে অনুষ্ঠিত স্কুল বুক সোসাইটির এক সভায় ডেভিড হেয়ার বলেন, ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগে তাঁর এই ধারণা জন্মেছে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির মত অপর কোন সোসাইটির কাছ থেকে ভারতবাসীরা এত বেশী উপকৃত হননি।[২৯]

পরবর্তীকালে তিনি স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশিত অনেক বই স্কুল সোসাইটির ইংরেজি স্কুলে চালু করেন।

গ্রাম্যপাঠশালায় স্কুল বুক সোসাইটির বই যাতে প্রচলিত হয় সে জন্য উইলিয়াম অ্যাডাম, ১৮৩৬-এর ৩০ এপ্রিল কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত সোসাইটির বার্ষিক সভায় এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ঐ প্রস্তাবে সমিতিকে ঐসমস্ত পাঠশালার সঙ্গে এ-বিষয়ে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। হেয়ার এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।[৩০]

ঐ সভায় জেমস প্রিন্সেপ ১৮৩৬-এর ২ এপ্রিল এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদকের কাছে নেপালের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট বি. এইচ. হডসনের লেখা একখানি পত্রের উল্লেখ করেন। সেই পত্রে হডসন বলেন, দেশীয় ব্যক্তিদের মনকে উদ্দীপিত ও সঠিক পথে পরিচালিত করতে একখানি ইংরেজি বই প্রকাশের জন্য মুইর কিছু টাকা স্কুল বুক সোসাইটিকে দান করেন। উক্ত টাকার পরিমাণ অল্প হওয়ায় ভালো বই প্রণয়নের সম্ভাবনা খুবই কম। এর ফলে ভালোর বদলে খারাপ ফল হতে পারে। তবে তিনি আশা প্রকাশ করেন, মুইরের পথ অবলম্বন করে আরো অনেকেই এগিয়ে আসবেন। দেশীয় ভাষায় উক্ত গ্রন্থের অনুবাদের জন্য তিনি নিজে কমিটি অব পাব্লিক ইনস্ট্রাকসনের হাতে ৫০০ টাকা দান করার অঙ্গীকার করেন। কারণ, তাঁর মতে বেশীরভাগ ভারতবাসী ঐ বইয়ের মর্ম বুঝবে না। তাই দেশীয় ভাষায় বইটির অনুবাদ প্রয়োজন। প্রিন্সেপ আরেকটি প্রস্তাব

উত্থাপন করে ঐ অর্থ স্কুল বুক সোসাইটিকে দেওয়ার জন্য হডসনকে অনুরোধ করেন। হেয়ার এই প্রস্তাবটিও সমর্থন করেন।[৩১]

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য হেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর থেকেই হেয়ার ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কর্ণধার। সেই সময়ে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে নানা মতের সৃষ্টি হয়েছিল। সেইসমস্ত মতাবলম্বী মানুষের সঙ্গে সমদূরত্ব বজায় রেখে না চলতে পারলে ঐরূপ প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করা সহজ ছিল না। কারণ,

(১) কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু ছেলেদের ইউরোপীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়তে রাজী করানো ছিল প্রথম ও প্রধান সমস্যা।

(২) পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে জ্ঞানলাভ করতে হলে ছাত্রদের ইংরেজিতে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সে-সময়ে সেইরকম ছাত্র পাওয়া ছিল দ্বিতীয় সমস্যা।

(৩) সরকারের সামান্য আর্থিক বৃত্তি নিয়ে কেউ নিজের সময় নষ্ট করে ঐ বিষয়ে জ্ঞানলাভে আগ্রহী হবে কিনা তা ছিল তৃতীয় সমস্যা।

কিন্তু হেয়ারের প্রচেষ্টায় সমস্ত বাধা দূর হয়। কেননা তিনি প্রায়ই পাঠদানের সময় উপস্থিত থাকতেন এবং ছাত্রদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতেন। গোড়ায় মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বেশীরভাগই ছিল হিন্দু কলেজ অথবা হেয়ার স্কুলের ছাত্র। তাদের সঙ্গে হেয়ারের যেমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল, তেমনি কলেজ কর্তৃপক্ষও হেয়ারের মাধ্যমে ঐসমস্ত ছাত্রদের চিন্তাধারা ও চরিত্র সম্পর্কে পরিচিত হওয়ার সুযোগলাভ করেন। এর ফলে প্রয়োজনানুসারে তাঁদের উপর প্রভাব বিস্তারে কর্তৃপক্ষের অসুবিধা হত না।[৩২]

চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিজ্ঞান অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তাও হেয়ার উপলব্ধি করেন। তাই তাঁর প্রচেষ্টায় মেডিকেল কলেজে উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও অন্যান্য বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা হয়।[৩৩]

শুধু হিন্দু কলেজ ও নিজের স্কুলের ছাত্রদেরই মেডিকেল কলেজে পড়ার জন্য তিনি উৎসাহিত করতেন না। স্কুলের শিক্ষকদেরও তিনি মেডিকেল কলেজে পড়ার জন্য উৎসাহিত করতেন। এর প্রধান দৃষ্টান্ত স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর পিতা দুর্গাচরণ ব্যানার্জী। ঐ স্কুলের শিক্ষকতা করার সময় হেয়ার তাঁকে মেডিকেল কলেজে পড়ার সুযোগ দেন। এর ফলে মেডিকেল কলেজে ক্লাস করার জন্য প্রতিদিন বেশ কয়েক ঘণ্টা তিনি স্কুলে অনুপস্থিত থাকতেন।[৩৪]

প্রথম যখন মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয় তখন তার সঙ্গে হাসপাতাল স্থাপিত হয়নি। তাই ছাত্রদের ব্যবহারিক জ্ঞানলাভের জন্য জেনারেল ও নেটিভ হাসপাতালে যেতে হত। হেয়ার ঐ ব্যবস্থাকে ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করেন এবং ১৮৩৭-এর ৯ মার্চ জেনারেল কমিটি অব পাব্লিক ইনস্ট্রাকসনের সম্পাদক জে. সি. সাদারল্যাণ্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একখানি পত্র লেখেন।

দৈহিক গঠনতন্ত্র, রসায়ন, ফার্মাসি, মেডিসিন ও সার্জারি ইত্যাদি বিষয়ে কিছু ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞান দেওয়া হলেও ছাত্ররা যাতে চিকিৎসক হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে সেইদিকে তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেইদিক দিয়ে কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীতে 'ক্লিনিকাল সার্জারী' ও 'ফিজিক ফরমের' দুজন অধ্যাপক নিয়োগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাদের সেই পাঠকে সম্পূর্ণভাবে সার্থক করে তুলতে হলে নিয়মিতভাবে তাঁদের হাতের কাছে রোগীর উপস্থিতি একান্ত কাম্য। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের রোগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতালাভের সুযোগও ছাত্রদের থাকা প্রয়োজন। সরকার যদিও ছাত্রদের কলকাতার জেনারেল ও নেটিভ হাসপাতালে সেই শিক্ষার সুযোগ দিয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। তাই অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কারণ,

১। নেটিভ হাসপাতালে কেবলমাত্র শল্যচিকিৎসার ব্যবস্থা থাকায়, অন্যান্য রোগ সম্পর্কে শিক্ষালাভের জন্য ছাত্রদের বাধ্য হয়েই জেনারেল হাসপাতালে যেতে হয়। কিন্তু মেডিকেল কলেজ থেকে জেনারেল হাসপাতালের দূরত্ব বেশী হওয়াতে এবং এদেশীয় আবহাওয়ার জন্য সময়মত জেনারেল হাসপাতালে অনুশীলনে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে ছাত্রদেরকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হয়। তাছাড়া যাতায়াতের জন্যও ছাত্রদের অনেক সময় নষ্ট হয়।

২। জেনারেল হাসপাতালে রোগীরা সকলেই ইউরোপীয়। তাদের রোগের প্রকৃতি এদেশীয়দের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অথচ পাঠ্যজীবন শেষ করে চিকিৎসকদের দেশীয় রোগী নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে। যদিও কলকাতার মত নগরীতে (যেখানে বিভিন্ন দেশের লোকের সমাগম হয়ে থাকে) চিকিৎসকদের বিভিন্ন দেশের রোগীদের সম্পর্কে ধারণা থাকা একান্ত কাম্য, তথাপি এমন একটি শ্রেণীর রোগীদের নিয়ে অনুশীলন করা উচিত নয়, যাতে শিক্ষাশেষে ঐ সমস্ত রোগীর সংখ্যা খুবই অল্প পাওয়া যাবে।

৩। কলেজ ও বাসস্থান থেকে জেনারেল হাসপাতালের দূরত্ব অনেক বেশী এবং ছাত্রদের কাছে শিক্ষণীয় এরূপ রোগীর সংখ্যাও সেখানে অনেক

কম। তাই ছাত্ররা সেখানে যাওয়ার জন্য বিশেষ উৎসাহ বোধ করে না। অপরদিকে ইউরোপের মেডিকেল স্কুলগুলির মত কলেজের মধ্যে অথবা নিকটে কোন হাসপাতাল থাকলে ছাত্ররা নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগ করতে পারে। যেমন,

(ক) তত্ত্বগত পাঠ শেষ হলেই ছাত্ররা ব্যবহারিক অনুশীলনে আত্ম-নিয়োগ করতে এবং অবসর সময়ে ড্রেসার ও সহকারী হিসাবে কাজ করে রোগীদের উপর নজর রাখতে পারে। এর ফলে ভারতের মত রোগবহুল দেশে অনেক উপকার হবে। অপরদিকে যে-সব ছাত্ররা নিজেদের অধীনস্থ রোগীদের পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে ধারণা পেতে চায় তারাও উপকৃত হবে।

(খ) হাসপাতালে কর্তব্যরত থাকলেও নিজেদের পছন্দমত পড়াশোনা করতে এবং কলেজের ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসেই লাইব্রেরি, শ্রেণীকক্ষ ও অন্যান্য কাজে তারা যোগ দিতে পারবে। কিন্তু হাসপাতালের দূরত্ব বেশী হওয়ায় উপরোক্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে।

(গ) মেডিকেল কলেজের আশেপাশে বসবাসকারী রোগীদের পক্ষে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানই বাঞ্ছনীয়। শহরের কেন্দ্রস্থলে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলে বেশীরভাগ লোকের পক্ষেই যাতায়াতের অনেক সুবিধা হয় এবং তাঁরা শহরের এককোণে অবস্থিত ডিসপেনসারিতে না গিয়ে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। মেডিকেল কলেজ ছাড়া অপর কোন স্থানই হাসপাতাল স্থাপনের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

অনেকের মতে, পুলিশ হাসপাতালেও ছাত্ররা ব্যবহারিক জ্ঞানলাভের সুযোগ পেতে পারে। কিন্তু ছাত্রদের পক্ষে ঐ হাসপাতালটি মোটেই উপযুক্ত নয়। ওখানকার রোগীদের বেশীরভাগই ভিক্ষুক, তীর্থযাত্রী, দাগী আসামী এবং বিশেষ কয়েক প্রকার রোগে ভোগে। তাদের সাহায্যে ক্লিনিকাল শিক্ষা দেওয়া কখনই সম্ভব নয়। কারণ দারিদ্র্য অথবা দুর্বলতার শেষ অবস্থায় বাধ্য হয়ে তারা যখন হাসপাতালে ভর্তি হয়, তখন তাদের আরোগ্যলাভ করার সম্ভাবনা সামান্যই থাকে। ঐসমস্ত রোগীদের নোংরা এবং বিরক্তিকর স্বভাবের জন্য ছাত্রদের পক্ষে বেশীক্ষণ ঐসমস্ত ওয়ার্ডে কাটানো সম্ভব নয়। সমস্ত কিছু বিচার-বিবেচনা করে কলেজের মধ্যে অথবা কলেজের কাছাকাছি একটি হাসপাতাল স্থাপন করাই শ্রেয়। ঐরূপ একটি হাসপাতাল স্থাপন করার জন্য যদিও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তথাপি সরকারকে অল্প পরিমাণেই অর্থব্যয় করতে হবে। কারণ কলকাতার মধ্যে একটি ফিভার হাসপাতাল স্থাপনের জন্য ইতিমধ্যেই বহুল পরিমাণে

অর্থ সংগৃহীত হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর জন্য মেডিকেল কলেজের অংশ হিসেবে ঐ হাসপাতালটি স্থাপনের কথা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না। উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফিভার হাসপাতালকে যদি মেডিকেল কলেজের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, তাহলে কোন বাধার সম্মুখীন হতে হবে বলে মনে হয় না। উপরন্তু ঐ হাসপাতালের রোগীরা একদিকে কলেজের অধ্যাপকদের কাছে চিকিৎসার এবং বহুল যত্নের সুযোগলাভ করবে, অপরদিকে ছাত্ররাও একটি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে অনুশীলন করতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালটি স্থাপনের মাধ্যমে সরকার যেমন কলেজের জন্য অতিরিক্ত খরচ করবে তেমনি হাসপাতালটির দায়বহনের জন্য সরকারের অতিরিক্ত উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে।

উল্লিখিত প্রস্তাবটি যদি সরকার সমর্থন করেন, তাহলে হাসপাতালটির জন্য কলেজের কাছাকাছি একটি স্থান নির্বাচনের জন্য তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তাঁর মতে, হাসপাতালটি কলেজের চার দেওয়ালের মধ্যে না রাখাই শ্রেয়, কারণ তাহলে রোগীরা কলেজের হট্টগোলের হাত থেকে রক্ষা পাবে। অপরদিকে পুলিশ হাসপাতাল সম্পর্কে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আতঙ্ক থাকায়, দেশীয় ব্যক্তিরাও ফিভার হাসপাতালকে গুলিয়ে ফেলবে না।

এই পরিকল্পনাটিকে সফল করার জন্য তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি দিতে সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। যেমন,

১। রোগীদের পাশে দাঁড়িয়ে ঔষধবিদ্যার ব্যবহারিক শিক্ষাদানের সুবিধার জন্য কিছু রোগীকে নিয়ে ঐ হাসপাতালে একটি পৃথক ওয়ার্ড তৈরির জন্য তিনি পরামর্শ দেন।

২। অনুরূপভাবে শল্যবিদ্যার ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য আরেকটি পৃথক ওয়ার্ড তৈরি করতে বলেন।

৩। ঔষধ সংগ্রহের সুবিধার্থে বাইরের রোগীদের জন্য কলেজ সংলগ্ন একটি ডিসপেনসারি স্থাপন করতে বলেন। তাহলে ঐসমস্ত রোগীদের মধ্য থেকেই ঔষধ ও শল্যবিদ্যার ওয়ার্ডের জন্য রোগী বাছাই করা যাবে। প্রকৃতপক্ষে হাসপাতাল সংলগ্ন একটি বহির্বিভাগ না থাকলে ওয়ার্ডগুলির জন্য রোগী সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। বহির্বিভাগটি পরিচালনা করতে খুব অল্প অর্থেরই প্রয়োজন হবে। ঔষধের জন্য সামান্য অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে। যে-সমস্ত রোগীরা হাসপাতালের চিকিৎসা গ্রহণে এবং বহির্বিভাগে প্রবেশে অনিচ্ছুক তাঁদের চিকিৎসার জন্য ইউরোপের মত বাড়িতে বাড়িতে ছাত্রদের পাঠানোর জন্য তিনি পরামর্শ দেন। এইসমস্ত রোগীদের মধ্যে বেশীরভাগই ছাত্রদের বাড়ির কাছাকাছি বসবাস করতে চায়, কারণ, তাহলে ছাত্ররা তাদের অল্প সময়ের মধ্যেই দেখতে পাবে।

৪। ঔষধ প্রস্তুতকারকের বাসস্থান হাসপাতালের মধ্যেই হওয়া প্রয়োজন। হাসপাতালের সাধারণ কাজকর্ম তদারকের জন্য তিনি একজন অফিসার নিয়োগের পরামর্শও দেন এবং ড্রেস ও ঔষধ মিশ্রণের কাজে সাহায্যের জন্য ছাত্রদেরকে নিয়োগ করতে বলেন।

৫। ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ওয়ার্ডগুলির দায়িত্ব বিভাগীয় অধ্যাপকদের অধীনে দেওয়ার জন্য তিনি পরামর্শ দেন।[৩৫]

উপরি-ধৃত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন সম্পর্কে ডেভিড হেয়ার তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন। কিন্তু তিনি এখানেই থেমে থাকেননি। প্রস্তাবিত হাসপাতালের বাহ্যিক রূপ কিরকম হবে তা নিয়েও তিনি ১৮৩৭-এর ২৫ মে ফিভার হাসপাতাল কমিটির কাছে নিজের মতামত প্রকাশ করেন। (১) ভারতীয় হিন্দুদের বর্ণভেদ এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি উক্ত হাসপাতালকে তিনটি পৃথক অংশে ভাগ করার সুপারিশ করেন। প্রথম অংশ শুধু উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জন্যই নির্দিষ্ট থাকবে। মুসলমান এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের জন্য দ্বিতীয় অংশটুকু এবং তৃতীয় অংশটুকু শুধু মহিলাদের জন্যই নির্দিষ্ট করতে অনুরোধ করেন। বাইরে থেকে মনে হবে, যেন একটি চতুর্ভুজের তিনটি দিক। তবে প্রত্যেকটি দিকই একে অন্যের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাকবে। বিশেষত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জন্য নির্দিষ্ট ওয়ার্ডটিকে পৃথক রাখার উপর তিনি বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। আনুমানিক ৫00 রোগী যাতে থাকতে পারে সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে তিনি অনুরোধ করেন।

(২) পুলিশ হাসপাতালের জমিটুকুই হল হাসপাতালের জন্য উপযুক্ত স্থান। উল্লিখিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সেখানে বাড়ি করতে হলে আনুমানিক ৫0,000 হাজার টাকা ব্যয় হবে। দেশীয় ব্যক্তিরা যদি আরো অল্প টাকায় তৈরি করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে কিন্তু তার মান অতি নিম্ন-স্তরের হবে। ওই স্থানে অধিকৃত বাড়িঘরের মালমশলাগুলিকে অবশ্য নূতন বাড়ি তৈরির কাজে লাগানো যেতে পারে।

(৩) চিকিৎসাবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে হাসপাতালটি একটি উঁচু দেওয়াল দিয়ে ভাগ করার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। এর ফলে একদিকে যেমন হাসপাতালের বাসিন্দাদের প্রবল উৎসাহের জন্য কোন ক্ষতি আশা করা যায় না, অপরদিকে দেশীয় ব্যক্তিরাও হাসপাতালের উপকার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না, কারণ নিকটস্থ শল্যবিদ্যার স্থানটি সম্পূর্ণভাবে তাদের দৃষ্টির অগোচরেই থাকবে।

(৪) হাসপাতালটি পরিচালনার ক্ষেত্রে দেশীয় ব্যক্তিদের সংস্কারগুলি

গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। কলকাতাবাসীদের উপকারের জন্য তৈরি প্রতিষ্ঠানটি যাতে তাঁদের বিশেষ উপকারে লাগতে পারে, সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই অনাহাসৃষ্টির সমস্ত সম্ভাবনাকে নির্মূল করতে হবে।

(৫) হাসপাতালটিতে যেহেতু সবরকম রোগেরই চিকিৎসা করা হবে, তাই তার নাম ফিভার হসপিটাল না রেখে নেটিভ জেনারেল হাসপাতাল রাখার জন্য তিনি পরামর্শ দেন।

(৬) প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের একটি বহির্বিভাগ থাকা প্রয়োজন। চলাফেরায় সক্ষম রোগীরা এখানে দেখানোর সুযোগ পাবে এবং ঐ সমস্ত রোগীদের মধ্য থেকেই বিভিন্ন ওয়ার্ডের জন্য রোগী বাছাই করা যাবে।

(৭) ছাত্রদের স্বার্থে কলেজটিকে যদি একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে তৈরি করতে হয় তাহলে রোগীদের চিকিৎসার দায়দায়িত্ব অধ্যাপক-দের উপরে দিতে হবে। সিনিয়ার সার্জেন অথবা সুপারিন্টেডেন্ট পদে পৃথক ব্যক্তিদের নিয়োগের তিনি বিরোধিতা করেন। তাহলে একদিকে যেমন কলেজের আর্থিক দায়দায়িত্ব বাড়বে, তেমনি কলেজের ছাত্ররাও হাসপাতালের সুযোগ-সুবিধা থেকে আংশিকভাবে বঞ্চিত হবে। কারণ ছাত্রদের শিক্ষার খাতিরেই অধ্যাপকগণ হাসপাতালে রোগী ভর্তি করবেন এবং রোগীরাও তাঁদের অধীনে থেকে ভালোভাবে দেখাশোনার সুযোগ পাবে। এর পরিবর্তে রোগীদের যদি অপর কোন ব্যক্তির অধীনে রাখা হয় তাহলে সে হয়ত চিকিৎসার স্বার্থে অধ্যাপকদের সঙ্গে সহযোগিতা নাও করতে পারে অথবা ছাত্রদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার না করতে পারে।

(৮) জরুরি অবস্থার জন্য তিনি একজন রেসিডেন্ট সার্জেন নিয়োগের পরামর্শ দেন। অধ্যাপকদের অনুপস্থিতিতে তাঁর উপরেই সমস্ত রোগীদের দায়িত্ব থাকবে। সেকারণেই তাঁকে বাসস্থান দিতে হবে এবং তাঁর মাসিক বেতন হবে ২০০ টাকা। নিজের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ছাড়া বিভিন্ন মেডিকেল অফিসারেরা, রেসিডেন্ট সার্জেনের সঙ্গে সমানুপাতে বিভিন্ন ওয়ার্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

(৯) ইউরোপীয় হাসপাতালের মত এখানেও ছাত্ররাই ড্রেসার অথবা সহকারীর কাজ করবে। ঐ কাজের মধ্য দিয়ে তারা অনেক কিছুই শিখতে পারবে। তাতে ছাত্রদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে।

(১০) তিনি মাসিক ১০০ টাকা বেতনে একজন ঔষধ প্রস্তুতকারক নিয়োগের পরামর্শ দেন।

(১১) অন্যান্য কাজের জন্য তিনি নিম্নলিখিত কয়েকটি পদ সৃষ্টির উপর

পছন্দ করে দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বেতন সম্পর্কেও তিনি সুস্পষ্ট আভাষ দেন।

১	জন	লেখক	মাসিক বেতন	২৫
১	,,	কম্পাউন্ডার	,, ,,	১২
২	,,	ড্রেসার	,, ,,	১০
৪	,,	বেয়ারার	,, ,, (৪ টাকা হারে)	১৬
৩	,,	রাঁধুনী	,, ,, (৫ ,, ,,)	১৫
২	,,	ভিস্তী	,, ,, (৪½ ,, ,,)	৯
২	,,	ভারী	,, ,, ,,	৯
২	,,	মেথর	,, ,, (৪ ,, ,,)	৮
১	,,	মেথরানী	,, ,,	৫
২	,,	মুর্দাফরাস	,, ,, (৩ ,, ,,)	৬
১	,,	ধোবী	,, ,,	১০
			মোট	১২৫ টাকা

যদিও সেই সময়ে ১৫০—২০০ জনের বেশী রোগী হাসপাতালে থাকত না, তথাপি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তিনি উক্ত হাসপাতালে ৫০০ শয্যার ব্যবস্থা রাখতে পরামর্শ দেন। তিনি আরো বলেন, প্রতিটি রোগীর খাদ্যের জন্য দৈনিক ২ আনা খরচ করলে ২০০ জনের জন্য মাসিক ৭৫০ টাকার প্রয়োজন হবে। অনুরূপ হারে হাসপাতালের জন্য মাসিক খরচ হবে নিম্নরূপ।

রেসিডেণ্ট সার্জেনের বেতন	২০০
ঔষধ প্রস্তুতকারকের ,,	১০০
পরিচারক (উপরে বর্ণিত)	১২৫
২০০ রোগীর খাদ্যের জন্য	৭৫০
ঔষধপত্র ও আরো অন্যান্য খরচ	১২৫
মোট	১,৩০০ টাকা

(১২) হাসপাতাল তৈরির জন্য যে স্থানটির কথা বলা হয়েছে, তা পছন্দ না হলে, মেডিকেল কলেজের পাশে ২০,০০০—২৫,০০০ টাকা মূল্যে অনেক জায়গা পাওয়া যেতে পারে অথবা মাসিক ১৫০—২০০ টাকা হারে অনেক বাড়ি ভাড়া পাওয়া যেতে পারে।[৩৬]

১৮৩৭-এর ২৯ মে ডেভিড হেয়ার ফিভার হাসপাতাল কমিটির সামনে উপস্থিত হয়ে আরো কিছু বক্তব্য পেশ করেন। তা এখানে পর পর তুলে ধরা হল।

১। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের স্বার্থে তিনি উভয় প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করার পরামর্শ দেন। তাহলে রোগীরা দেখাশোনার ভালো সুযোগ পাবে। তা না করে প্রতিষ্ঠান দুটিকে যদি আলাদাভাবে রাখা হয় তাহলে অভিজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে রোগীদের চিকিৎসা করতে অনেক অর্থব্যয় হবে।

২। ডাঃ গুডিড-এর বক্তব্য সমর্থন করে তিনি বলেন, হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা ২০০-র বেশী হবে না। যতদিন না দেশীয় ব্যক্তিরা হাসপাতালের ব্যবহার ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারবে ততদিন পর্যন্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না।

৩। তাঁর মতে, হাসপাতাল স্থাপনের জন্য মেডিকেল কলেজই হল সবচাইতে উপযুক্ত স্থান। রোগী এবং তাঁদের প্রথা ও সংস্কারগুলির প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি দিলে তাঁরা কলেজের সঙ্গে হাসপাতালকে যুক্ত করায় মোটেই আতঙ্কিত হবেন না। তা না করলে কোন হাসপাতালই ভালোভাবে পরিচালিত হতে পারে না।

৪। তাঁর মতে, অনেক রোগীই বাড়ি ছেড়ে হাসপাতালে থাকতে রাজী হবেন, বিশেষ করে দুঃস্থ ব্যক্তিরা। কারণ স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য হাসপাতালই হল তাঁদের পক্ষে প্রকৃষ্টতম স্থান।[৩৭]

এর পরেও স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে হেয়ারের মনোভাব নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হেয়ার স্মারক বক্তৃতামালায় এই প্রসঙ্গে বলেন যে, হেয়ার বুঝেছিলেন, যে দেশে পুরুষের মন কুসংস্কারাচ্ছন্ন সে দেশে স্ত্রীশিক্ষার চেষ্টা করা বৃথা, তাই তিনি আগে পুরুষদের মন থেকে কুসংস্কার দূর করার জন্য বদ্ধপরিকর হন। মন থেকে কুসংস্কার দূর হলে পুরুষরাই যে স্ত্রীশিক্ষার জন্য অগ্রসর হবেন তা পরবর্তীকালে বেথুন স্কুল স্থাপনার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে।[৩৮]

উপরি-বর্ণিত ঘটনাগুলি থেকে শিক্ষা সম্পর্কে হেয়ারের ধ্যান-ধারণার স্পষ্ট একটি ছবি পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার কঠোর সমর্থক হলেও ধর্মের দিক থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীতপন্থী। তাঁর মন ছিল যুক্তিবাদী। কোন ধর্মের উপরই তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা ছিল না। যখনই শুনতে পেতেন প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে কেউ খ্রীস্টধর্ম গ্রহণে উদ্‌গ্রীব, তখনই তার সামনে উপস্থিত হয়ে ভ্রান্তপথ অনুসরণ থেকে বিরত থাকতে তাকে উপদেশ দিতেন। কেননা তাঁর কাছে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করার প্রকৃত তাৎপর্য ছিল 'এক কুসংস্কার পরিত্যাগ করে অন্য কুসংস্কার গ্রহণ করা'। তাই ডিরোজিও যখন ধর্মীয় লাগাম থেকে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মুক্ত করার চেষ্টা করছিলেন হেয়ার তখন তাঁকে বাধা না দিয়ে তাঁর ডিবেটিং ক্লাবে মাঝে মাঝে যোগ দিতেন।

হিন্দুসমাজ ডিরোজিও ও তাঁর অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনকে কিন্তু ভালো চোখে দেখেনি। তাই প্রথমে তাঁরা প্রধান শিক্ষক মিঃ ডি' আন্সেলেমকে (**D' Anselme** এক পত্র দিয়ে ছাত্রদের মন থেকে ধর্মের প্রতি তাঁদের চিরাচরিত বিশ্বাসে পরিবর্তন না করার জন্য অন্যান্য শিক্ষকদের নির্দেশ দিতে অনুরোধ করেন। ঐ পত্রে বিশেষ কোন ফলোদয় হয়নি। তখন বাধ্য হয়েই অনেক অভিভাবক তাঁদের সন্তানদের হিন্দু কলেজ থেকে সরিয়ে নিতে থাকেন। এবার কর্তৃপক্ষ আরেকটু কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হন। ১৮৩০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে এক নির্দেশনামা জারি করে তাঁরা বলেন, হিন্দুধর্মের বিশ্বাসে আঘাত করে এমন কোন আলোচনা শিক্ষকরা ছাত্রদের সঙ্গে কখনো করবে না। ঐরূপ কোন ঘটনা ঘটলে তা পরিদর্শকের দৃষ্টিগোচর করার জন্য প্রধান শিক্ষক মিঃ আন্সেলেমকে অনুরোধ করা হয়। তাতে কোন শিক্ষক দোষী সাব্যস্ত হলে, অবিলম্বেই তাঁকে কর্মচ্যুত করা হবে। সেই নির্দেশনামায় কোন ফল না হওয়ায়, কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েই ডিরোজিওকে কর্মচ্যুত করেন। কর্তৃপক্ষের উক্ত সিদ্ধান্তে ডেভিড হেয়ার ও উইলসন কিন্তু মোটেই সায় দেননি।[৩৯]

এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সমাজপতিরা কিন্তু ছাত্রদের মন থেকে ডিরোজিওকে মুছে দিতে পারেননি। সেদিন তিনি যে-চিন্তার খোরাক জুগিয়েছিলেন তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছাত্রদের এক অংশ সমাজে এক আন্দোলনের সৃষ্টি করে। তখন তাঁরা ঐ আন্দোলনের অন্যতম হোতা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুধু সমাজচ্যুতই করেননি, কর্মচ্যুতও করেছিলেন। সে-সম্পর্কে কিছু আলোচনা এখানে করা হল।

১৮৩১-এর ২৩ আগস্ট মঙ্গলবার কৃষ্ণমোহনের অনুপস্থিতিতে তাঁর বাড়িতে বন্ধুবান্ধবেরা মিলিত হয়ে পাঁউরুটি, মদ ও গোমাংস খায়। তারপর কিছু পাঁউরুটির টুকরো এবং মাংসের হাড় প্রতিবেশী ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে ছুঁড়ে ফেলে চিৎকার করে বলতে থাকে 'চক্রবর্তীর পুত্রেরা ওগুলো খেয়ে ফেল'। স্বভাবতই অফিস-ফেরত চক্রবর্তী বাবু একথা শুনে ক্ষুব্ধ হন এবং কৃষ্ণমোহনের বাড়িতে গিয়ে তাঁর উপর এই হিন্দুধর্ম-বিরোধী দৌরাত্ম্যের কারণ জানতে চান। কৃষ্ণমোহনের বন্ধুরা তাঁর কথা হেসে উড়িয়ে দেয়। ফলে ঘোর বচসার সৃষ্টি হয়। সেই বচসায় আকৃষ্ট হয়ে শুধু প্রতিবেশীরাই নয় এক চৌকিদারও সেখানে এসে হাজির হয়।

ঘটনাটি সেখানেই থেমে না থেকে আপন গতিতে গড়িয়ে চলে। ফলে ভাই ভুবনমোহন, কালীমোহন সহ কৃষ্ণমোহনের মাতা সমাজপতি নবকৃষ্ণ সিংহ কর্তৃক সমাজচ্যুত হন। আত্মরক্ষার তাগিদে তখন উভয় ভ্রাতাই মায়ের সম্মতিক্রমে ভাইকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করেন এবং তাঁদের

পুনরায় সমাজে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য সমাজপতির কাছে আবেদন করেন।

মা এবং সহোদররা ছাড়াও সিমলা অঞ্চলের ৩০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং আরপুলি অঞ্চলের ৪১ জন প্রভাবশালী হিন্দুও একই বিষয়ের উল্লেখ করে স্কুল সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক রাধাকান্ত দেবের কাছে পৃথক পৃথক দুখানি পত্র লেখেন।

অপরদিকে বাবু রাধাকান্ত দেবও ১৮৩১-এর সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা স্কুল সোসাইটির কাছে একখানি পত্র লেখেন। তাতে বলা হয়, স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হওয়ার পর তিনি নিজে যখন ছাপা বই ব্যবহার করতে এবং তাঁর নিজের বাড়িতে পরীক্ষা দিতে গুরুমহাশয়দের কাছে অনুরোধ করেন, তখন তাঁদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল ঐসব বইয়ে কোন ধর্মীয় ঘটনার উল্লেখ থাকবে না বা সোসাইটিতে অধার্মিক এবং প্রচলিত ধর্মমত-বিরোধী ব্যক্তিদের ছাত্রদের শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত করা হবে না। শুধু গুরুমহাশয়দেরই নয়, অভিভাবকদেরও এ আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী ঘটনায় তাঁরা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। সোসাইটিতে পুনরায় শান্তিস্থাপনের জন্য অবিলম্বে কৃষ্ণমোহন ও রসিককৃষ্ণকে পটলডাঙা স্কুল থেকে বরখাস্ত করতে এবং ভালো শিক্ষক না পাওয়া পর্যন্ত পটলডাঙা স্কুল অথবা হিন্দু কলেজের প্রধান ছাত্রদের দিয়ে তাঁদের স্থান পূর্ণ করতে দেশীয় সম্পাদকের কাছে তিনি সুপারিশ করেন।

সোসাইটির হিন্দু সদস্যদের মধ্যে প্রায় সকলেই সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন। একমাত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুর আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি উত্থাপন করে প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য উভয়ের বক্তব্য শোনার জন্য অনুরোধ করেন। তাতে দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁদের উভয়কে উক্ত পদ থেকে বরখাস্ত করা যেতে পারে। রাধাকান্ত দেব পাড়া-প্রতিবেশী, কৃষ্ণমোহনের মা ও খুড়তুতো ভাই মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির বক্তব্যের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি বাতিল করে দেন।

ইউরোপীয় সদস্যদের মধ্যে উইলিয়াম অ্যাডাম এবং জি. আই. গর্ডন প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন। অ্যাডামের মতে, হেয়ারের উপর পটলডাঙার স্কুলের দায়িত্ব থাকায়, তিনিই উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের একমাত্র অধিকারী কিন্তু হেয়ার এ-সম্পর্কে কোন বক্তব্য না রাখায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। গর্ডনের মতে, রাধাকান্ত দেবের উচিত ছিল হেয়ারের কাছে প্রথমেই পত্রখানি পাঠানো।

প্রত্যুত্তরে রাধাকান্ত দেব বলেন, (১) দেশীয় ব্যক্তিদের কাছে অপবাদ পাওয়ার আগেই তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। (২) হেয়ার পটলডাঙা

স্কুলের পরিচালক হলেও প্রতিষ্ঠানটি স্কুল সোসাইটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। (৩) সেদিনকার ভোজ সম্পর্কে কোন সংবাদ না পাওয়ায় হেয়ার কোন মন্তব্য প্রকাশ করেননি। তাই রাধাকান্ত দেব স্বয়ং সোসাইটির কাছে সমস্ত ঘটনা তুলে ধরেন। (৪) শিক্ষক দুজন বিতাড়িত হলে হেয়ারের মত তিনিও দুঃখিত হবেন। অশোভন আচরণের জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা গ্রহণে তিনি বাধ্য হয়েছেন।

উপরোক্ত বক্তব্যগুলি কিন্তু হেয়ারের বক্তব্য নয়, আসলে তিনি দলাদলির মধ্যে জড়িয়ে পড়তে চাননি। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য প্রিয় ছাত্রদের যখন স্কুল থেকে বিতাড়িত করা হয়, তিনি কোন প্রতিবাদ করেননি। তাই বলে তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত অসত্য অভিযোগকেও তিনি সমর্থন করেননি। পরবর্তীকালে এর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

সোসাইটির বিভিন্ন সদস্য যখন হেয়ারের মতামত জানতে চান, তখন বাধ্য হয়েই রাধাকান্ত দেব হেয়ারের কাছে একখানি পত্র লেখেন, তাতে হেয়ারকে তিনি প্রশ্ন করেন জাতিচ্যুত দুই শিক্ষককে তিনি পটলডাঙা স্কুল থেকে বরখাস্ত করতে চান, নাকি স্ব-পদে বহাল রেখে হিন্দু ছাত্রদের কলুষিত করতে চান? উত্তরে হেয়ার দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, তিনি আলোচ্য ভোজটির সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তাছাড়া শহরে প্রতিনিয়তই নানা ধরনের মিথ্যা সংবাদ রটে থাকে। তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে আরো বলেন যে, স্কুলের মধ্যে অভিযুক্তরা কোন অশোভন আচরণ করেননি।[৪০]

একই কারণে হেয়ার লালবিহারী দে-কেও নিজের স্কুলে পড়তে দেননি। কারণ লালবিহারী এর আগে জেনারেল এসেম্বলীতে পড়াশোনা করতেন। সেখানে তিনি 'নিউ টেস্টামেণ্ট' পড়েছেন। সেইজন্য হেয়ারের মতে তিনি অর্ধ খ্রীস্টান। সুতরাং তাঁকে নিলে ছাত্ররা নষ্ট হতে পারে অথবা অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। তাহলে তাঁর সমস্ত পরিকল্পনাই নষ্ট হয়ে যাবে।[৪১]

শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে হেয়ার কর্তব্য শেষ করেননি। আজ যাঁরা ছাত্র, কাল তাঁরাই হবেন দেশের কর্ণধার। সুতরাং ভাবী কর্ণধারেরা সমাজকে যাতে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে সেইদিকেও হেয়ারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কাজে তিনি সহায়তা করতেন। ১৮৩৮-এর ১২ মার্চ কলকাতায় যখন Acquisition of General Knowledge নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়, হেয়ার সেখানেও যোগ দেন এবং সভাটির পরিদর্শক মনোনীত হন। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েসনের মত এ সমিতিরও বিভিন্ন সভায় তিনি যোগ দিতেন।[৪২]

পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য পাশ্চাত্য শাসকদের তিনি অন্ধভাবে অনুসরণ করেননি। যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই তিনি শাসক শ্রেণীর কাজের প্রতিবাদ করেছেন। এর প্রথম প্রমাণ, সতীদাহ বন্ধ করার জন্য কলকাতার ইউরোপীয়রা যে আবেদনপত্রটি তৈরি করেন হেয়ার তাতে স্বাক্ষর দেন।

প্রেস আইনের বিরুদ্ধে ১৮৩৫-এর ৫ জানুয়ারি টাউন হলে কলকাতার অধিবাসীরা এক সভা আহ্বান করেন। হেয়ার তাতে উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় ১৮২৪-এর প্রেস আইনকে বাতিল করতে এবং জনসভার উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে গভর্নর জেনারেলের কাছে এক আবেদনপত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া কোম্পানীর চার্টার নবীকরণ সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে আরেকখানি আবেদনপত্র পেশ করার সিদ্ধান্তও সেই সভা গ্রহণ করে। কলকাতাবাসীদের পক্ষ থেকে উক্ত আবেদনপত্রগুলিতে সই করার দায়িত্ব শেরিফের, এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করে হেয়ার সেই সভায় নিম্নলিখিত বক্তব্য পেশ করেন।

ইউরোপীয়দের সঙ্গে মিলিতভাবে দেশীয় ব্যক্তিরাও নিজেদের দাবীকে সমর্থন করায় তিনি উক্ত দিনটিকে ভারতের পক্ষে একটি গৌরবময় দিন বলে আখ্যা দেন। তিনি এই শহরের অনেক সভায় যোগ দিয়েছেন কিন্তু কোনটিতেই এত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাগম হয়নি। ইংলন্ডের জনসভার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সেখানেও শেরিফ উপস্থিত জনসাধারণের পক্ষ থেকে আবেদনপত্রে সই করেন।

উক্ত আবেদনগুলিকে কার্যে পরিণত করার জন্য ঐ সভায় যে কার্যনির্বাহি কমিটি গঠিত হয় হেয়ার তার সদস্য মনোনীত হন।

সুপ্রীম কোর্টের সদর দেওয়ানী আদালতে জুরির সাহায্যে বিচার করার দাবীতে ১৮৩৫-এর ৮ জুলাই কলকাতা টাউন হলে আরেকটি সভা হয়। সেই সভার পক্ষ থেকেও একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং হেয়ার সেটিরও সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন।

প্রাদেশিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে বিলাতের আদালতে আবেদন করার অধিকারকে হরণ করে সেই সময়ে একটি আইন গৃহীত হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে ১৮৩৬-এর ১৮ জুন কলকাতা টাউন হলে এক বিরাট জনসভা হয়। সেখানেও ডেভিড হেয়ার উপস্থিত ছিলেন। সভার উদ্যোক্তা ও কলকাতাবাসীদের পক্ষ থেকে আবেদনপত্র পেশ করতে এবং তাঁদের স্বার্থ-রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে একজন এজেন্ট নিযুক্ত করার পরামর্শ দেন তিনি। সেই এজেন্ট সভার নিযুক্ত একটি কমিটির নির্দেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করে কাজ করবে।[৪৩]

ইংরেজি শিক্ষার স্থায়িত্ব এবং ক্রমশ শিক্ষার্থীদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য

সরকারের বিভিন্ন কাজে ইংরেজি ভাষা প্রচলনের দাবীতে এক আন্দোলন সে-সময়ে গড়ে উঠেছিল। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে গভর্নর জেনারেলের কাছে একখানি আবেদনপত্র পেশ করা হয়। তাতে দাবী করা হয়, মফস্বল কোর্টের বিচারকেরা প্রয়োজনবোধে ইংরেজি, ফার্সী এবং বাংলা ভাষার মধ্যে যে-কোন একটি ভাষায় সওয়াল করতে এবং রায় দিতে পারবেন। এ আন্দোলনের সঙ্গেও হেয়ার যুক্ত ছিলেন।

ইংলন্ডের ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হওয়ার পর তার সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য কলকাতায় ১৮৩৯-এ একটি জনসমাবেশ হয়। তাতে যোগ দিয়ে হেয়ার রাজা কালীকৃষ্ণের আনীত প্রস্তাব সমর্থন করেন। এগ্রিকালচারাল ও হর্টিকালচারাল সোসাইটি, এশিয়াটিক সোসাইটি এবং জেলা চ্যারিটেবল সোসাইটির সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন।[৪৪]

উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে কুলির কাজে ভারতীয়দের মরিশাস দ্বীপে পাঠানো শুরু হয়। সকলেই স্বেচ্ছায় ঐ কাজে যেত না। অর্থনৈতিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে আড়কাঠিরা সে-সময়ে অনেককেই নানা প্রলোভন দেখিয়ে অথবা জোর করে মরিশাসে পাঠাত। কলকাতার পটলডাঙার একটি বাড়িতে এরকম একদল লোককে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে আটকে রাখা হয়েছিল। হেয়ার ঘটনাটি জানতে পেরে পুলিশের সাহায্যে তাদের মুক্ত করেন। এ ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে ক্রমশ জনমত বাড়তে থাকে এবং ১৮৩৮-এর ১০ জুলাই কলকাতার টাউন হলে এর প্রতিবিধানের দাবীতে একটি জনসভা হয়। ফলে তৎকালীন সরকার এ-সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য আগস্ট মাসে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। সেই কমিটির সামনে উপস্হিত হয়ে হেয়ার উক্ত প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য রাখেন।[৪৫]

বিভিন্ন কারণে তৎকালীন কলকাতার ছাত্র ও যুবকদের কাছে হেয়ার খুব প্রিয় ছিলেন। সেই সময়ে ডিরোজিও বাদে অন্য কারো সঙ্গে ছাত্র ও যুবকদের সম্পর্ক এত মধুর ছিল না। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর হেয়ারের সঙ্গে ডিরোজিয়ানদের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়। তবে একটি বিষয়ে হেয়ার ডিরোজিওকেও অতিক্রম করেছিলেন, তা হল হিন্দুসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। কারণ ডিরোজিওর ভাবধারা তাঁর ছাত্ররা সঠিকভাবে গ্রহণ করতে না পারায়, তাদের আচার-ব্যবহার, খাওয়া-দাওয়া, চাল-চলন ইত্যাদি সবকিছুই সমাজের কাছে নিন্দনীয় হয়ে ওঠে। এর ফলে তৎকালীন হিন্দুসমাজ ডিরোজিওর সমালোচনায় মুখর হয়েছিল। অপরদিকে হিন্দুধর্মের প্রতি হেয়ার কখনো বিদ্বেষভাব প্রকাশ করেননি; কারণ তাঁর মধ্যে কোন ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। তাই তৎকালীন হিন্দু-

সমাজের কাছে একটি চলমান প্রতিষ্ঠান হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন। স্বভাবতই তাঁর মৃত্যুতে কলকাতাবাসীরা শোকাহত হন। নানাভাবে তাঁর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়ে তাঁরা মূর্তিস্থাপন, স্মৃতি-বক্তৃতা এবং বাংলা রচনায় পারিতোষিক দানের জন্য বিশেষ অর্থভাণ্ডার স্থাপন করেন।

(১) রাজা কৃষ্ণনাথ রায় হেয়ারের স্মৃতিরক্ষার্থে কলকাতার মেডিকেল কলেজের থিয়েটারে ১৭ জুন একটি সভা আহ্বান করেন। সেই সভায় জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে হেয়ারের প্রতিমূর্তি স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে রাজা কৃষ্ণনাথ রায়, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল সিংহ, বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী, রামগোপাল ঘোষ, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, দিগম্বর মিত্র, রমাপ্রসাদ রায়, কৈলাসচন্দ্র দত্ত, রামচন্দ্র মিত্র, দীননাথ দত্ত, ব্রজনাথ ধর এবং প্যারীচাঁদ মিত্রকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। হরচন্দ্র ঘোষ উক্ত কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হন। প্রতিমূর্তিটি প্রথমে সংস্কৃত কলেজে স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং হেয়ার স্কুলের মাঝখানে একটি ফাঁকা জায়গায় সেটি স্থানান্তরিত হয়।[৪৬]

উক্ত কমিটি যখন চাঁদা আদায়ে ব্যস্ত ঠিক সেই সময়ে কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রতি বছর ১লা জুন ডেভিড হেয়ারের স্মৃতি উদ্‌যাপনের জন্য বন্ধু-বান্ধবদের কাছে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সেই প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে কিশোরীচাঁদ মিত্রের নিমতলার বাড়িতে হেয়ারের ৪০ জন বন্ধুবান্ধব মিলিত হন। রামচন্দ্র মিত্র সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং রেভাঃ কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী, রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও সভাপতি স্বয়ং উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন।

সম্মানের সঙ্গে হেয়ারের স্মৃতি উদ্‌যাপনের জন্য এই সভা ১লা জুনকে হেয়ার স্মৃতি দিবস হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং প্রতি বছরের স্মৃতিসভায় পূর্বনির্ধারিত কোন ব্যক্তিকে দিয়ে ভারতের নৈতিক ও বুদ্ধিগত উন্নতি সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেওয়ানোর সিদ্ধান্তও সেখানে গৃহীত হয়।

এই সিদ্ধান্তগুলিকে যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী রামচন্দ্র মিত্র, রামগোপাল ঘোষ এবং প্যারীচাঁদ মিত্রকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। কিশোরীচাঁদ মিত্র সে কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হন।[৪৭] এই কমিটি প্রতি বছর ১ জুন হেয়ার স্মৃতি দিবস হিসাবে পালন করত এবং সে সময় কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি ইংরেজি অথবা বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। নীচে বাংলা বক্তৃতার একটি তালিকা দেওয়া হল।

অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮৪৫, কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী ১৮৪৬ ও ১৮৫০, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৮৪৭, রাজনারায়ণ বসু ১৮৪৮, শ্যামাচরণ মুখার্জী ১৮৫২, শ্রীপতি মুখার্জী ১৮৫৬, কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৫৭, ১৮৬১ ও ১৮৬৩, নীলমণি দে ১৮৫৮, বিপ্রদাস ব্যানার্জী ও রঙ্গলাল ব্যানার্জী ১৮৬০, হেয়ারের স্মৃতিসভায় বক্তৃতা দেন।

১৮৪৪-এর ১ জুন ফৌজদারী বালাখানায় দ্বিতীয় স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। রামগোপাল ঘোষ সেই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সেখানে আলোচনা প্রসঙ্গে কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেন, শুধুমাত্র বাৎসরিক স্মৃতিসভা করেই হেয়ার স্মৃতিরক্ষা কমিটির কাজ শেষ করা সমীচীন হবে না, আরো কিছু কর্মসূচি এজন্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। সভায় ডেভিড হেয়ারের জীবনী প্রকাশের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছিল। সেই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে স্মৃতিরক্ষা কমিটি একটি প্রশ্নমালা তৈরি করেন এবং রাজারাম রায়ের মাধ্যমে সেটি জোসেফ হেয়ারের কাছে পাঠিয়ে দেন। কোন উত্তর না পাওয়ায় সিদ্ধান্তটি কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয়নি।

তাই সম্পাদক নিজেই সেই সভার কাছে দুটি প্রস্তাব পেশ করেন। চাঁদা তুলে হেয়ার প্রাইজ ফান্ড স্থাপন ও প্রতি বছর কমিটির নির্দেশমত বাংলা ভাষায় রচনা প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান এবং নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য লেখককে প্রাইজ ফান্ড থেকে অর্থ পুরস্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ। কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী প্রস্তাবটি ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখতে কমিটিকে পুনরায় অনুরোধ করেন এবং সম্ভব হলে সেই সিদ্ধান্তকে কার্যে পরিণত করার ক্ষমতা কমিটিকে দিতে সভার অনুমতি চান। ১৮৪৫-এর ২০ জুন উক্ত কমিটির একটি সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

১। দেশীয় ব্যক্তিদের শিক্ষার স্বার্থে ডেভিড হেয়ারের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রশংসনীয় নিরপেক্ষ উদ্যোগের কথা স্মরণ করে ওই কাজের সঙ্গে তাঁর নামকে যুক্ত করাই হল তাঁকে সম্মান দেখানোর প্রকৃষ্টতম পথ।

২। সেই উদ্দেশ্য পূরণ করতে হেয়ারের নামে চার হাজার টাকার একটি তহবিল গঠনের জন্য চাঁদা আদায় করা প্রয়োজন। তাই চাঁদা দিতে সম্মত ব্যক্তিরা একটি সভায় মিলিত হয়ে এক ব্যক্তির উপর ওই কাজের দায়িত্ব দেবে এবং আদায়ীকৃত সেই অর্থ সরকারের কাছে জমা থাকবে। সেই গচ্ছিত অর্থের সুদ থেকে কমিটি প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট শিরোনামের বাংলা রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করবে এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীকে পুরস্কার দেবে।

৩। কোন ক্রমেই চাঁদার চার হাজার টাকা সংগৃহীত না হলে, যে উদ্দেশ্য

নিয়ে টাকা আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল তা বাতিলযোগ্য হবে। কারণ স্থায়ী ব্যবস্থা করতে না পারলে প্রতিযোগিতা শুরু করা সমীচীন হবে না।

৪। নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ সংগৃহীত হওয়ার পর, চাঁদাদাতাদের সভা আহ্বান করে একটি পরিচালকমণ্ডলী গঠন এবং পরিচালনার সুবিধার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন তৈরি করতে হবে।

প্রথমে দেশীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে ১৮০০ টাকা সংগৃহীত হওয়ায়, কমিটি ইউরোপীয়দের কাছ থেকেও চাঁদা আদায়ের কথা ভাবেন এবং দেশীয় শিক্ষার হিতৈষী কয়েকজন ইউরোপীয় ব্যক্তির কাছ থেকে ৮০০ টাকা সংগৃহীত হয়। এই অর্থের উপর নির্ভর করে, কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়ঃ

১। আদায়ীকৃত অর্থ সরকারের হেফাজতে জমা থাকবে এবং তার সুদ থেকে একটি করে পুরস্কার দেওয়া হবে।

২। তহবিলটির জন্য আরো অর্থ সংগৃহীত হলে এবং টাকার পরিমাণ ৪০০০ টাকা অথবা বেশী হলে পুরস্কারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

৩। বেঙ্গল ব্যাংককে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

৪। শ্যামাচরণ সেনের প্রস্তাবে এবং হরমোহন চ্যাটার্জীর সমর্থনে রামগোপাল ঘোষ, হরিমোহন সেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে তিনজনের একটি পরিষদ গঠন করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর চাঁদা আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়।[৪৮]

রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতার বিচারকমণ্ডলী গঠিত হয়। তাঁদের নির্দেশমত নিম্নলিখিত প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হয়।

বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে রচনা প্রতিযোগিতায় হিন্দু কলেজের সিনিয়ার ছাত্র সীতানাথ ঘোষ ১০০ টাকা পুরস্কার পান।

সংস্কৃত কলেজের তারাশঙ্কর শর্মা স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে রচনার জন্য ৭৫ টাকা পুরস্কার পান।

পণ্ডিত হরিনাথ শর্মাকে তাঁর বাংলা রচনা 'বাংলা সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা এবং উন্নতির শ্রেষ্ঠ উপায়'-এর জন্য ১৮৫০-এ ১০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।

ডেভিড হেয়ারের জীবনী নিয়ে একটি রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করার কথা ১৮৫১-র কমিটিতে আলোচিত হয়। সে-সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। তার পরিবর্তে 'প্রাচীন ও বর্তমান সময়ের আদর্শ মহিলাদের জীবনী' নিয়ে একটি রচনা প্রতিযোগিতা কমিটি আহ্বান করে

এবং সেজন্য ১২০ টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়। কিন্তু ঐ-বিষয়ে কোন রচনা পাওয়া যায়নি।

১৮৫৩-য় পণ্ডিত হরনাথ শর্মাকে শ্রেষ্ঠ বাংলা রচনা 'কোন জাতির মহত্ত্বের কারণ' এর জন্য ২০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।

পরবর্তীকালে কমিটি 'বর্তমান বাংলার সামাজিক উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণীয়?' এই শিরোনামে একটি রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করে। এ-বিষয়ে একটিমাত্র প্রবন্ধ জমা পড়ে এবং তা নির্দিষ্ট মানের না হওয়ায় লেখককে মাত্র ১০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।

'শারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা'—এই বিষয়ে তিনটি প্রবন্ধের মধ্যে রঙ্গলাল ব্যানার্জীর প্রবন্ধটি শ্রেষ্ঠ হওয়ায় তাঁকে ১০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।

'বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা এবং বাংলার বহির্বাণিজ্যের ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত রচনা প্রতিযোগিতায় একটিমাত্র প্রবন্ধ পাওয়া যায় এবং লেখককে ২৫০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।

'ভারতে ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ের প্রবর্তন, বিকাশ ও বর্তমান অবস্থায় জনসাধারণের উন্নতির ক্ষেত্রে তার অবদান এবং রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে তার প্রভাব'—এই বিষয়ে প্রবন্ধের জন্য ৪০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করায় চারটিমাত্র প্রবন্ধ জমা পড়ে। উপযুক্ত মানের না হওয়ায় কাউকেই পুরস্কার দেওয়া হয়নি।

এই অবস্থায় প্যারীচাঁদ মিত্র বিচারকমণ্ডলীর কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। তাতে বলা হয়, এতদিন বাংলা রচনা প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে বহু বিষয়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমানে 'হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ড বুকস' নাম দিয়ে কোন একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক বিষয়কে কেন্দ্র করে রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলে, ভালো হবে কিনা, তা ভেবে দেখা একান্ত প্রয়োজন।

বিচারকমণ্ডলী সম্মত হলে, তহবিলের সমস্ত সদস্যদের নিয়ে একটি সভা করার জন্য তিনি প্রস্তাব দেন।

এই প্রস্তাব অনুসারে 'হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ডে'র সমস্ত চাঁদাদাতাদের নিয়ে ১৮৬৪-র ২০ অক্টোবর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন হলে একটি সভা হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সেখানে গৃহীত হয়।

১। বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থাটি উপযুক্তভাবে কার্যকর না হওয়ায়, বর্তমানে 'হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ডে'র সমস্ত অর্থই মেয়েদের উপযোগী উপযুক্ত মানের বাংলা বইয়ের জন্য খরচ করা হবে।

২। তাই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বর্তমান বিচারকমণ্ডলী (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ এবং কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী) উপর প্রয়োজনমত সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করার ক্ষমতাসহ সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া হল।

৩। সম্পাদক পদ থেকে কিশোরীচাঁদ মিত্র পদত্যাগ করায় প্যারীচাঁদ মিত্র ঐ পদে মনোনীত হন।

৪। হেয়ারের স্মৃতিরক্ষা করার জন্য কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত এবং প্রকাশিত প্রতিটি বইয়ের নামপত্রে 'হেয়ার প্রাইজ ফান্ড এসেজ' কথাটি ছাপা থাকবে।

৫। কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিটি বইয়ের স্বত্বাধিকার লেখকদের থাকবে।

৬। সভার বিজ্ঞাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ 'হেয়ার প্রাইজ ফান্ড' থেকেই খরচ হবে।

রামগোপাল ঘোষ ১৮৬৭ সালে বিদায় নেওয়ায় শিবচন্দ্র দেবকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়।

নূতন কমিটির তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত বইগুলি প্রকাশিত হয়ঃ

(১) শিবচন্দ্র দেবের অধ্যাত্ম বিজ্ঞান।

(২) গোপীকৃষ্ণ মিত্রের মহিলাবলী।

(৩) বামাবোধিনী পত্রিকা থেকে নির্বাচিত বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ সংকলন। সংকলক শিবচন্দ্র দেব।

(৪) হিন্দু মহিলাদের লিখিত রচনার সংকলন।

উক্ত কমিটি প্রাণনাথ দত্ত চৌধুরীর 'শিল্প শিক্ষা' বইটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৪৯] শেষপর্যন্ত বইটি প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তা জানা যায়নি।

দুঃখের বিষয়, এই কর্মধারা উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত স্থায়িত্বলাভ করেনি। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বর্তমান প্রজন্মের কাছে ডেভিড হেয়ারের কীর্তিকলাপ এবং তাঁর স্মৃতিসভার কর্মসূচি সম্পূর্ণই অজ্ঞাত। এর সম্ভাব্য কারণগুলি নিম্নরূপঃ

(১) পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন ছিল ডেভিড হেয়ারের মূল উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তিনি কলকাতাকেই কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। কলকাতার বাইরের বিরাট জনসমাজ তাঁর কাছে সম্পূর্ণই উপেক্ষিত ছিল। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন কলকাতার জনসমাজ শিক্ষিত হয়ে দেশের অন্যান্য অংশকে পথ দেখাবে। এদিক দিয়ে তিনি ছিলেন 'ফিলট্রেশন' থিওরির প্রবক্তাদের সমগোত্রীয়। তবে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা পার্থক্য ছিল। 'ফিলট্রেশন' থিওরির সমর্থকেরা মনে করতেন সমাজের অবস্থাপন্ন শ্রেণী শিক্ষিত হয়ে, দেশের অন্যান্য শ্রেণীকে শিক্ষা দেবে।

অপরদিকে হেয়ার মনে করতেন, একটি অঞ্চল শিক্ষার আলোকে আলোকিত হলে, অন্যান্য অঞ্চলও আলোকিত হবে। কিন্তু নানা কারণে উভয় দৃষ্টিভঙ্গির কোনটিই সাফল্যমণ্ডিত হয়নি।

(২) হেয়ারের কর্মসূচি অনুসরণ করার মত উপযুক্ত লোক তখন ছিল না। হেয়ারের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা তাঁর চিন্তাধারা ও আদর্শকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পেঁাছে দিতে পারেননি এবং সমাজের সমস্ত শ্রেণীর কাছে তাঁরা স্বীকৃতিলাভ করেননি। তাই তাঁদের সঙ্গে হেয়ারের স্মৃতিসভার প্রয়োজনও শেষ হয়ে যায়।

(৩) অর্থনৈতিক সংকটের জন্য বাংলা পাঠশালাগুলিকে বন্ধ করে দেওয়ায় হেয়ারের কর্মসূচি বহুলাংশেই ম্লান হয়ে যায়। কারণ ঐসমস্ত পাঠশালাগুলির মাধ্যমেই হেয়ারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। পাঠশালা-গুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হেয়ারের কর্মক্ষেত্রও অনেক সংকুচিত হয়ে পড়ে। অপরদিকে কলকাতার অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানদের যখন ইংরেজি শিক্ষা দিতে উদ্‌গ্রীব তখন সেইসমস্ত ছাত্রদের স্থান সংকুলানের ক্ষমতা হেয়ারের ইংরেজি স্কুলের ছিল না। বাধ্য হয়েই অভিভাবকেরা অন্যান্য ইংরেজি স্কুলের সন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। সেই সুযোগে ঐ সময়ে অনেক ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়। হেয়ারের কর্মপ্রয়াসের সঙ্গে ঐসমস্ত স্কুলের ছাত্ররা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল।

(৪) উনিশ শতকের শেষদিকে রাজনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় হেয়ার স্মৃতিসভার আকর্ষণও হ্রাস পায়। বক্তৃতার জন্য পরিবর্তিত পরিস্থিতির উপযোগী বিষয়বস্তু নির্বাচনে স্মৃতিরক্ষা কমিটি অপারগ ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৪ মার্চ ১৮৭৮ ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয়। ঠিক ঐ বছরই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'লর্ড মেকলে ও উচ্চশিক্ষা' এই বিষয়ে ইংরেজিতে হেয়ার স্মৃতি বক্তৃতা দেন। তিনি যদি ঐ সময় 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ডেভিড হেয়ার' এই সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেন তাহলে তা সময়োপযোগী হত। কেননা ডেভিড হেয়ার সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন।

তথ্যসূত্র

১। Adam, W—State of Education in Bengal; 2nd Reprint

২। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ (শিবনাথ রচনা সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, পৃ. ২৫২)

৩। Mitra, P. C.—A Biographical sketch of David Hare, Calcutta, 1877, p. 5

৪। Ibid, p. 35

৫। বসু, রাজনারায়ণ—সেকাল আর একাল; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৫৮, পৃ. ২৪—২৬

৬। The Government Gazattee, (Supplementary) 1820, 6th January

৭। Mitra, P. C.—A Biographical sketch of David Hare, p. 5

৮। Bryce, James—Sketch of native education in India, London, 1839, pp. 329—330

৯। Ibid, pp 65—67

১০। Ibid, pp. 330—331

১১। Ibid, pp. 84—87

১২। Mackay—History of native education in Bengal, Calcutta Review, 1852, vol. 17, pp. 342—348

১৩। Ibid, pp. 349—350

১৪। Mitra, P. C.—A Biographical sketch of David Hare, pp. 38—39

১৫। কলিকাতা স্কুল সোসাইটি, একক, শীত-বসন্ত সংখ্যা, ১৩৯১, পৃ, ১—৩১

১৬। Unpublished Reports of the Calcutta School Book Society; Comp. by Radha Raman Mitra, Bengal Past & Present, 1977, vol. 96, pt. 2 p. 143

১৭। Stark, H.A.—Vernacular education in Bengal from 1813 to 1912. Calcutta, 1916, p. 9

১৮। Unpublished Report of the Calcutta School Society, p. 154

১৯। Ibid, pp. 159—160

২০। Ibid, pp. 154—155

২১। Ibid, pp. 157—159

২২। Ibid, pp. 142—147

২৩। বাসঘোষ, যোগেন্দ্রনাথ—নীতিগ্রন্থ, কলিকাতা, ১২৯৮, পৃ. ৯৭—১১১

২৪। Report of the Calcutta School Book Society, 1818—1823 &, 1824—1835

২৫। Seventh Report of the Calcutta School Book Society, 1826—27 p. VII

২৬। Ibid, Appendix no. 1, pp. 23—24

২৭। Ibid, pp. 25—26

২৮। Ninth Report of the Calcutta School Book Society, 1830—1831 Appendix no. 1, pp. 21—22

২৯। Eighth Report of the Calcutta School Book Society, 1828—1829, p. VI

৩০। Eleventh Report of the Calcutta School Book Society, 1834—1835 p. III

৩১। Ibid, PP. III—V

৩২। Dr. Bramley's Report, quoted in : Mitra, P. C.—A Biographical sketch of David Hare, pp. 131—132, foot-note

৩৩ Sarkar, Mahendralal—Hare anniversary Lecture 1876

৩৪। Banerjee, Surendra Nath—Hare anniversary Lecture 1878

৩৫। Report of the General Committee of Public Instruction, 1836, pp. 163—166

৩৬। Report of the Fever Hospital Committee proceedings of the Governors of the Native Hospital relative to the establishment of a fever hospital for the relief of natives, Appendix A, pp. Clii—Cliv

৩৭। Ibid, pp. Clxi—Clxii

৩৮। Banerjee, K.M.—A discourse delivered at the Hindu College in the Hare anniversary, Friday June 1, 1849. Calcutta, 1849. pp. 5—7

৩৯। History of native education in Bengal, Calcutta Review. 1852, vol. 17, pp. 355—358

৪০। কলিকাতা স্কুল সোসাইটি, একণ, শীত-বসন্ত সংখ্যা, ১৩৯১, পৃ, ২৪

৪১। দাশগুপ্ত, কল্যাণকুমার—ডেভিড হেয়ারের ধর্মমত, ডেভিড হেয়ার ও উনিশ শতকের বাংলা ; নির্মলকুমার ঘোষ ও বীণা চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা. ১৯৭৬, পৃ, ৩৩

৪২। Mitra, P.C—A Biograhical sketch of David Hare, p. 65

৪৩। Ibid, pp. 69—70

৪৪। Ibid, pp. 71—72

৪৫। Ibid, pp. 69—70

৪৬। Ibid, pp. 79—80

৪৭। Ibid, pp. 82—83

৪৮। Ibid, pp. 83—87

৪৯। Ibid, pp. 105—109

স্মৃতিরক্ষা

মৃত মেং ডেবিড হিয়ার ।

আমরা অতিশয় খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে সাধারণ হিতৈষী এবং হিন্দুদিগের পরমোপকারী মেং ডেবিড হিয়ার সাহেব ওলাউঠা রোগের বশবর্ত্তী হইয়া বর্ত্তমান মাসের প্রথম দিবসে বেলা প্রায় ৬ ঘণ্টার সময় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, মরণের পূর্ব্বদিবসীয় রাত্রি ১ ঘটিকাসময়ে তাঁহার ঐ মহারোগের সঞ্চার হয়, উক্ত মহাশয়ের বয়ঃক্রম ৬৭ বৎসর হইয়াছিল, আমারদিগের বোধ হয় যে তাঁহার অনেক হিন্দু বন্ধুগণের পক্ষে এই মৃত্যু সম্বাদ অকস্মাৎ বজ্রাঘাত তুল্য হইয়াছিল; বহুসংখ্যক বাঙ্গালিরা শোকে কাতর হইয়া তাঁহার মৃতদেহে সম্মান প্রদানার্থে গিয়াছিলেন যে পর্য্যন্ত তাঁহার শরীর মেং গ্রে সাহেবের বাটীতে ছিল তাবৎ প্রায় হিন্দুগণ দ্বারা বেষ্টিত দেখিয়াছি তৎকালে তাহারা সকলে দুঃখসাগরে মগ্ন ও অন্তঃকরণ মধ্যে নিতান্ত অসুখী হইয়া কেহ একদৃষ্টিতে মৃতকায় নিরীক্ষণ করিতেছিলেন কেহ বা অনুপম গুণানুবর্ণনে ব্যাকুল ছিলেন এবং কেহ তাঁহার প্রাণ বিয়োগে বিষাদ প্রকাশ করিতেছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার মুখের প্রতিমূর্ত্তি করাইবার নিমিত্তে সচেষ্টিত হইয়া মেং মেণ্ডি সাহেবকে আনয়ন করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ সাহেব তাঁহার বদন বিলক্ষণ-রূপে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন যে কালাতীত প্রযুক্ত তৎকর্ম্ম উত্তমরূপে সম্পন্ন হইবেক না। পরে বেলা ৫॥ ঘটিকার সময়ে শবানুগমনার্থে উক্ত গ্রে সাহেবের বাটীতে বিস্তর ভদ্রলোকের সমাগম হইলে তাহারা সকলে একত্র হইয়া মৃতদেহের পশ্চাতে হিন্দুকালেজের দক্ষিণ গোলদীঘীর ধারে গমন করিয়াছিলেন যদ্যপিও তদ্দিনে মেঘাড়ম্বর প্রযুক্ত আকাশের সুগতি ছিল না তথাপি তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দর্শনার্থে প্রায় পঞ্চসহস্র লোক আসিয়াছিলেন।

মেং হিয়ার সাহেব ইং ১৮০০ সালে ঘটিকাযন্ত্র নির্ম্মাণ কর্ম্ম করণার্থে এতন্নগরে আগমন করেন, তিনি কিয়দ্বৎসর পর্য্যন্ত ঐ ব্যবসা করিয়া পরে মেং গ্রে সাহেবকে তৎকর্ম্মার্পণ করিয়াছিলেন। ব্যবসা দ্বারা তাঁহার যে ধন সঞ্চিত হইয়াছিল তৎসহিত স্বদেশে প্রত্যাগমন না করিয়া এতদ্দেশীয় লোকদিগের বিদ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে স্বীয় ধন ও সময় ক্ষয় করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন অতএব প্রথমে স্কুল সোসাইটীর স্থাপনে অনেক সাহায্য ও বঙ্গভাষা শিক্ষা প্রদানের সদুপায় করেন এবং এতন্নগরীর নানা স্থানস্থ পাঠশালায় স্বয়ং গমনাগমন করত শিক্ষক ও ছাত্রদিগের উৎসাহার্থে সময়ে ২ টাকা ও পুস্তক পারিতোষিক

দিতেন পরে হিন্দু বালকদিগের নিয়মমতে বঙ্গভাষা শিক্ষার নিমিত্তে আপনার কর্ত্তৃত্বাধীনে পটলডাঙ্গায় এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন আমাদিগের বোধ হয় যে তাহাতেও সাধারণের উপকার হইয়াছিল।

ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা প্রদানেও তাঁহার তদ্রূপ মনোযোগ ছিল কারণ বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রকারে জ্ঞানোৎপাদক পুস্তকসকলের অভাব প্রযুক্ত তিনি স্বীয় ব্যবসা পরিত্যাগাবধি এতন্নগরস্থ সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য হিন্দুদিগের সহিত আলাপ করত তাঁহাদিগের বালকদিগকে ইংলণ্ডীয় ব্যুৎপাদক শাস্ত্র ও দর্শনবিদ্যা শিক্ষা করাইতে পুনঃ২ অনুরোধ করিতেন এবং ইং ১৮১৬ শালে এতদ্দেশীয় ধনবান্ বাঙ্গালি মহাশয়দিগের সাহায্যে হিন্দু কালেজ স্থাপিত করেন। তিনি ঐ বিদ্যালয়ের উন্নতির নিমিত্তে অতিশয় যত্নবান হইয়া তৎপ্রতি যে২ উপকার করিয়াছেন তাহা ঐ শিক্ষালয়ের আদ্যন্ত বিবরণ মধ্যে এক প্রধান চিরস্মরণীয় ইতিহাস হইবেক আর তিনি উক্ত বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ প্রযুক্ত কেবল যে নির্দ্ধারিত কোন সময়ে কখন২ আসিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এমত নহে কিন্তু প্রায় প্রত্যহ তথায় উপস্থিত হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতেন এবং প্রত্যেক বালকের পাঠ বিবরণ ও বিদ্যালয়ে আগমন অনাগমন, শারীরিক কুশলাদি এবং বিদ্যামন্দিরে ও বাটীতে কি প্রকার ব্যবহার ইত্যাদির অনুসন্ধান করিতেন এবং অমনোযোগি ও কুব্যবহারি ছাত্রদিগকে পিতৃবৎ স্নেহভাবে অনুযোগ করিতেন ও সুশিক্ষিত সদগুণ বালকদিগকে উৎসাহ ও পুরস্কার প্রদান করিতেন আর ছাত্রদিগের মধ্যে যে২ বিবাদ উপস্থিত হইত তাহা স্বয়ং ভঞ্জন করিতেন, এবং বালকদিগের পিতামাতা অথবা অন্য অভিভাবকেরা কোন বিষয়ের নিমিত্তে অনুরোধ করিলে তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতেন এইরূপে বিদ্যামন্দিরের সুন্দররূপ নির্ব্বাহ ও শ্রীবৃদ্ধির উপায়ানুসন্ধানে সাধ্যানুসারে তাঁহার ত্রুটি ছিল না।

স্কুল সোসাইটীর বিদ্যালয়ের উন্নতির নিমিত্তেও তাঁহার অতিশয় যত্ন ছিল তিনি ঐ পাঠশালার অনেক২ সুশিক্ষিত ছাত্রকে হিন্দুকালেজে প্রেরণ করেন বোধ হয় ঐ বিদ্যালয় ব্যয় বিষয়ে সোসাইটী অপেক্ষা তাঁহায় দ্বারা যথেষ্ট আনুকূল্য প্রাপ্ত হইত। শেষাবস্থায় ছোট আদালতের কর্ম্মানুরোধে যদ্যপিও দিবাভাগে ঐ পাঠশালায় উপস্থিত থাকিতে অক্ষম হইয়াছিলেন তথাপি বেলাবসানে তথায় যাইতেন এবং রাত্রি পর্য্যন্ত থাকিয়া তাহার তাবদ্বিষয়ের নিগূঢ় অনুসন্ধান করিতেন আর তাঁহার প্রতি মেডিকেল কালেজের রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকাতে তিনি প্রাচীন হিন্দুদিগের সহিত আলাপদ্বারা এতদ্দেশীয় লোকদিগের ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার প্রতি যে দ্বেষ ছিল তাহার হ্রাস করিয়াছিলেন নতুবা এদেশীয় লোকেরা স্ব২ বালকদিগকে তথায় শিক্ষার্থ প্রেরণ করিতে শীঘ্র সম্মত হইতেন না। উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ যে প্রকার তাঁহাকে মান্য করিতেন ও তাঁহার

বিয়োগে যদ্রূপ কাতর আছেন ইহাতে বোধ হইতেছে যে ঐ বিদ্যামন্দিরের উন্নতির নিমিত্তে বিশেষ চেষ্টা করিতেন। এতদ্দেশীয় লোকদিগের বিদ্যাবৃদ্ধির নিমিত্তে যে ২ শিক্ষা সমাজ ও বিদ্যালয় হইয়াছে তাহার তাবতে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন। তিনি এতদ্দেশীয় বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার অনেক সদুপায় সৃজন ও তাহার বৃদ্ধি করিয়াছেন কেবল তজ্জন্যে আমরা কৃতজ্ঞতা ও মান্যতা পূর্ব্বক তাঁহার নাম স্মরণ করিতেছি এমত নহে কিন্তু পীড়িত ব্যক্তির রোগশান্তি, বিপদগ্রস্ত লোকের সান্ত্বনা, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সৎপরামর্শ কথন, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দান, এবং নির্ধনের সাহায্য করণ ইত্যাদি বিষয়ে সর্ব্বদা ব্যগ্র ও অভিরত থাকাতে তাঁহার প্রতি এদেশের আবালবৃদ্ধবণিতাদি তাবৎলোকের শ্রদ্ধা ছিল। ভিন্ন জাতীয়দিগের উপকারার্থে স্বীয় সময় ও ধনব্যয় পূর্ব্বক আত্মশ্লাঘা ত্যাগ করিয়া প্রবৃত্ত হইতে এবং পৃথিবীর যাবতীয় সুখাভিলাষ বিহীন হইয়া কেবল পরপোকারকে পরম সুখ জ্ঞান করত নিয়ত তদনুষ্ঠান করিতে ইঁহার তুল্য অন্য কেহই দৃষ্ট হয় নাই।

উল্লেখিত এই সকল সদ্গুণ ভিন্ন সাধারণ মঙ্গলার্থে তাঁহার অতি প্রশংসনীয় উৎসাহ ছিল, কলিকাতায় যে ২ সৎকর্ম্ম হইয়াছে তাহার তাবতে প্রায় তিনি সাহায্য করিয়াছেন, সকল ব্যক্তির স্মরণ থাকিতে পারে যে জুরিদিগের দ্বারা দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার, মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা, বর্ত্তমান চার্টরের অন্যায্য বিষয় সংশোধন ও আদালতে পারস্য ভাষার ব্যবহার রহিত করণ ইত্যাদি বিষয়ের সুসিদ্ধির নিমিত্তে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, আর কুলি লোকদিগকে দেশান্তরে লইয়া তাহাদিগের উপরে যে অত্যাচার হইত তন্নিবারণার্থে তিনি বিবিধ প্রকারে যত্ন পাইয়াছিলেন এবং পটলডাঙ্গায় বলদ্বারা অবরুদ্ধ কতিপয় ধাঙ্গড় অর্থাৎ ইতর লোককে মুক্ত করিয়াছিলেন এবং সাধারণ ক্লেশ নিবারণার্থে ও মঙ্গলজনক বিষয়ের আবেদন নিমিত্তে যখন যে সভা হইত তাহাতেই উপস্থিত থাকিয়া তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন আর কলিকাতাস্থ প্রায় সকল সোসাইটীতেই তাহার গতিবিধি ছিল এবং তাহাদিগের মঙ্গলার্থে স্বীয় ক্ষমতানুসারে যথেষ্ট আনুকূল্যও করিয়াছেন।

এতাদৃশ সচ্চরিত্র ও সৎকর্ম্মশালি মেং ডেবিড হিয়ার সাহেব কেবল অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের উপকারার্থে বহুকাল পর্য্যন্ত অভিরত ছিলেন অতএব তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করণে আমাদিগের সাধ্যানুসারে বিশেষ যত্ন বিধান কর্ত্তব্য। লোকেরা স্বভাবত সর্ব্বদাই আমাদিগকে নিরুদ্যম বলিয়া থাকে ইহাতে যদি আমরা অতিশীঘ্র ঐ দয়ালু মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক অস্মদাদির বংশাবলির মধ্যে তাঁহার নাম স্মরণের উপায় না করি তবে পৃথিবীস্থ লোকদিগের সমীপে আমাদিগের মনুষ্যত্ব থাকিবেক না তন্নিমিত্তে আমরা এতন্নগরস্থ মান্য হিন্দুমহাশয়গণকে বিনয় পুরঃসর নিবেদন করিতেছি যে তাহারা অতিত্বরায় এক

সভা করিয়া উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করুন বোধ হয় যে মেডিকেল কালেজ সেই 'সভার উপযুক্ত এবং সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট স্থান হইতে পারিবেক। আমাদিগের বাসনা এই যে কেবল এতদ্দেশীয় লোকদিগের নিকট হইতে চাঁদা স্বরূপে কতক টাকা সংগৃহীত হইয়া তাঁহার চিরস্মরণার্থে এক প্রতিমূর্ত্তি হয় এবং যে স্থানে তাঁহার স্তম্ভ নির্ম্মাণের সূচনা শুনিতেছি তাহার নিকটে ঐ প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত থাকে। এস্থলে যদ্যপিও তাঁহার স্মরণ যোগ্য অথচ সাধারণের উপকার জনক অন্যান্য সম্মান চিহ্নের প্রস্তাব হইতে পারে তথাপি আমাদিগের বিবেচনায় বোধ হয় যে প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা যাদৃশ উত্তমরূপে স্মরণ ও মনোমধ্যে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধার উদয় হইতে পারে অন্য কোন চিহ্নদ্বারা তদ্রূপ হইবেক না।

অতএব আমরা আশ্বাস করি যে এই প্রস্তাব সকলে অন্তঃকরণ সহিত গ্রহণ করিয়া এতৎকর্ম্ম সম্পাদনে সত্বর হইবেন।

উক্ত কএক পংক্তি লিখনান্তর আমরা অবগত হইলাম যে রাজা কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুর এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া ১৭ জুন শুক্রবার বেলা ৪ ঘন্টার সময়ে মেডিকেল কালেজে এক সভা করিবার আহ্বান পত্র প্রকাশ করিতেছেন ঐ পত্রে অধিক ব্যক্তির স্বাক্ষর থাকলে উত্তম হইত তথাপি তাহাতে আমাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র আপত্তি নাই যাহা হউক রাজাবাহাদুরকে আমাদিগের প্রশংসা করিতে হইবেক, আর তিনি যে ঐ সভাতে অধিক মান্য ব্যক্তির সমাগমার্থে ও উক্তি কার্য সমাধার নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহকরণে বিশেষ যত্ন করিবেন তাহাতে আমরা সন্দেহ করি না। আমাদিগের বোধ হয় হিন্দুদলস্থ তাবৎ সম্ভ্রান্ত লোকেরা ও মেং হিয়ার সাহেবের ভক্ত ব্যক্তিরা সকলেই এ বিষয়ে সাহায্য করিবেন। আমরা রাজা বাহাদুরকে অনুরোধ করি যে তিনি ইতিমধ্যে সাধারণ বিজ্ঞাপনার্থে সকল বাঙ্গালা সমাচার পত্রে ঐ সভার কল্পনা প্রকাশ করুন এবং সভার দিবসে প্রত্যেক বাঙ্গালী পল্লীর প্রকাশ্য স্থানে ঐ সভার সমাচার লিখিয়া সংলগ্ন করিয়া দিউন।

—The Bengai Spectator, June 14, 1842.

মৃত মেং ডেবিড হিয়ার সাহেবের নিমিত্ত সভা।

মৃত মেং হিয়ার সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্তে ইংরাজী ১৭ জুন বেলা ৪ ঘণ্টার সময়ে মেডিকেল কালেজে যে এক সভা হয় তাহাতে অধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল। ঐ সভাতে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর সভাপতি হইলে শ্রীযুত বাবু দিগম্বর মিত্র, কাপ্তেন ডি. এল রিচার্ডসন সাহেব, শ্রীযুত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, এবং রেবেরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই বক্তৃতা করিলেন যে উক্ত হিয়ার সাহেব এতদ্দেশীয় জনগণের বিদ্যা বৃদ্ধি ও সাধারণ মঙ্গলের নিমিত্ত সর্ব্বদা উৎসাহী ও যত্নবান্ থাকাতে

এদেশের পক্ষে অসীম উপকার হইয়াছে। কিঞ্চিৎকাল বাদানুবাদের পরে উক্ত সভাতে এই ধার্য্য হইল যে চাঁদা করিয়া হিয়ার সাহেবের চিরস্মরণার্থে এক প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা উচিত। এই বিষয় সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে নিম্নলিখিত মহাশয়েরা কমিটিরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন ও তাঁহাদিগের প্রতি এমত ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে যে তাঁহারা ঐ পদে অন্যান্য ব্যক্তিকেও নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

রাজা কৃষ্ণনাথ রায়	বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ
,, সত্যচরণ ঘোষাল	রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী
বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	বাবু রামগোপাল ঘোষ
,, নন্দলাল সিংহ	রেবেরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
,, হরচন্দ্র ঘোষ	বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে উক্ত সভার আহ্বান পত্র প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে এদেশের কতিপয় মান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত ঐ বিষয়ের পরামর্শ না হওয়াতে তাঁহারা সভায় আগমন করেন নাই, এক্ষনে যাহা গত হইয়াছে তাহার বৃথা অনুশোচনা করিব না কিন্তু আমরা তন্মহাশয়দিগকে নিবেদন করি যে তাঁহারা বিবেচনা করুন টাকা অথবা সাহায্যাভাবে উক্ত মহোপকারির স্মরণীয় চিহ্ন সম্পন্ন না হইলে আমাদিগের কত লজ্জার বিষয় হইবে? অতএব ভরসা করি সকলে মনোমালিন্য দূর করিয়া সভার নির্দ্ধারিত কর্ম্ম সমাধার নিমিত্ত অনুৎসাহী হইবেন না এবং এই সৎকর্ম্মে যিনি যেরূপ দান ও সাহায্য করিতে পারেন তাহাতে সকলে অগ্রগ হইবেন। আমরা আশ্বাস করিয়াছি যে আগামি মাসীয় পত্রে চাঁদা বিষয়ের সুসম্বাদ প্রকাশ করিতে পারিব।

—The Bengal Spectator, July, 1842.

মৃত মেং হিয়ার, ফ্রেণ্ড আব ইণ্ডিয়া ও চর্চ্চ আব ইংলণ্ড মেগেজিন।

শ্রীযুত বেঙ্গাল স্পেক্টেটর সম্পাদক মহাশয়েষু।

হে মহাশয়,

মৃত মেং ডেবিড হিয়ার সাহেব নিয়ত সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করত কালযাপন করিয়াছেন ইহাতে মনুষ্য মণ্ডলীরা তাঁহার প্রতি যেরূপ কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রকাশ করিয়াছেন আমার বোধ হয় অন্য কোনো ব্যক্তি কখনই তদ্রূপ সম্মানের পাত্র হয়েন নাই।

কিন্তু হে সম্পাদক মহাশয় আমার দুঃখের বিষয় এই যে উক্ত সদ্গুণান্বিত সাহেবের মৃত্যুর পর ফ্রেণ্ড আব ইণ্ডিয়া এবং চর্চ্চ আব ইংলণ্ড মেগেজিন পত্র সম্পাদকেরা মিথ্যা দোষারোপ করিয়া তাঁহার অনেক নিন্দা করিয়াছেন; ফ্রেণ্ড আব

ইণ্ডিয়া সম্পাদক কহেন যে হিয়ার সাহেব নাস্তিক ছিলেন অর্থাৎ তিনি বাইবেল মানিতেন না এবং খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের প্রতি দ্বেষ করিতেন আর শিক্ষাদানের যে প্রকার রীতি করিয়াছিলেন তাহাতে ধর্ম্মোপদেশের সম্পর্ক না রাখাতে বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রগণকেও ধর্ম্মের বাহির করিয়া গিয়াছেন। এতদ্দেশীয় লোকদিগের প্রতি খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের উপদেশ করা আবশ্যক কিনা ও হিয়ার সাহেবের শিক্ষাদানের রীতি নিন্দাযোগ্য কি না এই প্রশ্নের এস্থলে আন্দোলনের প্রয়োজন নাই কিন্তু আমরা উক্ত সম্পাদক মহাশয়কে এই মাত্র অনুযোগ করি যে হিয়ার সাহেব যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁহার বিপক্ষে একটী কথাও কহেন নাই, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এখন এরূপ মিথ্যা গ্লানি করা অতি অনুচিত এবং ইহাতে সম্পাদকেরই অমনুষ্যত্ব প্রকাশ হইবেক আর তৎসম্পাদক মহাশয় এক্ষণে নিন্দা অথবা প্রশংসা যাহা করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন তাহাই করুন কিন্তু তাহাতে ঐ মহাত্মার কিছুই ক্ষতি হইবেক না। আমরা জানিতাম যে লোকে বাস্তবিক দোষি ব্যক্তিরও মৃত্যু হইলে তাহার দোষাংশে দৃষ্টি না করিয়া কেবল গুণানুবর্ণন করিয়া থাকে কিন্তু কি আশ্চর্য্য উক্ত বিজ্ঞ সম্পাদক, হিয়ার সাহেবের মিথ্যা দোষ উদ্ভাবন করিয়া সাধারণ জনগণের নিকটে নিন্দা করিতেছেন।

এতদ্দেশের আচার ব্যবহারাদি বিশেষরূপে বিবেচনা করিলে অবশ্য প্রতীতি হইবেক যে হিয়ার সাহেবের শিক্ষা দানের রীতি ও নিয়ম সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট, যেহেতু তাহাতে কোনো ধর্ম্মের কিঞ্চিম্মাত্র সম্পর্ক নাই এবং গবর্ণমেণ্ট এদেশের লোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাইবার কল্পনাকালীন যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহারি অনুরূপ; যদি ঐ শিক্ষাদানের রীতি কোন ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ রাখিত, আমার বোধ হয়, তবে, বিদ্যালয় অধ্যয়ন করিয়া যত লোক সুশিক্ষিত হইয়াছেন তাহার শতাংশের একাংশও তথায় পাঠার্থে যাইতেন না, এবং উক্তপ্রকার শিক্ষার নিয়মদ্বারা ইহাও সপ্রমাণ হয় যে কোন ধর্ম্মের সহিত বিরোধ না করাই তাঁহার তাৎপর্য্য ছিল এবং তাহাতে ছাত্রদিগের পক্ষেও আর এক উৎকৃষ্ট উপকার হইত তাহারা অজ্ঞান পূর্ব্বক কোন ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া, স্ববুদ্ধিতে বিবেচনা করিয়া যথার্থ ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইতে পারিত অতএব হিয়ার সাহেব পাদরিদিগের তুল্য ক্ষিপ্ত এবং অস্থির বুদ্ধি ছিলেন না। ফ্রেণ্ড আব ইণ্ডিয়া সম্পাদক যাহা কহিয়াছেন তাহা সকলই অলীক, এই হেতু তদ্বিষয়ে অধিক লিখনের প্রয়োজন নাই, আমি তাঁহাকে এইমাত্র কহি যে দেশহিতৈষি অস্মদ্বন্ধুগণেরা এক্ষণে প্রার্থনা করেন যে হিয়ার সাহেব খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ করিয়া এবং শিক্ষার নিয়ম মধ্যে ধর্ম্মোপদেশের সম্পর্ক না রাখিয়াও আমাদিগের যে উপকার করিয়াছেন ইংরাজদিগের অধিকার আরম্ভাবধি যে সকল পাদরিরা এদেশে আসিয়াছেন তাঁহারা, শ্রীরামপুরস্থ পাদরি মহাশয়েরা এবং ফ্রেণ্ড সম্পাদক, ইঁহারা সকলে একত্র হইয়া তাহার দশমাংশ উপকার করুন।

চর্চ্চ আব ইংলণ্ড মেগেজিন পত্র সম্পাদক মহাশয় ফ্রেণ্ড সম্পাদক অপেক্ষা

অধিক নিন্দা করিয়াছেন তিনি কহেন "ধর্ম্ম বিষয়ে হিয়ার শাহেবের সদভিপ্রায় ছিল না এবং পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও মরণানন্তর পুনর্জন্ম এই দুই বিষয়ে তিনি সন্দেহ করিতেন এবং খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম কিছুই জানিতেন না" উক্ত পত্রে হিয়ার সাহেবের কেবল নিন্দা নাই তাঁহার গুণানুবর্ণনও আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সম্পাদক ঐ মহাশয়ের যথার্থ গুণের বিষয়ে অধিক লিখিতে অশক্ত হইয়া মনঃকল্পিত দোষের বিষয়েই বাহুল্যরূপ লিখিয়াছেন অতএব উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আমার বক্তব্য যে ধর্ম্মের বিষয়ে হিয়ার সাহেবের মনে কি ছিল ইহার কুতর্ক ত্যাগ করিয়া তাঁহার আচরণ বিষয়ের বিশেষ বিবেচনা করুন; আমার বোধ হয় তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে সম্পাদক মহাশয় অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে ঐ মহাশয়ের চরিত্র অতি উৎকৃষ্ট, এবং অন্য কোন মনুষ্য প্রায় তাদৃশ দৃষ্ট হইবেক না কারণ ঐ ব্যক্তি বিদেশীয় অথচ ভিন্নজাতীয় জনগণের সুখবৃদ্ধিতে যত্নবান হইয়া তন্নিমিত্তই স্বীয় শরীর ও তাবদ্বিষয় ক্ষয় করিয়াছেন।

নাস্তিক ও পশু এই দুই শব্দ মনুষ্যের পক্ষে অতিশয় ঘৃণাকর; হিয়ার সাহেবকে কেহ নাস্তিক বলিলে যদি আমরা নিরুত্তর হইয়া থাকি তবে আমারদিগের বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করা হয় না। অতএব আমারদিগের এবং তন্মহাশয়ের অন্যান্য বন্ধুগণের তাঁহার এই মিথ্যাপবাদ দূর করণে যত্ন করা উচিত, আমি সাহস পূর্ব্বক কহিতে পারি এতদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে মিথ্যাবাদী হইতে হইবেক না এবং যে সকল ব্যক্তিদিগের হিয়ার সাহেবের সহিত বিশেষ আলাপ পরিচয় ছিল তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যে তিনি পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও পরাক্রম ইত্যাদিতে অতিশয় বিশ্বাস করিতেন তাহারাও এক্ষণে ঐ মহাশয়ের উক্ত অপবাদ মোচনে অবশ্যই ব্যগ্র হইবেন এবং ঐ ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত হইলে সকলেরি বুদ্ধিতে তাঁহার আস্তিকতা সপ্রমাণ হইতে পারে, ফলত ঐ ব্যক্তি যে সকল সৎকর্ম্মে রত ছিলেন তাহা কোন ধর্ম্মের সহিত বিরুদ্ধ নহে বরঞ্চ সূক্ষ্ম-বিবেচনায় তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম, এবং তিনি ঈশ্বরবৎ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি দয়ালু ও শত্রুমিত্র রহিত ছিলেন আর ধার্ম্মিক ও জ্ঞানি মনুষ্যেরা অধিক প্রয়াস পাইয়া যে সকল কর্ম্ম করিতে বাঞ্ছা করেন তাহা তাঁহার স্বাভাবিক ছিল অতএব তিনি যে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না ইহাতে সম্পাদক মহাশয় কি প্রমাণ পাইলেন আর যে ব্যক্তি প্রাণপণে পরোপকার করিয়া গিয়াছেন তাঁহার প্রতি এরূপ সন্দেহই বা কি প্রকারে জন্মিল। লিখন পঠনে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরও যদি অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয় তবে পরমেশ্বরের সত্তাতে তাহার কখনই সন্দেহ থাকে না কিন্তু বিদ্বান মনুষ্যেরও অন্তঃকরণ স্বচ্ছ না হইলে ঐ বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতে পারে অতএব যে ব্যক্তি পরের দুঃখ শুনিয়া কাতর হইতেন ও তাবতের প্রতি স্নেহ করিতেন আর যাঁহার অন্তঃকরণ অতি নির্ম্মল এবং দয়া ধর্ম্ম ইত্যাদি

সদগুণে পরিপূর্ণ ছিল তিনি যে পরমেশ্বরের সত্তায় বিশ্বাস করিতেন না ইহা কখনই সম্ভাব্য নহে ।

যে সম্পাদক মহাশয় হেয়ার সাহেব যে খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন না ইহা সত্য বটে কিন্তু মহাশয়ের পত্রে ধর্ম্মের বিষয়ের আন্দোলন করিতে আমার বাসনা নাই অতএব উক্ত বিষয়ে কিছুই লিখিব না ; চর্চ্চ আব ইংলণ্ড মেগেজিন পত্র সম্পাদক অতিশয় স্বধর্ম্মের পক্ষপাতী, তিনি উক্ত মহাশয়কে নিন্দা করিতে পারেন কিন্তু পরমেশ্বরের যথার্থ মতাবলম্বি ব্যক্তিকে নাস্তিক কহা অনুচিত ; অথবা উক্ত সম্পাদক মহাশয় কেবল খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের অনুশীলন করিবার নিমিত্ত স্বীয় পত্র প্রকাশ করিয়াছেন সুতরাং খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির গ্লানি না করিলে তাঁহার কি প্রকারে কর্ম্ম চলিবেক ফলতঃ সকল দেশের পুরোহিত দিগের স্বভাবই এই যে তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী ও নাস্তিক এই উভয়কে তুল্য জ্ঞান করেন এবং লোকেরাও জাতীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করিলেই নাস্তিক কহে ; আমরা শুনিতে পাই এদেশের যে সকল ব্যক্তিরা সুশিক্ষিত হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের কোন ২ অংশে অশ্রদ্ধা করেন তাহাদিগকে পৌত্তলিক হিন্দু মহাশয়েরা নাস্তিক ও ম্লেচ্ছ বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন এবং মুসলমানেরাও, যে সকল ব্যক্তিরা কোরান না মানে, তাহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া থাকে অতএব সম্পাদকের ঐরূপ উক্তিতে আমরা বিস্ময়াপন্ন হই না যেহেতু পরমেশ্বরের, যথার্থ ও সূক্ষ্ম মতাবলম্বি, কিন্তু স্বজাতীয় ধর্ম্মত্যাগি, ব্যক্তির প্রতি নাস্তিক শব্দ প্রয়োগ আবহমান কাল পর্য্যন্ত হইয়া আসিতেছে ।

এক্ষণে ঐ দুই পত্র সম্পাদক হিয়ার সাহেবকে নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করুন তথাপি উক্ত মহাশয় কর্তৃক এদেশের লোকদিগের বিদ্যাদ্বারা মূর্খতার পরিহার এবং সত্যদ্বারা মিথ্যার পরাভব ও কারণ দ্বারা অকারণে মগ্নতার দূরীকরণ এবং জ্ঞানালোকদ্বারা অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট হওয়াতে ইহাদিগের মনোমধ্যে তাঁহার নাম চিরকাল থাকিবেক এবং পরোপকার পরমধর্ম্ম ও তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে পরমেশ্বরের আরাধনা হয় এই বোধ অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের যে পর্য্যন্ত থাকিবেক তদবধি ইহারা তাঁহাকে বিস্মৃত হইবেন না । এবং এদেশের আপামর সাধারণ জনগণেরা তাঁহাকে সর্ব্বদা এই বলিয়া স্মরণ করিবেন যে তিনি আমারদিগের যাহাতে উপকার হয় তদ্বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন ও আমারদিগের সুখ সুনীতি ও বিদ্যাবৃদ্ধির নিমিত্ত অতিশয় উৎসাহী ছিলেন এবং বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত সমুদয় ধন ও শরীর পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়াছেন এবং নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দান ও পীড়িতের রোগ শান্তিতে সর্ব্বদা উদ্যত হইতেন । আমরা বোধ করি হোয়ার্ড, উইলিয়াম ফোর্ড, লার্কসন এবং ফেনেলন, এই চারি ব্যক্তির ন্যায় তিনিও চিরস্মরণীয় হইবেন এবং পরমেশ্বর কেবল আমাদিগের দেশের সভ্যতাদি পুনরুদ্ধার করিতেই তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ।

কস্যচিৎ পাঠকস্য

—The Bengal Spectator, July, 1842.

মৃত মেং ডেবিড হিয়ার সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি।

মেং হিয়ার সাহেবের স্মরণার্থ প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করণার্থে কমিটি নিযুক্ত অবধি তিনবার বৈঠক হয় ; তাঁহাদিগের দ্বারা যে ২ কর্ম্ম সম্পন্ন ও যে ২ বিষয় নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তাহার প্রধান বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ রায়, দিগম্বর মিত্র, রামচন্দ্র মিত্র, কৈলাশচন্দ্র দত্ত, দীননাথ দত্ত, ব্রজনাথ ধর, এবং প্যারিচাঁদ মিত্র এই সকল ব্যক্তিরাও উক্ত কমিটীর সভ্য হইয়াছেন। উক্ত কমিটীতে এই ধার্য্য হইয়াছে যে চাঁদার টাকা আদায় হইলে ইউনিয়ন বেঙ্কে জমা থাকিবেক ও ক্রমশ যত টাকা আদায় হইবেক তাহাও তথায় সুদের হিসাবে জমা হইবেক। শ্রীযুত বাবু দিগম্বর মিত্র এবং শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঘোষ ইঁহারা উক্ত কমিটীর সম্পাদকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মহাশয় কলিকাতা হইতে স্থানান্তরে গমনোদ্যত হওয়াতে সমুদয় সম্পাদকীয় ভার শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হইয়াছে ; আর প্রতিমূর্ত্তি হইতে পারিবেক কিনা, ও কত ব্যয়ে তাহা সম্পন্ন হইবেক. এবং তন্নির্ম্মাণেই বা কিয়ৎকাল যাইবেক, এই সকল অনুসন্ধান করণের ভারও ঐ কমিটী উক্ত মহাশয়কে দিয়াছেন, আমরা আশ্বাস করি সম্পাদকের অনুসন্ধান দ্বারা সাধারণ সভার প্রতিজ্ঞার ন্যায্যতাই সংস্থাপিতা হউক এবং সেই সভাতে "প্রতিমূর্ত্তি" ২ বলিয়া যে উন্মত্ত চীৎকারবৎ মহাধ্বনি হইয়াছিল তাহারও কার্য্যসিদ্ধি স্বরূপ ফল দর্শিয়া প্রতিধ্বনিরূপে সকলের সন্তোষজনক হউক।

সম্প্রতি বেঙ্গাল হেরল্ড ও লিটারেরি গেজেট পত্রে মৃত মেং হিয়ার সাহেবের মুখবিশ্রী প্রযুক্ত তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি করণের প্রতি উক্ত পত্র সম্পাদকদিগের আপত্তি দেখিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম ; আমরা তন্মহাশয়দ্বয়কে যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক এই নিবেদন করি যে উক্ত পরোপকার পরায়ণ পরম-দয়ালু ধার্ম্মিক মহাত্মার চিরস্থায়ি স্মরণ চিহ্ন করিবার তাৎপর্য্য এই যে তন্মহাশয়ের প্রতি আমারদের অতিশয় ভক্তি প্রকাশ হইবেক এবং তাঁহার নামও চিরকাল থাকিবেক। আর তাঁহার অন্তঃকরণের ভাব প্রকাশার্থে প্রতিমূর্ত্তি করা, ইহার সহিত তাঁহার শরীরের সম্বন্ধ কি আছে ; অতএব তাহাদিগের তর্কের প্রবলতা কিছুই দেখিতে পাই না, যদি তাঁহারা এমত লেখেন যে মহৎ ও সৎকর্ম্ম-কারী ব্যক্তিও শ্রীহীন হইলে প্রস্তর কিম্বা ধাতু দ্বারা তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি করা উচিত নয় ; ইহাতে আমারদের বক্তব্য এই যে তাঁহাদিগের এ যুক্তি যদি সুযুক্তি হইত তবে অত্যন্ত কদাকার সক্রেটিসের প্রতিমূর্ত্তি হইত না।

আমরা শুনিলাম যে চাঁদা বহিতে ৩৭৩ নাম ও ১১০২৬ টাকা স্বাক্ষর

হইয়াছে; এখানে আমারদিগের বলাবাহুল্য মাত্র প্রস্তাবিত প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণে যে ব্যয় হইবেক ঐ টাকা প্রায় তাহার তৃতীয়াংশরূপে গণিত হইতে পারে। আর অবগত হওয়া গেল যে নগর ও প্রদেশের অনেক মহাশয়েরা এ পর্য্যন্ত চাঁদার স্বাক্ষর করেন নাই। কিন্তু আমরা তম্মহাশয়দিগকে বিনয় পুরঃসর নিবেদন করি যে যাঁহারা এবিষয়ে কিঞ্চিৎ ২ দান করিতে ইচ্ছুক আছেন তাঁহারা উক্ত কমিটীর সম্পাদকের সমাচারাপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং অতিশীঘ্র সম্পাদককে বিজ্ঞাপন করুন, কারণ হিয়ার সাহেবের স্মরণার্থে স্বেচ্ছাধীন দানেই তাঁহারদের যথেষ্ট গৌরব, ও ঐ স্মারকচিহ্নও অধিক পূজ্য হইবেক। আমরা বোধ করি তাবৎ ব্যক্তির অন্তঃকরণে ঐ মহোপকারীর স্মরণে প্রেম, ভক্তি, শোক, ও কৃতজ্ঞতার অবশ্য উদয় হইবেক; আর সুস্বভাব বিশিষ্ট এমত হিন্দুই বা কে আছে যাহার অন্তঃকরণে ঐসকল ভাব উদয় না হয়? অতএব ঐ মহাশয়ের স্মারক চিহ্ন নিষ্পন্নার্থে যে প্রকারে চাঁদার টাকা বৃদ্ধি হয় ও যাহাতে আমারদের অনৈক্য দূর হইয়া উক্ত কার্য্যে পরস্পর ভ্রাতৃবৎ জ্ঞানে সকলেরই সমান উদ্যোগ হয় এমত চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

মৃত মেং হিয়ার সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদিগের এরূপ আবশ্যক হইয়াছে যে ২ ব্যক্তি এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিমুখ হইবেন তাঁহাকেই বোধ করা যাইবেক যে তিনি ঐ ব্যক্তির মহোপকার স্বরূপ ঋণের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না অতএব যে প্রকার উৎসাহাবলম্বন ও যত্ন পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইলে উক্ত বিষয় সম্পন্ন হইতে পারে আমারদের সকলেরি সর্ব্বতোভাবে তদ্রূপ চেষ্টা কর উচিত।

—The Bengal Spectator, August. 1842.

হিয়ার সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের চাঁদা।

এই চাঁদায় যত টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহা ইউনিয়ন বেঙ্কে সুদে বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত আদায় হইতে আরম্ভ হইয়াছে অতএব আমরা মফঃস্বলের বন্ধুদিগকে অনুরোধ করি তাঁহাদিগের স্ব ২ দাতব্য মুদ্রা সম্পাদক শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঘোষের নিকট শীঘ্র প্রেরণ করুন।

—The Bengal Spectator, September 15, 1842.

হিয়ার সাহেবের স্মরণার্থ স্তম্ভ।

আমরা পরমাহ্লাদপূর্ব্বক খেদসহ স্মরণীয় মেং হিয়ার সাহেবের বন্ধুবর্গকে বিজ্ঞাপন করিতেছি; কালেজ স্কোয়ারে ঐ মহাশয়ের স্মরণার্থক স্তম্ভ এতদ্দেশীয় লোকদিগের এক ২ মুদ্রা দানদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। তাঁহার

সমাজের উপরিস্থ পরিষ্কৃত প্রস্তরময় স্তম্ভোপরি কৃষ্ণবর্ণ মারবেলে স্বর্ণাক্ষর দ্বারা নিম্নলিখিত খেদজনক বিবরণ খোদিত হইয়াছে।

ডেবিড হিয়ারের বন্ধু এবং ছাত্রদিগের দ্বারা নির্ম্মিত এই কবর মধ্যে তাঁহার শরীর আছে, ঐ মহাশয় স্কাটলেণ্ড দেশীয়; ১৮০০ সালে এতন্নগরে আসিয়াছিলেন এবং সততা ও পরিশ্রম দ্বারা ঘটিকা যন্ত্র নির্ম্মাণ কর্ম্মে জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগি অর্থোপার্জ্জনান্তর ৬৭ বৎসর বয়ঃক্রমে ১৮৪২ সালের ১লা জুনে প্রাণ ত্যাগ করেন।

তিনি এতদ্দেশে কিঞ্চিৎকাল অবস্থানের নিমিত্ত আসিয়া এই স্থানকেই স্বদেশ জ্ঞান করত অত্রস্থ লোকদিগের বিদ্যা ও নীতি শিক্ষার নিমিত্তে অতিশয় উৎসাহী ও দয়ান্বিত হইয়া যাবজ্জীবন পরমাহ্লাদে নিমগ্ন ছিলেন, তদ্বিষয়ে কায়িক শ্রম, অর্থ ব্যয়, তথা স্বীয় সম্ভ্রমানুসারে সাহায্য করণে কোনমতে ত্রুটি করেন নাই। এতদ্দেশীয় সহস্র ২ ব্যক্তি প্রেম ও ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে পিতৃবৎ মান্য করিতেন এবং এক্ষণে তাহারা ঐ মহাশয়ের পরম হিতৈষিতা ও পিতৃ তুল্য স্নেহাদি স্মরণ করিয়া তাঁহার বিয়োগে বিষাদ করিতেছেন।

—The Bengal Spectator, October 1, 1842

মেং ডেবিড্ হিয়ার সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি।

আমরা অবগত হইলাম মেং ডেবিড্ হিয়ার সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি হইবার নিমিত্ত যে চাঁদা পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে ১৬০০০ টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে কিন্তু প্রস্তাবিত প্রতিমূর্ত্তি সম্পন্ন হইতে যে ব্যয় হইবেক তাহাতে এক্ষণেও আর ১২।১৪ হাজার টাকার আবশ্যক আছে; মেং হিয়ার সাহেবের সৎ পরিশ্রম দ্বারা যাবৎ সংখ্যক লোক উপকৃত হইয়াছেন তাহার সহিত স্বাক্ষর কারিদিগের তুলনা করিলে বোধ হয় যে অত্যল্প ব্যক্তির স্বাক্ষর হইয়াছে। অতএব আমরা আশ্বাস করি যে সকল ব্যক্তিরা তাঁহার পরিশ্রমদ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যাঁহারা বিদ্যার প্রতি সম্মান করেন ও বিদ্যানুশীলনে সতত পরমানন্দ বোধ করেন তাঁহারা অবশ্যই বাধ্য হইয়া পরমহিতৈষি উক্ত মহাশয়ের প্রতিমূর্ত্তির যে কল্পনা হইতেছে তাহাতে কিঞ্চিৎ ২ প্রদান করত মহোপকারির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রকাশ করিতে আর কালবিলম্ব করিবেন না। ঐ বিষয়ে যে২ মহাশয়েরা স্বাক্ষর করিবেন তাঁহারদিগের দাতব্যের সংখ্যাধিক্যকে আমরা প্রশংসা করি না কিন্তু এতদ্বিষয়ে তাহারদের স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দিৎসাই অতি প্রশংসনীয়।

আমরা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি যে অস্মৎ সমাজস্থ প্রধান ২ ধনাঢ্য মহাশয়েরা এতদ্বিষয়ে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়াছেন।

—The Bengal Spectator, November 15, 1842.

হিয়ার সাহেবের প্রতিমূর্ত্তির চাঁদা। —আমরা শুনিলাম এ বিষয়ের জন্যে ৮ হাজারের অধিক টাকা আদায় হইয়াছে; তন্মধ্যে ১৫০০ টাকা শতকরা ৫৷৷০ টাকা সুদে ইউনিয়ান ব্যাংকে স্থাপিত হইয়াছে; এবং ৩১০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ খরিদ হইয়াছে। কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত হৌসদ্বারা লণ্ডন নগরের কোন হৌসে টাকা প্রেরণ করা যাইবেক এবং ইটালিতে প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণে অল্প ব্যয় কারণ তথায় প্রস্তর অতি সুলভ এবং ভাস্করের বেতন অত্যল্প এজন্য লণ্ডনের সেই হৌসদ্বারা তথায় টাকা পাঠান যাইবেক এই বন্দোবস্ত অতিশীঘ্র হইবেক অতএব নগরের এবং প্রদেশের যে ২ মহাশয়েরা ঐ বিষয়ের চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়া অদ্যাপি মুদ্রা প্রদান করেন নাই তাঁহারা মনোযোগ করিয়া শীঘ্র প্রদান করুন, আমাদের এস্থলে একথা উল্লেখের আবশ্যক নাই, যিনি শীঘ্র দান করেন তাঁহার দ্বিগুণ দেওয়া হয়।

—The Bengal Spectator, March 24, 1843.

মৃত মেষ্টর ডেভিড হিয়ার। —অদ্য জুন মাসের প্রথম দিবস, ইহা কি মহা খেদের স্মারক। অদ্যকার দিন স্মরণ করিলে আমাদিগের মনে এমত বিষয় সকল উদয় হয় যাহাতে ক্ষণে ২ মনের ভাবান্তর হইয়া উঠে, এই দিন ইন্দ্রজালিকের দণ্ডের ন্যায় আমাদিগের অন্তঃকরণে নানাপ্রকার চিন্তা ও ভাব উপস্থিত করিয়া দিতেছে, আমরা কোন্ বিষয় কহিব তাহার স্থির করিতে অপারক হইয়াছি; এতদ্রূপ ভূমিকার তাৎপর্য্য এই যে আমরা সেই মহাহিতৈষী হিন্দুদিগের পরমবন্ধু মেষ্টর হিয়ার সাহেবের মৃত্যু উল্লেখ করিতেছি। যদিও তাঁহার মহাবংশে জন্ম হয় নাই এবং ব্যবসা অতি সামান্য ছিল তথাচ তিনি যে সকল সৎ কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন তাহাই চিরকাল পর্য্যন্ত তাঁহার মহত্ত্ব ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের অনুরাগ এবং সদ্ব্যবহারের প্রতি প্রেমের সহিত স্মারক থাকিবেক। তিনি এতন্নগরীয় লোকদিগকে মুসলমানদিগের অত্যাচার হেতুক অজ্ঞানাবৃত দেখিয়া পিতৃবৎ স্নেহে নিমগ্ন হওত স্বীয় আশ্রয় প্রদান করেন, তাঁহার এতদ্দেশের হিত চেষ্টা, অমূল্য সততা, এবং অসাধারণ আত্মলাভানপেক্ষায় সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই এতন্নগরের মূর্খতার ক্রমশ হ্রাস হয়, ঐ সকল কর্ম্ম ভাবিলে তাহার স্মরণ হইয়া আমাদের মনে কি অপূর্ব্ব প্রেমোদয় হয়। তাঁহার চরিত্র যে সকল ধর্ম্মে অলংকৃত ছিল তদনুষ্ঠানে তিনি কিঞ্চিন্মাত্র আড়ম্বর করিতেন না, তৎপ্রতি তাঁহার যেরূপ নির্ম্মল, নিষ্কপট ও দৃঢ় প্রেম ছিল তাহা যাঁহারা২ স্মরণ করিবেন তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে সকল সৎকর্ম্ম দ্বারা তিনি স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন কেবল মনের সন্তোষকেই তাহার পুরস্কার বোধ করিতেন এবং তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে "মনুষ্যের উপকার করিলেই পরমেশ্বরের প্রকৃত উপাসনা হয়।"

ব্রিটন দেশকে কেবল তাঁহার জন্মভূমি বলিয়াই শ্লাঘা করা যায় কারণ ঐ

মহাত্মা ব্যতিরেকে অন্য কোনো ইংরাজকে ভারতবর্ষে আসিয়া অনবরত একাগ্রচিত্তে এতদ্দেশের উপকার করিতে দেখি নাই। যদবধি এতদ্দেশে বিদ্যার আলোচনা থাকিবেক ও হিন্দুদিগের বুদ্ধি হইতে নীতি, রীতি ব্যবহার ব্যবহার প্রভৃতির উৎকৃষ্টতার উপায় বহির্গত হইবেক এবং যে পর্য্যন্ত তাহাদের কর্ত্তব্যতার জ্ঞান ও বিবেচনা শক্তি এবং ভাবজ্ঞতা থাকিবেক তদবধি এতদ্দেশীয়েরা ডেবিড হিয়ার সাহেবের নাম গভীর ভক্তি পুরঃসর স্মরণ করিবেন কারণ তিনি সভ্যতার পথ পরিষ্কার ও অবস্থার উৎকৃষ্টতা করণারম্ভ করিয়া গিয়াছেন এবং হিন্দুদিগের সমুদায়ের এবং প্রত্যেকের লাভালাভের রক্ষণাবেক্ষণ ও উপকার করিয়াছেন।

আমরা শুনিলাম যে তাঁহার এতদ্দেশীয় বন্ধুরা আমেরিকা দেশের রীত্যনুসারে অদ্য তাহার মৃত্যাহ প্রযুক্ত স্ব ২ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করণার্থে রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় নিমতলা ইষ্টিটের ১১১ নং ভবনে এক সভা করিবেন। তাঁহাদের মানস এই যে প্রতি বৎসর জুন মাসের প্রথম দিবসে ঐ রূপ সভা করিয়া হিয়ার সাহেবের গুণানুকীর্ত্তন হয়। আমরা ভরসা করি অদ্যকার সভার কার্য্য ৮ ঘটিকার পূর্বেই সমাধা হইবেক। কারণ তাহা হইলে বেঙ্গাল ব্রিটিস ইণ্ডিয়া সোসাইটির বৈঠক যাহা ৮ ঘণ্টা রাত্রির পর হইয়া থাকে তাহার ব্যাঘাত হইবেক না।

এতৎ প্রসঙ্গে আমরা পাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে প্রতিমূর্ত্তির চাঁদাতে ১৫৭৭১ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ৮০৫১টাকা আদায় হইয়াছে। যে ২ মহাশয়েরা অদ্যাবধি চাঁদার টাকা প্রদান করেন নাই তাঁহাদিগকে এই অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা ত্বরায় প্রদান করুন, তাহা হইলে টাকা সুদে বাড়িতে পারিবেক, কারণ চাঁদায় যত স্বাক্ষর হইয়াছে তদপেক্ষা অধিক ব্যয় হইবেক; আমরা ভরসা করি অবশিষ্ট টাকা আদায়ের সংবাদ শীঘ্র প্রকাশ করিতে পারিব।

—The Bengal Spectator, June 1, 1843.

হিয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সভা। —মৃত মেষ্টর ডেবিড্ হিয়ার সাহেবের এতদ্দেশীয় বন্ধুগণ জুন মাসের প্রথম দিবস উক্ত মহাশয়ের মৃত্যাহ প্রযুক্ত তদ্দিনে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি প্রকাশ করণার্থে নিমতলার ১১১ নং ভবনে রাত্রি ৭ ঘটিকার পর এক সভা করিয়াছিলেন; তাহাতে প্রায় ৪০ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র মিত্র সভাপতি।

প্রথম প্রতিজ্ঞা প্রস্তাবকালীন রেবেরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষীয় জনগণের অবস্থার উন্নতির নিমিত্ত মৃত মেষ্টর হিয়ার সাহেব স্বার্থ নিরপেক্ষে শুদ্ধ ধর্ম্ম বোধে যে সকল উপকার চেষ্টা ও দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। তৎপরে শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র মিত্র,

বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইহাঁরা উক্ত মহাশয়ের গুণানুবাদ ও তাঁহার প্রতি এতদ্দেশীয় লোকদিগের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি প্রকাশের আবশ্যকতা বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন।

অনন্তর নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা সকল ধার্য্য হইল।

১। জুন মাসের প্রথম দিবস ৺ হিয়ার সাহেবের মৃত্যাহ প্রযুক্ত প্রতিবৎসরে ঐ দিনে উক্ত মহাশয়ের এতদ্দেশীয় বন্ধুগণ এক সভা করিবেন তাহাতে তিনি জীবদ্দশায় ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত শুদ্ধ ধর্ম্মবোধে যে সকল দয়ার কার্য্য করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় লোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত অদ্ভুত ও অনুপম চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করা যাইবেক।

২। উক্ত সাম্বৎসরিক সভাতে পূর্ব্ব নিযুক্ত কোন ব্যক্তি এতদ্দেশীয়দিগের বিদ্যা ও নীতি শিক্ষা বিষয়ক কোন প্রস্তাব পাঠ করিবেন।

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা উক্ত বার্ষিক সভার কার্য্য নির্ব্বাহার্থে ও তন্মহাশয়ের স্মরণার্থে উপায়ানুসন্ধান করিতে কমিটীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

রেবেরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র মিত্র, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, এবং বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, (সম্পাদক)।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের প্রতি ধন্যবাদ হইল; এবং ৯ ঘণ্টার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

—The Bengal Spectator, June 8, 1843.

মৃত মেং ডেবিড হিয়ার সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি। —এতন্নগরীয় কৃতজ্ঞ মহাশয়েরা মৃত মহোপকারি ডেবিড হিয়ার সাহেবের প্রতিমূর্ত্তির নিমিত্ত যে চেষ্টা করিতেছেন তৎ প্রতি শ্রীরামপুরের সংবাদপত্র সম্পাদকের ব্যঙ্গোক্তি দেখিয়া আমরা অতিশয় খেদিত হইলাম। সম্পাদক মহাশয় কহিয়াছেন যে হিয়ার সাহেবের প্রতিমূর্ত্তির চাঁদার অর্দ্ধেক টাকা আদায় হইয়াছে, কিন্তু তৎ কর্ম্মার্থে অদ্যাপি কিঞ্চিৎ ব্যয় হয় নাই। প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের নিমিত্ত যে সকল মহাশয়েরা কমিটী হইয়াছেন তাঁহারা যে ২ কার্য্য করিয়াছেন ও চাঁদার টাকা যত আদায় হইয়া যে রূপে রক্ষিত হইয়াছে এ সকল বৃত্তান্ত আমরা সময়ে ২ প্রকাশ করিয়াছি তথাপি এ বিষয় মন্দ ভাবিয়া যে সন্দেহ করেন ইহাতে আমরা চমৎকৃত হইলাম।

—The Bengal Spectator, July 11, 1843.

[দ্বিতীয় সম্পাদকীয়]

মহাত্মা ডেভিড হিয়ার সাহেবের নামে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় তদীয় জীবদ্দশা পর্যন্ত অবৈতনিক থাকাতে অসংখ্য দীনদরিদ্র ভদ্রজনের বালকগণ তথায় প্রবিষ্ট হইয়া সুশিক্ষা লাভ করত অবিদ্যার যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। উক্ত মহাত্মা আপনি ঐ বিদ্যালয়ের প্রতি অসাধারণ কোন প্রকার অর্থানুকূল্য করিতেন না কেবল কায়িক পরিশ্রম করিয়া তত্ত্বাবধারণ করিতেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে ঐ বিদ্যালয়ের আয় যেরূপ ছিল সকলই রহিল। উপিভন্ন হিন্দু কলেজের মেনেজীং কমিটির অধ্যক্ষ মহাশয়েরা বিদ্যালয়ের উন্নতি নিমিত্ত কতকগুলি ছাত্রকে হিয়ার সাহেবের মর্যাদা বা স্মরণার্থ অবৈতনিক রাখিয়া সমুদায় ছাত্রের প্রতি শিক্ষার বেতন অবধারিত করিলেন। তাহাতে অবগত হওয়া গেল এক্ষণে উক্ত বিদ্যাগারের আয় ব্যয়াপেক্ষা অধিক হইয়াছে এবং বৎসর ২ অধিক আয়ে বিপুল বিত্ত সঞ্চিত হইতেছে কিন্তু কালেজের মেনেজীং কমিটী মৃত ডেবিড হিয়ার সাহেবের সম্ভ্রমার্থ যে কতিপয় অবৈতনিক ছাত্র রাখিবার নিয়ম করেন তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। অপর বিদ্যালয়ের উন্নতির চিহ্নও বিশেষ রূপে দৃষ্ট হয় না। উক্ত বিদ্যালয় হইতে কএকজন সুশিক্ষিত ছাত্র হিন্দু কালেজের জুনিয়র স্কলারসিপের পরীক্ষা দিয়ান তাহাতে সুসিদ্ধ হইলে কালেজে গিয়া অধ্যয়ন করিতে পারেন এই মনে আশায় লুব্ধ হইয়া লোকে তথায় দুই তিন টাকা বেতন দিয়া অনবরত স্ব২ বালকবৃন্দকে প্রেরণ করিতেছেন তাহাতে ছাত্র বিষয়ে বিদ্যালয়ের উন্নতি হইতেছে বটে কিন্তু সুশিক্ষার নিয়ম ও শিক্ষক এবং পণ্ডিতদিগের উপযুক্ত বেতন দ্বারা উৎসাহ বর্দ্ধন না করিলে কদাপি বিদ্যালয়ের উন্নতি বলা যায় তাহা অদ্যাবধি ঐ বিদ্যাগারে দৃষ্ট হইল না এক২ শ্রেণীতে ৭০।৫০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করে। নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষকের বেতন যৎসামান্য অর্থাৎ মিশনরদের বিদ্যালয়ে ক্ষুদ্র২ শিক্ষকের যেমন নাম মাত্রে বেতন শিক্ষকের তদ্রূপ বেতন ভোগী তাহাতে ঐ প্রকার ভূরি সংখ্যক বালকের সুশিক্ষা প্রদানে তাঁহাদের সমুচিত পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হওয়া কখন অসম্ভাবনা। অতএব আমরা জিজ্ঞাসা করি কৌন্সেল অব এডুকেসন এক্ষণে ঐ বিদ্যালয়ের কর্ত্তা হইয়াছেন তাঁহারা ঐ বিদ্যালয়ের আয় দ্বারা বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে কখন কি ব্যয় করিবেন ?

—সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ১৯ মাঘ ১২৫৯ (৩১ জানুয়ারি ১৮৫৩)

স্মারক বক্তৃতা

তৃতীয় স্মৃতিসভা

১ জুন ১৮৪৫, ফৌজদারি বালাখানায় তৃতীয় বার্ষিক হেয়ার স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করে রামগোপাল ঘোষ বলেন, এই দিনটি তাঁদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এমন এক লোকহিতৈষী ব্যক্তির স্মৃতিসভায় তাঁরা উপস্থিত হয়েছেন, যাঁর নাম তাঁদের কাছে অতিশয় প্রিয় এবং অন্তরের মণিকোঠায় স্থাপিত আছে। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁকে তাঁরা স্মরণ করেন। বিগত দুই বছরের স্মৃতিসভায় ভারতের নৈতিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক অগ্রগতির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এই দিনের সভায় শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত অনুরূপ আরেকটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেবেন বলে তিনি জানান।

এরপর অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলায় লেখা একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, বিষয় 'হিন্দুদের চেতনার পরিবর্তনে শিক্ষার প্রভাব'। এদেশের অতীত অবস্থা ও চিন্তাধারা নিয়ে তিনি আলোচনা শুরু করেন। তৎকালীন অবস্থার সঙ্গে অতীতের পার্থক্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, হিন্দুরা এককালে সাধারণের উপকারার্থ কোন কাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করত না। তাই নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি পয়সাও তারা ব্যয় করত না। যাই হোক জন্মভূমির শুভদিনের সূচনা হয়েছে। যদিও তৎকালীন দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে লোকহিতকর মনোবৃত্তির বড়ই অভাব এবং অনীহা ও ঐকান্তিকতার অভাবে জন্য তাঁরা বিশেষভাবে পরিচিত, তথাপি শিক্ষিত বুদ্ধিমান এবং উপরোক্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই মাতৃভূমির উৎকর্ষ ও উন্নতিসাধনে নিজেদের নিযুক্ত করেন। নৈতিক চরিত্র ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য বিভিন্ন সভা-সমিতিও স্থাপিত হয়েছে। যে শিক্ষার আশীর্বাদ তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে বর্ষিত হয়েছে এবং দেশের কু-সংস্কারগুলি দূরীকরণের জন্য যা একান্ত অপরিহার্য, সেই শিক্ষার প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেনে।

অক্ষয়কুমার দত্ত বলেন, দেশীয় ব্যক্তিদের শিক্ষার বন্ধু ডেভিড হেয়ারের উৎসাহ ও নিরলস প্রচেষ্টার ফলে এদেশে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে তাতে সুফল ফলতে বাধ্য। যে নৈতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এদেশে এক বিরাট আন্দোলনের সূচনা হয়েছে, তার উৎস হলেন হেয়ার। ভারতীয়দের অবস্থার উন্নতির জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার্থে এবং বিদেশে কুলী রপ্তানি বন্ধ করতে যে আন্দোলন হয়েছিল তারও মূলে ছিলেন হেয়ার।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সময় কিশোরীচাঁদ মিত্র উক্ত ভাষণের প্রশংসা ও সমর্থন করে বলেন, যে-সব ব্যক্তি সমগ্র পৃথিবীকে নিজের দেশ এবং সমস্ত মানব সমাজকে নিজের স্বদেশবাসী বলে মনে করেন, ডেভিড হেয়ার তাঁদের অন্যতম। সমগ্র ভারতবাসীর নৈতিক ও বৌদ্ধিক উন্নতির জন্য তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা বলেও শেষ করা যায় না। নবতেজে ভারতীয়দের উদ্দীপ্ত করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি তাঁর সমস্ত কর্মশক্তিকে অক্লান্তভাবে কাজে লাগিয়েছেন। চিন্তাকে কাজে পরিণত করাই ছিল তাঁর আশা ও আকাঙ্ক্ষা। সমগ্র পৃথিবী, ইউরোপ এবং ইংলন্ডের মধ্যে যে-সব লোকহিতৈষী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ডেভিড হেয়ারের স্থান সবচেয়ে উঁচুতে। যে-সব বাধা ভারতীয়দের নৈতিক উন্নতির প্রতিবন্ধক হয়েছিল অক্লান্ত অধ্যবসায়, উদার বদান্যতা ও সমগ্র কর্মশক্তি দিয়ে তিনি তা জয় করেন। একটি বিদেশী জাতির মঙ্গলের জন্য তিনি বিনা প্রচারে ও সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, সাধারণের মধ্যে সেই খ্যাতির প্রচার না হলেও তাঁর গৌরবের কাছে রাজপদ ছিল অতি তুচ্ছ। সুতরাং তাঁর কাছে যাঁরা কৃতজ্ঞ, নিজেদের বুদ্ধিগত অস্তিত্বের জন্য যাঁরা ঋণী এবং যৌবনের প্রথমেই তাঁকে যাঁরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু হিসেবে গণ্য করেছেন, এমন সব লোকেদের কাছে তাঁর গুণকীর্তন করা সম্পূর্ণ বৃথা।

উপসংহারে অক্ষয়কুমার দত্তের বাংলা বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন, শিক্ষিত দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বক্তব্য অনুধাবনে সম্পূর্ণ অক্ষম। কারণ তাদের রুচি, মাতৃভাষায় প্রচারিত রুচির সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজেই বাংলা ভাষার মাধ্যমে কোন উচ্চ স্তরের চিন্তাধারা ও অনুভূতি প্রকাশিত হলে তা সম্পূর্ণ নীরব ও ব্যর্থ হতে বাধ্য এটাই শিক্ষিতজনের ধারণা। তবে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, উক্ত কুসংস্কারগুলি দ্রুত ধ্বংস হচ্ছে এবং সেজন্যই বাংলা ভাষার অনুশীলন বেশী প্রয়োজন।

শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা

সভা আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত বক্তৃতা করিলেন, যে সপ্তাহ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পরে সূর্য্য প্রকাশ হইলে চিত্ত কি প্রকার প্রফুল্ল হয়। গ্রীষ্মেতে গাত্র দাহ হইয়া পরে মন্দ মন্দ শীতল বায়ুর হিল্লোলে শরীর স্নিগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে অন্তঃকরণে কি প্রকার সন্তোষের উদয় হয়। সেইরূপ হিন্দুদিগের মলিন চরিত্রকে ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট দেখিয়া চিত্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছে। আমরা কতকাল আক্ষেপ করিতেছি, যে স্বদেশের

মঙ্গল চেষ্টা করা যে মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম তাহা ভারতবর্ষস্থ লোকদিগের চিত্ত হইতে লুপ্ত হইয়াছে—অনুৎসাহ, অল্প প্রতিজ্ঞা দ্বেষ, কলহ, বিচ্ছেদ আমারদিগের মহাশত্রু হইয়াছে। আমরা কতকাল আক্ষেপ করিতেছি, যে আমারদিগের জ্ঞানের প্রতি সমাদর নাই, সত্যের প্রতি প্রীতি নাই, কোন কর্ম্মের উদ্যম নাই এবং যতক্ষণ কোন বিপদ্ মস্তকোপরি পতিত না হয় ততক্ষণ তাহার প্রতি দৃক্পাতও হয় না। আমরা কতকাল আক্ষেপ করিতেছি, যে এদেশীয় লোক ইতর জন্তুর ন্যায় আহার বিহারাদি অলীক আমোদকেই জীবনের মূলাধার কার্য্য বোধ করেন, এ প্রযুক্ত কিঞ্চিৎ কালের ঐন্দ্রিয় সুখ নিমিত্তে রাশি রাশি ধন সমর্পণ করেন ; কিন্তু ইহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না, যে জগদীশ্বর কি নিমিত্তে তাঁহারদিগকে ইতর পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া বুদ্ধির সহিত ভূষিত করিয়াছেন ? তাঁহার নিয়মানুসারে উপযুক্ত রূপে ক্ষুধা শান্তি না করিলে যে প্রকার শরীরের সুস্থতা ভঙ্গ হয়, উপযুক্ত রূপে বুদ্ধির আলোচনা না করিলে সেইরূপ মূর্খতা ও কদাচার রূপ মানসিক রোগ উপস্থিত হয়, এই সত্যকে অজ্ঞাত হইয়া তাঁহারা জ্ঞানের অবহেলা সর্ব্বদা করিয়া আসিতেছেন। পুত্রের বিবাহোপলক্ষে কত ব্যক্তি লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত নিঃক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু সেই পুত্রের বিদ্যা উপার্জ্জন নিমিত্তে মাসে পাঁচ টাকাও ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। এক রজনীর অপবিত্র আমোদ উপলক্ষে যাঁহারা সহস্র টাকা অনায়াসে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। এক রজনীর অপবিত্র আমোদ উপলক্ষে যাঁহারা সহস্র টাকা অনায়াসে ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহারা কোন বিদ্যালয়ের সাহায্য জন্য দশ টাকা দান করিতেও বিমুখ হইয়াছেন। এই প্রকারে এ দেশস্থ লোকের মনুষ্যত্বের চিহ্ন প্রায় ছিল না। কিন্তু এরূপ অবস্থা কতকাল স্থায় হইতে পারে ? বায়ু প্রবাহিত না হইয়া কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে ? কাল ক্রমে লোকের মনঃ ক্ষেত্র পরিষ্কৃত হইতে লাগিল, এবং উৎসাহের বীজ অঙ্কুরিত হইতে আরব্ধ হইল। পদ্মের ঘ্রাণ যিনি অনুভব করিয়াছেন, তিনি বন্ধুদিগকে সেই ঘ্রাণ সুখ প্রদান করিবার জন্য অবশ্য যত্নবান্ হয়েন। যাঁহারা জ্ঞানের স্বাদু প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারা সেই আস্বাদন সুখ অন্যদিগকে দিবার জন্য উৎসাহিত হইলেন। কিন্তু কিয়ৎ কাল সে উৎসাহ কেবল মৌখিক উৎসাহ মাত্র হইল—তদনুসারে কার্য্য হওয়া দুষ্কর হইল। আমরা বিদ্যা বিষয়ে, লোকের উৎসাহ বিষয়ে, রাজনিয়ম বিষয়ে কত আলোচনা করিয়াছি, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিষয়ে কত চর্চা করিয়াছি, এবং নানা প্রকারে স্বদেশের মঙ্গলোন্নতি জন্য কত আন্দোলন ও কত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছি। কিন্তু সে কেবল আন্দোলন মাত্র হইয়াছে। দুই বিদ্বান্ ব্যক্তির পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে স্বদেশের মঙ্গল তাঁহারদিগের আলাপের প্রথম

সুত্র হইত, কিন্তু পৃথক হইলে চিত্তপটে সে সমুদয়ের চিহ্ন মাত্রও থাকিত না কত ব্যক্তির অন্তঃকরণে উৎসাহের শিখা তৃণ সংযুক্ত অগ্নির ন্যায় একেবারে জাজ্বল্যমান হইয়াও পরক্ষণে নির্ব্বাণ হইয়াছে। সাধারণের হিতজনক কত কর্ম্মের সূচনা হইয়াছিল, সে সকল কোন্ কালে লুপ্ত হইয়াছে। এক দিবস যাহার অঙ্কুর দৃষ্টি করিয়াছি, পর দিবসে তাহাকে উচ্ছিন্ন দেখিতে হইয়াছে। এই রূপে স্বদেশহিতৈষি মহাত্মাদিগের কত যত্ন বিফল হইয়াছে। কিন্তু কত দিন বিনা বর্ষণে মেঘ গর্জ্জন হইতে পারে? নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ হইয়া মনুষ্য কতক্ষণ শয্যাগত রহিতে পারে? কেবল ইচ্ছাতে লোক তৃপ্ত থাকিতে পারিলেক না। অভিলাষ কার্য্যেতে পরিণত হইতে লাগিল, ধর্ম্মের উন্নতি জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিতা হইল, এবং এ দেশের সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি নিমিত্তে বেঙ্গাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি সংস্থাপিত হইল। এই উভয় সভার সভ্যেরা প্রতিজ্ঞার সহিত তাঁহারদিগের কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন। বিশেষতঃ এদেশীয় লোকের উৎসাহ প্রবাহ তখন প্রবল দেখি, এবং তখন অন্তঃকরণ সাহসে পরিপূর্ণ হয়, যখন এই সম্প্রতিকার ঘটনাকে স্মরণ করি—যখন স্মরণ করি, যে দরিদ্র হিন্দুবালকদিগকে বিদ্যা দানের নিমিত্তে নগরস্থ সকল লোক উদ্যোগি হইয়াছেন। অন্য জাতি মধ্যে যদিও এ অতি সামান্য কার্য্য, কিন্তু ভারতবর্ষ পরাধীন হইলে এ দেশীয় লোকের মধ্যে এমত শুভ সূচক ঘটনা কদাপি হয় নাই—এমত ঐক্য কদাপি বদ্ধ হয় নাই—এবং এই উপলক্ষে সভাতে যে সমারোহ হইয়াছিল এদেশের কোন সাধারণ মঙ্গলজনক কর্ম্মে এ প্রকার বহু ব্যক্তি এক স্থানে এককালে কদাপি একত্র হয় নাই। যে স্থানে দশ জনকে একত্র দেখি সেই স্থানেই এই ভাবি হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয়ের উন্নতি বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রীতি হয়, যেহেতু সকল মঙ্গলের আকর যে জ্ঞান কেবল তাহাই যে ইহার দ্বারা বিস্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা এমত নহে, এই ঘটনাতে ভারতবর্ষের সৌভাগ্য দিবসের উষাকাল প্রাপ্ত দেখিতেছি। অনুৎসাহ, আলস্য, অনুদ্যোগ প্রভৃতি যে আমারদিগের অপবাদ তাহা মোচনের উপক্রম দেখিতেছি, এবং যে ঐক্যের অভাব প্রযুক্ত এ দেশের সকল শুভ কর্ম্মের সূচনা বিফল হইয়াছে, এ বিষয়ে সেই ঐক্য সংস্থাপনের সম্ভাবনা দেখিয়া আনন্দিত হইতেছি। ধনি দরিদ্র, বিদ্বান্ অজ্ঞ, বৃদ্ধ বালক, ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সকল প্রকার ভিন্ন বর্ণস্থ, ভিন্ন মতস্থ, ভিন্ন ধর্মাবলম্বি ব্যক্তি এ বিষয়ে একত্র হইয়াছেন। এই ঐক্য সংস্থায়ী হইলে কোন্ দুঃখ মোচন না হইতে পারে? ঐক্য দ্বারা কত গভীর অরণ্য উচ্ছিন্ন হইয়াছে রাজ্য সকল স্থাপিত হইয়াছে, নগর সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং সভ্যতার আলোক প্রদীপ্ত হইয়াছে। এই ঐক্য সংস্থায়ী হইলে আমরা কেবল এক পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াই কি তৃপ্ত

থাকিব ?—আমারদিগের আশা কত দীর্ঘ হইতেছে—আমারদিগের ভরসা কত বৃদ্ধি হইতেছে। এই ঐক্য দ্বারা উৎসাহের স্রোত প্রবল হইলে যত প্রকার মঙ্গল এইক্ষণে আমারদিগের মনে জাগ্রৎ রহিয়াছে, সকল সফল করিবার সামর্থ হইবে। এ দেশের রাজ নিয়ম যাহাতে উৎকৃষ্ট হয়, অন্যায় কর স্থাপন খণ্ডিত হয়, শান্তি রক্ষার সুশৃঙ্খলা হয়, বিচার কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, কৃষি কার্য্যের বৃদ্ধি হয়, শিল্প কর্ম্মের উন্নতি হয়, বাণিজ্যের বিস্তার হয় এবং যাহাতে এ দেশস্থ লোকের সুখ ও স্বচ্ছন্দতা সম্যক্ প্রকারে বৃদ্ধি হয় তাহা এই ঐক্য দ্বারা সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টাবান্ হইতে পারিব। এইক্ষণে ভরসার সহিত সেই সুখের দিবসকে প্রতীক্ষা করিতেছি যখন ভারতবর্ষস্থ লোক আপনারদিগের বুদ্ধি ও ক্ষমতা দ্বারা সমুদ্র পোত নির্ম্মাণ করিবেক, সেতু রচনা করিবেক, বাষ্প যন্ত্র প্রস্তুত করিবেক, এবং স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা স্বদেশে নানা প্রকার শিল্প কার্য্যের উন্নতি করিবেক। কিন্তু এইক্ষণে যে এই সকল মঙ্গলের চিহ্ন দেখিতেছি, এবং ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রত্যাশাতে পুলকিত হইতেছি, ইহার মূল কোথায় ? নদীর স্রোতে স্নিগ্ধ হইয়া তাহার উৎপত্তি স্থান অন্বেষণ করিলে যে প্রকার পর্ব্বত শিখরের প্রতি দৃষ্টি হয়, বায়ু প্রবাহে সৌগন্ধের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হইযা তাহার আকর অন্বেষণ করিলে, যে প্রকার মনোহর পুষ্পোদ্যানের স্মরণ হয়, তদ্রূপ এই বর্ত্তমান জ্ঞানের বৃদ্ধি ও তৎফল সৌভাগ্যের উপক্রম আলোচনা করিয়া সেই পরম হিতৈষির নাম ও সেই পরম দয়ালু ব্যক্তির চরিত্র স্মরণ হইতেছে, যাঁহার উপকার দ্বারা এ দেশ পূর্ণ রহিয়াছে, যাঁহার দয়াকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারতবর্ষের লোক কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র রহিয়াছেন, যাঁহার নামকে স্থায়ি করিবার জন্য এই সাম্বৎসরিক সভা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে, এবং যাঁহার গুণানুবাদ করিবার জন্য আমবা অদ্য এই অট্টালিকাতে একত্র হইয়াছি—এই মহাত্মার নাম শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেব। তাঁহার এই সত্য জ্ঞান ছিল, যে পরের উপকার জন্য তাঁহার জন্ম, এবং পরের উপকার তাঁহার জীবনের সমুদয় কার্য্য ; এবং শরীর, বুদ্ধি, সম্পত্তি সমুদয় তিনি পরের হিতের জন্য সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষকে ভিন্ন জানিতেন না। এই সত্যের প্রতি তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, যে পৃথিবী তাঁহার জন্ম ভূমি, এবং সমুদয় মনুষ্য তাঁহার পরিবার। বিশেষতঃ তাঁহার চরিত্র তখন বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, যখন এ দেশের বিদ্যা উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়। কিয়ৎ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশ অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু তিনি এ দুরবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া এই অন্ধকারময় ভারতবর্ষকে জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল করিতে যত্নবান্ হইলেন, এবং লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞাত কার্য্য অনেক ভাগে সম্পন্ন

করিয়াছিলেন। এই মহোপকার সাধন জন্য তিনি শারীরিক ক্লেশ, মানসিক পরিশ্রম, অর্থের ব্যয় ইত্যাদি কোন্ প্রকারে যত্ন না করিয়াছিলেন? এইক্ষণে আমরা যে কিছু জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছি, সে কেবল তাঁহারই প্রসাদাৎ। তাঁহার প্রসাদাৎ আমরা সৃষ্টির নিয়ম সকল জ্ঞাত হইতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ সূর্য্য নক্ষত্রাদির স্বভাব জানিতেছি তাঁহার প্রসাদাৎ গ্রহ চন্দ্র ধূমকেতুর দূর, পরিমাণ এবং গতিবিধি সকল শিক্ষা করিতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ পৃথিবীস্থ স্বদেশ বিদেশাদি সমূহ স্থানের বৃত্তান্ত আলোচনা করিতেছি. তাঁহার প্রসাদাৎ আমরা আপনারদিগের শরীরের নিয়ম, মনের স্বভাব, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিদ্যা লাভ করিতেছি, অধিক কি কহিব, তাহার প্রসাদাৎ আমরা এক নূতন প্রকার জ্ঞান ভূমিতে আরোহণ করিয়াছি। ভারতবর্ষের মহৎ বিদ্যালয় যে হিন্দু কালেজ, তাহা স্থাপনের মূলাধার করেণ কোন্ ব্যক্তি?—সকলেই অবশ্য ব্যক্ত করিবেন যে শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেব। বঙ্গভাষাকে উন্নত করিবার জন্য প্রথম যত্নবান্ কোন্ মনুষ্য? —ডেবিড হেয়ার সাহেব। উপদেশ দ্বারা চিকিৎসা বিদ্যা বিস্তার জন্য মহোৎসাহী কোন্ পুরুষ?—ডেবিড হেয়ার সাহেব। অশেষ মঙ্গলের কারণ যে মুদ্রাযন্ত্র তাহার স্বাধীনতা স্থাপনে বিশেষ উদেযাগী কোন্ মহাত্মা—ডেবিড হেয়ার সাহেব। এই রূপে এদেশের জ্ঞান বৃদ্ধির কারণ সন্ধান জন্য যে প্রশ্ন করা যায়, সেই প্রশ্নের উত্তরেই ভারত রাজ্যের বিদ্যারূপ বৃক্ষ মূলে হেয়ার সাহেবকে বীজ রূপে দৃষ্টি করা যায়। তিনি আমারদিগকে হীরক দেন নাই, স্বর্ণ দেন নাই, রজতও দান করেন নাই, কিন্তু তাহার অপেক্ষা সহস্র গুণ—কোটি গুণ মূল্যবান্ বিদ্যারত্ন প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা দ্বারা আমরা জ্ঞানের আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাঁহার চরিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা দয়া ও সত্য ব্যবহার যে কি মহোপকারি, তাহা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। পীড়িতের রোগ শান্তি, বিপদ্‌গ্রস্তের দুঃখ মোচন, অবিজ্ঞকে পরামর্শ দান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান ইত্যাদি হিতকার্য্য তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। তাঁহার স্থাপিত বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাঁহার দ্বারা কেবল বিদ্যারত্নের অধিকারি হয়েন নাই, তাঁহার স্নেহ ও প্রীতি দ্বারা সর্ব্বদা লালিত হইয়াছিলেন। আহা, তাঁহার মনের ভাবকে চিন্তা করিলে চিত্তে কি আনন্দের উদয় হয়। যখন আমারদিগের উপকারে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল, তখন তাঁহার চিত্ত দয়াতে কি পরিপূর্ণ হইয়াছিল! যখন তিনি সকল প্রতিবন্ধক মোচন করিয়া তাঁহার মানস সফল হইবার উপক্রম দেখিলেন, তখন কি আশ্চর্য্য মনোহর সন্তোষ তাঁহার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিয়াছিল! যখন তাঁহার বাসনা বৃক্ষ যথেষ্ট রূপে ফলবান্ হইল, তখন তীন আপনাকে কৃতার্থ জানিয়া কি মহানন্দে মগ্ন হইয়াছিলেন। যিনি

সকল স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল আমারদিগেরই উপকার করিয়া এমত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিমিত্তে কি প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব !—তাঁহার কি প্রকার ধন্যবাদ করিয়া তৃপ্ত থাকিব !

পঞ্চম স্মৃতিসভা

১ জুন ১৮৪৭, মেডিকেল কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালংকার বাংলা ভাষায় লেখা একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধের সন্ধান না পাওয়ায় সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত সংবাদ এখানে পুনর্মুদ্রিত হল।

গত ১ জুন মঙ্গলবার রাত্রে মেডিকেল কালেজের থিয়েটারে মৃত ডেভিড হেয়ার সাহেবের নামের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি ব্যূহের সাম্বৎসরিক নিয়মিত সভা হইয়াছিল, শ্রীযুত রেবারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসনে উপবেশন পূর্ব্বক সভার তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিলে সংস্কৃত কালেজের অলংকারের ঘরের শিক্ষক শ্রীযুত মদনমোহন তর্কালংকার মহাশয় মৃত মহাত্মা হেয়ার সাহেবের অসাধারণ বদান্যতা ও অন্যান্য মহদ্গুণ বিষয়ে বঙ্গভাষায় এক অত্যুত্তম * * * করেন, তাহা শ্রবণ করত সভাস্থ সমস্ত লোকেই তর্কালংকার মহাশয় * * * ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন, * * * সভাপতি শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁ * * * উৎসাহবর্দ্ধনার্থ অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক ব্যক্ত করিলেন যে তর্কালংকার মহাশয় এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া সাধারণের হিতজনক ও অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ করাতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি, এবং তিনি সরলান্তঃকরণে প্রার্থনা করিলেন যে কালেজের অন্যান্য বিদ্বান্ পণ্ডিত মহাশয়েরা তর্কালংকার মহাশয়ের মহদ্দৃষ্টান্তের অনুগামি হউন।

তদনন্তর শ্রীযুত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুত বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের পোষকতায় ধার্য্য হইল যে তর্কালংকার মহাশয়ের পঠিত পত্র কমিটিকে প্রদান করিবেন, এবং কমিটির কর্ত্তাগণ তাহা মুদ্রাঙ্কন পূর্ব্বক সাধারণকে দিবেন।

পরে রেবরেণ্ড সভাপতি মহাশয় পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করত বলিলেন যে সকলে বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন যে হেয়ার সাহেবের প্রাইজ কমিটির মূলধন হইতে একশত টাকা উদ্বর্ত্ত হওয়াতে এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষার উন্নতি জন্য এরূপ ঘোষণা পত্র প্রকাশ করা গিয়াছে যে, যে ব্যক্তি এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের অল্পবয়সে বিবাহের ফল বিষয়ে বঙ্গভাষায় উত্তম প্রবন্ধ

লিখিতে পারিবেন তাঁহাকে ঐ টাকা পারিতোষিকরূপে প্রদান করা যাইবেক, এবং ঐ কমিটির মূলধন ক্রমে বৃদ্ধি হইলে তাহার উৎপন্ন হইতে পারিতোষিক দান দ্বারা বঙ্গভাষা রচনা বিষয়ে বিদ্যার্থিগণকে উৎসাহি করিবেন, রেবারেণ্ড মহাশয়ের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে সভাস্থ মহাশয়েরা তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন, তদনন্তর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীযুত পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালংকার মহাশয় যে রচনা পাঠ করেন আমরা তাহা প্রাপ্ত হই নাই, তাহা মুদ্রাঙ্কিত হইলে পাঠক মহাশয়দিগে জ্ঞাত করিব।

—সংবাদ প্রভাকর, ৪ জুন ১৮৪৭, পৃ ২৩

ষষ্ঠ স্মৃতিসভা

১ জুন ১৮৪৮ হিন্দু কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং রাজনারায়ণ বসু বাংলা ভাষায় লেখা একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষীয় লোকের স্বজাতীয় ভাষানুশীলনের বিষয়

কোন দেশস্থ সর্ব্বসাধারণ লোকের বিদ্যালাভ সেদেশের সকল মঙ্গলের মূলীভূত হইয়াছে। প্রভাকরের উদয়াস্ত কালের বিচিত্র শোভার ভূয়োভূয় পরিবর্ত্তন দেখিয়া যে অতুল আনন্দের উদয় হয়, বায়ু হিল্লোলে কম্পিত সুচারু শ্যামবর্ণ শস্যক্ষেত্রের সুরঙ্গ তরঙ্গাবলি সন্দর্শনে যে অপূর্ব্ব আহ্লাদ সঞ্চার হয়, বা নিশানাথ পূর্ণচন্দ্রের অজস্র সুধা বর্ষণে জগৎ সুধাময় দেখিয়া চিত্ত যে অপার পুলকে পরিপূর্ণ হয়, সূর্য্য সেই সমস্ত দৃষ্টি সুখের এক মাত্র মূল কারণ; তদ্রূপ দেশস্থ লোকের কায়িক সুস্থতা, মানসিক ক্ষমতা, লোকাচারের সুশৃংখলা, ধনের বৃদ্ধি ও ধর্ম্মের উন্নতি প্রভৃতি যত প্রকার মঙ্গল কল্প আছে, বিদ্যারূপ দীপ্যমান সূর্য্য-জ্যোতি সে সমুদয়ের এক মাত্র মূল কারণ হইয়াছে। অতএব এদেশের দুরবস্থা মোচন বা সুখোন্নতির নিমিত্তে সর্ব্বাগ্রে দেশস্থ লোকের অজ্ঞান তিমির নিরাকরণ করা অতি গুরুতর উপায় হইয়াছে। হা! যৎপরিমাণে এই মহাকার্য্য সাধনের প্রয়োজন, তাহার প্রতি তৎপরিমাণে রাজা কি প্রজা সকলেরই অবহেলা। আমারদিগের দেশ অজ্ঞান তিমির দ্বারা যে রূপ আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে চিত্ত ব্যাকুল হয়। চতুর্দ্দিকে কি মহাশূন্য দেখিতেছি! অসীম সম বিস্তারিত মরুভূমি ঘোরতর রজনীচ্ছায়াতে আবৃত রহিয়াছে! কুত্রাপি কোন ইংলণ্ডীয় বিদ্যালয় স্বরূপ ক্ষুদ্র দীপ প্রকাশে

পার্শ্ববর্ত্তী অন্ধকার আরও প্রগাঢ় বোধ হইতেছে! বিশেষতঃ সর্ব্বসাধারণের শিক্ষাস্থান যে আমারদিগের দেশীয় ভাষার পাঠশালা, তাহাও সেই অন্ধকারেরই আলয়। বিষয় কর্ম্মোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ নির্দ্দিষ্ট অংক শিক্ষা যে বিদ্যালয়ের প্রধান বা সমস্ত বিদ্যাই হইয়াছে, কতিপয় অশুদ্ধ চিরনিরূপিত পত্র লেখার অভ্যাস যাহার সম্যক্ লিপি বিদ্যা হইয়াছে, এবং অল্পজ্ঞ অংক গুরু শুভংকরের আর্য্যা এবং সরস্বতী বন্দনা, গুরুবন্দনা, গঙ্গাবন্দনা ও দাতাকর্ণাদি যাহার সমুদয় পাঠ্য গ্রন্থ হইয়াছে, সে বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের যে বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি হইবে তাহার কি সম্ভাবনা? কিন্তু কেবল বুদ্ধি বৃত্তির প্রাখর্য্য করাও বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন নহে! আমারদিগের মানসিক তাবৎ বৃত্তির উন্নতি ও সুনিয়ম করা, দুষ্ট রিপু সকল শাসন করিয়া ধর্ম্মের প্রবৃত্তি প্রবল করা, সুসাধু বিশুদ্ধ চরিত্র ভূষণে আপনাকে ভূষিত করা, পিতামাতার প্রতি ভক্তি, স্বদেশের প্রতি প্রীতি, পরোপকারে অনুরাগ সঞ্চার করা, এবং জগদীশ্বরের প্রেমামৃত রসে চিত্ত আর্দ্র রাখা, বিদ্যাভ্যাসের সম্যক্ প্রয়োজন হইয়াছে। এসমস্ত প্রয়োজন এদেশের ইংলণ্ডীয় কি দেশ্য ভাষার কোন বিদ্যালয়েই সিদ্ধ হয় না, বিশেষতঃ সর্ব্বাপেক্ষা গুরু মহাশয়ের শিষ্যগণ ইহার বিপরীত ব্যবহার সকলের অনুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হয়। তিনি তাহারদিগের চিত্তভূমিকে সুরম্য সুসৌরভ পুষ্পে আমোদিত না করিয়া ঘনরোপিত কণ্টকি বন দ্বারা ভয়ংকর করেন। যদ্রূপ সন্তানকে স্নেহের সহিত পালন করা উচিত, তদ্রূপ শিষ্যকে প্রীতির সহিত উপদেশ কর্ত্তব্য, কিন্তু গুরু মহাশয়ের ব্যবহার এ রীতির কি বিপরীত? তিনি নিয়ত ক্রোধেতে পরিপূর্ণ এবং ছাত্রেরা ভয়েতে সর্ব্বদাই শঙ্কিত। তাঁহার শত প্রকার প্রসিদ্ধ নির্দ্দয় দণ্ড ভয়ে তাহারা কম্পিতকলেবর থাকে। তাহারা শিক্ষা গুরুকে যম স্বরূপ দেখে, এবং বিদ্যালয়কে যমালয় জ্ঞান করে; সুতরাং অনেকেরই স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি শত্রুতা ভাব ও দ্বেষানল ক্রমশঃ প্রজ্বলিত হইতে থাকে। তাহারা তাঁহার আসন তলে কণ্টক স্থাপন ও তিমিরাবৃত রজনীতে মৃৎপিণ্ড বা ইষ্টক খণ্ড ক্ষেপণ করিয়া তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিতে ত্রুটি করে না, দেবদেবীর সন্নিধানে একান্ত চিত্তে তাহার মৃত্যুও প্রার্থনা করিতে নিরস্ত হয় না। এস্থলেও তাহারদিগের দুষ্পর্মতির নিরাস নাই। পিতা মাতা তাহারদিগকে এমত যন্ত্রণার স্থানে প্রেরণ করেন, ইহা ভাবিয়া কেহ কেহ পিতা মাতারও অমঙ্গল ইচ্ছা করে। এইরূপে তাহারদিগের ক্রোধ, দ্বেষ, গুরু নিন্দা ও অকৃতজ্ঞতাদি মনের কুবৃত্তি সকল প্রবল হয়। যাহারা গুরু মহাশয়ের প্রসন্নতা লাভের নিমিত্তে সচেষ্ট, তাহারা চৌর্য্যবৃত্তি ও মিথ্যাচরণের অভ্যাসে আশু নিপুণ হয়; কারণ যে বালক অপহরণ করিয়াও গুরু

মহাশয়কে তাঁহার প্রয়োজনীয় যত বস্তু প্রদান করিতে পারে, ততই তিনি তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন।

অতএব আমারদিগের যে সকল দেশীয় পাঠশালা সর্ব্বসাধারণের শিক্ষাস্থান, তাহা যখন এপ্রকার অচিন্ত্য বিষম দুর্দ্দশা গ্রস্ত, তখন দেশমধ্যে বিদ্যার আলোক বিকীর্ণ হইবার কি সম্ভাবনা? কিন্তু এই সকল পাঠশালাতেও কত লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়? ইহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইতে হয় যে বাঙ্গলা ও বেহারের প্রত্যেক শত বালকের মধ্যে কেবল আট জন মাত্র বালক বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়, এবং প্রত্যেক শত প্রৌঢ় ব্যক্তির মধ্যে ছয় জন মাত্র অল্প লেখন পঠনে সমর্থ হয়—প্রত্যেক শতে ৯২ বা ৯৪ ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ অতি সামান্য প্রকার বিদ্যার্জ্জনেও বঞ্চিত রহিয়াছে। বাঙ্গলা ও বেহারের ৬০,০০০০০ ষষ্টি লক্ষ শিক্ষণীয় বালক এবং ২১০,০০০০০ দুই কোটি দশ লক্ষ প্রৌঢ় ব্যক্তি কিরণ শূন্য প্রগাঢ় অন্ধকারে মূচ্ছির্ত রহিয়াছে!* দেশীয় লোকের এবম্প্রকার বিস্তারিত অজ্ঞান চিন্তা করিলে কাহার চিত্ত প্রদীপ্ত দুঃখানলে দগ্ধ না হয়? নিরাশয় ম্লান ও অবসন্ন না হয়? তাহারা স্বীয় পার্শ্ববর্ত্তী ইতর জন্তুর ন্যায় কেবল আহার বিহারাদি যৎকিঞ্চিৎ ইন্দ্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করাই জীবনের সমুদয় কার্য্য বোধ করে। পশুর সহিত মনুষ্যের কি প্রভেদ? মনুষ্যের উৎকৃষ্ট সুখের কারণ কোন্ পদার্থ, ও মনুষ্যের স্বভাবের উৎকর্ষই বা কি? কিরূপ শক্তির বীজ সকল আমারদিগের মনে স্থাপিত আছে, এবং তাহার প্রকাশ ও উন্নতি হইয়া কি প্রকার মহৎ মঙ্গলের উদয় হইতে পারে? এই সংসারেরও সুখস্বচ্ছন্দতা কি প্রকারে প্রাপ্ত হয়, এবং রাজপদের সৃষ্টি ও রাজা প্রজার প্রভেদই বা কি নিমিত্তে হইয়াছে? এ সকলের কিছুই তাহারা জ্ঞাত নহে, তাহারদিগের চিন্তা স্রোত এ পথে স্বপ্নেও কখন প্রবাহিত হয় নাই। তাহারা অজ্ঞান নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে!

দেশহিতৈষি পুরুষ এবং দয়াশীল রাজা ইহারদিগের জ্ঞানোদয়ের উপায় ধার্য্য না করিয়া কি প্রকারে মনঃস্থির রাখিতে পারেন? এ অসাধারণ অজ্ঞান নিরাকরণ না হইলে এদেশের মঙ্গলোন্নতি জন্য অন্য কোন চেষ্টা সফল হইবে না। কিন্তু ইহার উপায় করা কি বীস্তীর্ণ কার্য্য। ক্রোশ বা দ্বিক্রোশান্তে পাঠশালা স্থাপন ব্যতীত সাধারণরূপে বিদ্যাজ্যোতি ব্যাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু বাঙ্গলা পাঠশালা সকলের বর্ত্তমান অবস্থা যত কাল থাকিবে, ততকাল এ আশা অতি ক্ষুদ্র পরিমাণেও সার্থক হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব তৎপরিবর্ত্তে উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় সকল

*William Adams Report on the State of Education in Bengal and Behar & oreviewed in the Calcutta Review No. 5.

সংস্থাপন করা, বঙ্গভাষায় বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক উত্তমোত্তম গ্রন্থ সকল প্রস্তুত করা, এবং ছাত্রদিগকে তাহার উপদেশ প্রদানের নিমিত্তে সুযোগ্য কৃতবিদ্য শিক্ষক সকল নিযুক্ত করা ইহার আবশ্যক উপায় হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ইংলণ্ডীয় ভাষায় নানাবিধ পুস্তক প্রস্তুত আছে, ও তাহার সুনিপুণ শিক্ষক সকল অনায়াসে প্রাপ্ত হয়, অতএব এদেশীয় লোককে বাঙ্গালার পরিবর্তে সাধারণ রূপে ইংলণ্ডীয় ভাষায় উপদেশ করা উচিত! অনেক ইংলণ্ডীয় পুরুষ এবং আমারদিগের স্বদেশস্থ কোন কোন ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ যুবাও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার পর অলীক মতও আর নাই। এ ভ্রম খণ্ডনের নিমিত্তে এই মাত্র বিবেচনা করা উচিত যে আত্ম ভাষায় কি পর ভাষায় জ্ঞান উপার্জ্জন সুলভ হয়? এ বিষয় আমারদিগের কোন সংশয় স্থলই বোধ হয় না—ইহা প্রশ্নেরও যোগ্য নহে। শিশুর রসনা মাতৃ দুগ্ধ পানের সহিত যে ভাষার অনুশীলন করে, বিদ্যারম্ভের পূর্ব্বকালেই যে ভাষার অর্দ্ধভাগ তাহার কণ্ঠগত হয়, এবং তরুণ বা প্রৌঢ় কালে সাধ্যপর যত্নেও যাহা বিস্মৃত হইতে লোক অসমর্থ হয়, সেই পৈতৃক ভাষা অভ্যাস করা সুলভ নহে, আর পৃথিবীর ভিন্ন প্রান্তবাসী পরজাতীয় ভাষা শিক্ষা সুলভ, ইহা কি প্রকারে মনুষ্যের মনোগত হয়? পরদেশীয় ভাষা মাত্র অভ্যাসে যে কাল ব্যয় হয়, সে কাল মধ্যে স্বদেশীয় ভাষায় বিবিধ বিদ্যার সংস্কার হইতে পারে। যে অল্প ব্যক্তির স্বচ্ছন্দ অবস্থা, সুতরাং জ্ঞানার্জ্জনের যথেষ্ট কাল প্রাপ্তির উপায় আছে, তাহারা যদিও বহু অংশে কৃতার্থ হইতে পারে কিন্তু দেশময় যে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র সন্তান অন্নাভাবে শীর্ণ, বা যে সকল মধ্যবর্ত্তী গৃহস্থ বালকেরা দুরবস্থ হইয়া ক্ষুণ্ণ ভাবে কালযাপন করে, যাহারদিগের পিতা মাতা কেবল আপন পুত্রদিগের ভাবী উপার্জ্জনের প্রত্যাশায় প্রাণ-ধারণ করেন, সে সকল বালকের পরের ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া বিদ্যা লাভের সময় নাই, তাদৃশ বহু মূল্যে জ্ঞানার্জ্জন করিবার উপায়ও নাই। সকল দেশেরই এই প্রকার ভাব, এ নিমিত্তে ইংলণ্ড দেশে উপায়ক্ষম ব্যক্তিদিগের নানা ভাষা শিক্ষার জন্য নগর বিশেষে যেরূপ মহা মহা বিদ্যাগার বর্ত্তমান আছে, তদ্রূপ সর্ব্বসাধারণের বিদ্যাভাস নিমিত্তে গ্রামমধ্যে দেশ ভাষার পাঠশালা সকল স্থাপিত আছে। এ দেশের বিষয়েও রাজপুরুষদিগের সেই নিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ ইহাও বিবেচনার যোগ্য যে আত্মভাষা অপেক্ষা পরভাষা শিক্ষার নিমিত্তে চতুর্গুণ ধনের প্রয়োজন। ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রদিগের জ্ঞানাভ্যাসে যে ব্যয় হয়, স্বভাষার বালকেরা তাহার চতুর্থ অংশের এক অংশ ব্যয়ে তুল্য জ্ঞান উপার্জ্জন

করিতে পারে। তৃতীয়তঃ স্বদেশের বিদ্যা যত কাল স্বদেশের ভাষা স্বরূপ সুচারু পরিচ্ছদ পরিধানে সজ্জীভূত না হয়, ততকাল সর্ব্বসাধারণের হৃদয় গত কখনই হইতে পারে না। এইক্ষণে যে রূপ বিদ্যা শূন্য পুরুষেরা ও জ্ঞানাধিকারবঞ্চিত অবলারা পুরাণাদি অধ্যয়ন না করিয়াও সুস্পষ্ট রূপে জ্ঞাত আছে যে পৃথিবী বাসুকীর মস্তকোপরি অবস্থিতি করিতেছে, সূর্য্য এক লক্ষ ও চন্দ্র দ্বি লক্ষ যোজনোপরি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, রাহু দৈত্যের গ্রাস দ্বারা সময়ে সময়ে তাহারদিগের গ্রহণ হইতেছে, এবং অদিন ও অক্ষণে যাত্রা করিলে রোগাদি অমঙ্গল ঘটনা, ও দেবতা বিশেষের উদ্দেশে কামনা বিশেষ দ্বারা তাহার নিরাকরণ অবশ্যই হয়; তদ্রূপ আমারদিগের দেশীয় ভাষায় বিদ্যানুশীলন প্রচলিত হইলে তাহারা পরম্পরা শ্রুতি দ্বারাও অনায়াসেই জানিবে যে ভূমণ্ডল শূন্যেতে স্থিতি করিয়া সূর্য্যকে সম্বৎসরে পরিবেষ্টন করে, সূর্য্য মণ্ডল চন্দ্র অপেক্ষা বহু উর্দ্ধে স্থিতি করে, ভূচ্ছায়া প্রবেশ দ্বারা চন্দ্র গ্রহণের ও চন্দ্রবিম্ব আবরণ দ্বারা সূর্য্যগ্রহণের সংঘটনা হয়, দুর্গন্ধ ঘ্রাণ ও অপরিমিত ভোগাদি শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ করা রোগের এক মাত্র কারণ, ও শারীরিক নিয়ম পালন করাই সুস্থতার হেতু, ঈশ্বরের যে বিষয়ক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবে তদ্দ্বারা সেই বিষয় ঘটিত অমঙ্গল হইবে, এবং যে বিষয়ক নিয়ম পালন করিবে তদ্দ্বারা সেই বিষয়ের সুখ প্রাপ্তি হইবে। স্বদেশোৎপন্ন শস্য যে রূপে সকলের সুলভ হইয়া সর্ব্বসাধারণের বল বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ স্বদেশের ভাষা দ্বারা সকলে জ্ঞান তৃপ্ত হইয়া তৎফল সুখ সম্ভোগ করিতে পারে।

এ দেশে পঞ্চবিংশতি বৎসরাবধি যে ইংরাজী ভাষার অনুশীলনা যত্নের সহিত আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে কি ফল লব্ধ হইল? এমত কি আশাই বা সঞ্চার হইয়াছে যে ভবিষ্যতে এদেশীয় লোক কেবল ইংলণ্ডীয় ভাষা দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জনে সমর্থ হইবে। ইহা সত্য যে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক দুই সহস্র ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন, এবং বিদ্যার প্রভাবে তাঁহারদিগের সংস্কৃত চিত্ত অজ্ঞান ঘনাম্বুদোপরি উত্থিত হইয়া অতি প্রসারিত নির্ম্মল জ্ঞানাকাশে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু তাহারদিগেরও মধ্যে কয় ব্যক্তি সে ভাষাতে বিনা সংশয়ে রচনা করিতে পারেন? আর সমস্ত দেশস্থ লোকের তুলনায় সেই দুই সহস্র সংখ্যাই বা কত? বর্ত্তমান কোন পত্র সম্পাদক যথার্থ বলিয়াছেন যে আর পঞ্চবিংশতি বৎসর পরে রাজধানী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে না হয় এ-দেশস্থ পঞ্চ সহস্র ব্যক্তি ইংলণ্ডীয় ভাষাতে পারদর্শী হইবে, কিন্তু এই পঞ্চ সহস্রই বা কত? এদেশীয় সমস্ত লোকের পঞ্চ সহস্র অংশের এক অংশও নহে।

ইংলণ্ডীয় ভাষার প্রেমমুগ্ধ কোন কোন ব্যক্তির পরমপ্রিয় বাসনা এই যে ইংলণ্ডীয় ভাষা এই মহা বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের দেশ ভাষা হইবে, এবং এই-ক্ষণকার দেশ ভাষা সকল ঐ পরভাষা বলে লুপ্ত হইবে। কিন্তু ইহার পর

অলীক কথা আর নাই। যাঁহারা একথা কহেন, তাঁহারা ইহাও বলিতে পারেন যে ভারতবর্ষের তাবৎ ভূমি খনন করিয়া ইংলণ্ড ভূমি দ্বারা তাহা পূর্ণ করিবেন। কোন দেশের ভাষা যে এককালে উচ্ছিন্ন হয় ইহা যুক্তি সিদ্ধ নহে, ইতিহাসেও ইহার উদাহরণ প্রাপ্ত হয় না। ইহা সত্য যে গ্রীক ও রোমান লোকেরা আপনার-দিগের অধিকৃত দেশে আত্ম ভাষা প্রচারের যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কার্য্যে তাঁহারা কি পর্য্যন্ত কৃতার্থ হইয়াছিলেন। সেই সকল দেশের ভাষা উচ্ছেদ করিতে তাঁহারা কত দূর সমর্থ হইয়াছিলেন? স্বভাবতঃ অধিকারি জাতির অধিকার নাশের সহিত অধিকৃত দেশ হইতে তাহারদিগের ভাষা লুপ্ত হইতে থাকে। মিশর দেশে রোমানদিগের অধিকার চ্যুত হইলে গ্রীক ভাষার ব্যবহার লুপ্ত হইল, কিন্তু তাহার দেশ ভাষা যে কপ্‌টিক তাহা এইক্ষণকার দুই শতবর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। ফ্রান্‌স ও স্পেন দেশেও তাদৃশ ঘটনা হয়। সীরিয়া দেশে গ্রীকদিগের অধিকার কালে যে সকল নগর গ্রীক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার দেশ ভাষার প্রাচীন নামে খ্যাত হইল। বাস্তবিক জয়ী লোকেরা যদি পরাজিত দেশে বহু সংখ্যাতে পুরুষানুক্রমে বসতি করেন, এবং পুরোবাসিদিগের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা মিশ্রিত হয়েন, তবে উভয়ের সংশ্রবে এক নূতন সংকীর্ণ ভাষা উৎপন্ন হয়। হিন্দুস্থানী ও পারসিক এবং ফ্রেঞ্চ ও স্পানিষ প্রভৃতি ভাষার এই রূপ উদ্ভব হইয়াছে। যদি জয়বান্‌ জাতি স্বাধিকৃত দেশে বাহুল্যরূপে বসতি না করেন, এবং বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা তাহারদিগের সহিত এক জাতিভূত না হয়েন, তবে সে দেশীয় ভাষার বিশেষ অন্যথা হওয়া সম্ভব নহে। আরবেরা যে ইটালী ও সিশিলি দ্বীপ অধিকার করিয়াছিল, তাহার কি নিদর্শন এইক্ষণে প্রাপ্ত হয়? জয়ী লোক যদি পরাজিত লোককে তাহারদিগের স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আপনারা তাহাতে বাস করেন, তবে সেখানে তাঁহারা আপনারদিগের ভাষা আপনারাই ব্যবহার করেন, তাহাতে সে দেশীয় লোকের ভাষার কি অন্যথা হইল? অতএব যে পক্ষে বিচার করুন, ভারতবর্ষের দেশ ভাষা সকল উচ্ছিন্ন হইয়া তৎপরিবর্ত্তে যে ইংরাজী ভাষা স্থাপিত হইবে, ইহা কেহ যেন মনেও স্থান দেন না—নিঃসংশয়ে এই ভবিষ্যৎ কথা ব্যক্ত করিতেছি যে কাহারও এমনস্কামনা কদাপি সিদ্ধ হইবে না।

আমারদিগের দেশ ভাষার অনুষ্ঠানের প্রতি যে সকল ইংলণ্ডীয় লোক পূর্ব্ব পক্ষ করেন, তাঁহারদিগের মত খণ্ডনের নিমিত্তে পূর্ব্বোক্ত যুক্তিসকল প্রয়োগ করা উচিত, কিন্তু ব্যক্ত করিতে লজ্জা উপস্থিত হইতেছে যে আমারদিগের স্বদেশস্থ ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ কতিপয় যুবাপুরুষ অম্লান বদনে কহিয়া থাকেন যে "সেই বাঞ্ছিত কাল কোন্‌ দিন আগমন করিবে যখন কেবল ইংরাজী ভাষা এই দেশের জাতীয় ভাষা হইবে।" হা! ইংলণ্ডীয় ভাষার বিদ্যাভ্যাসে ছাত্রদিগের

বুদ্ধির প্রাখর্য্য হইতেছে বটে, কিন্তু কি বিষমর বিপরীত ফলেরও উৎপত্তি হইতেছে। তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেই অন্য অন্য বিদ্যা শিক্ষার সহিত স্বদেশের ভাষা, স্বদেশের বিদ্যা ও স্বদেশের লোককে তুচ্ছ করিতে নিয়মিত শিক্ষা করেন। যেরূপ কেহ কেহ আপনার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জানাইবার জন্য অনবরত ইংরাজী কথনাদি দ্বারা এইরূপ ছল করেন যে ইংরাজী সংস্কারে বঙ্গভাষা এককালে বিস্মৃত হইয়াছেন, তদ্রূপ অনেকে আপনার বিদ্যাভিমানে প্রমত্ত হইয়া স্বদেশের কোন পদার্থই সমাদর যোগ্য বোধ করেন না—হিন্দু নাম তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। বিদেশীয় পণ্ডিতেরা চিত্ত প্রমোদ কারিণী সুমধুর সংস্কৃত ভাষার ললিত গুণে মোহিত রহিয়াছেন, আর আমারদিগের ইংরাজি ভাষার বহু ছাত্র তাহা পাঠ্য বোধ করেন না—সে যে কি দুর্লভ অমূল্য রত্নাকর, তাহার অনুসন্ধান করাও উচিত বোধ করেন না। দেখ, ইঁহারদিগের কি বিপরীত ব্যবহার! ইহারা পর-দেশের ইতিহাস যথোচিত অভ্যাস করেন, কিন্তু স্বদেশের পুরাবৃত্ত সন্ধান করা আবশ্যকও বোধ করেন না। ইউরোপ খণ্ডের অন্তঃপাতি কোন্ দেশের কোন্ স্থানে কি নগর? কোন্ বৎসর তাহা নির্ম্মিত হইয়াছে? তদবধি সেখানে কি কি বিষয়ের ঘটনা হইয়াছে? তাহা তাঁহারদিগের সুসূক্ষ্ম রূপে জ্ঞাত হইতেই হইবে; কিন্তু আপনারদিগের এই জন্ম ভূমির তদ্রূপ বিবরণ জানিবার জন্য কয় ব্যক্তি সচেষ্ট হয়েন? এই কলিকাতা নগরীর চতুর্দ্দিকে বিংশতি ক্রোশ দূরে কোন্ স্থান তাহা অনেক কৃতবিদ্য পুরুষ জ্ঞাত নহেন। পূর্ব্বকালে ইংরাজদিগের কি প্রকার স্বভাব ছিল? কি প্রকার ক্রমানুসারে এতাদৃশ সদবস্থা হইল? তাহারদিগের কোন্ বংশের কোন্ রাজা কোন্ দিবস রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া কোন্ দিন কি কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং কয় বৎসর কয় মাস পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করিয়াছেন? এতাদৃশ সকল বৃত্তান্তের অতি সূক্ষ্ম অঙ্গ পর্য্যন্ত তাঁহারা বিশেষ পরিশ্রম পূর্ব্বক শিক্ষা করেন; কিন্তু আপনারদিগের কি মূল? পূর্ব্বে কোন্ সময়ে আমারদিগের কিরূপ অবস্থা ছিল? কিরূপ ধর্ম্ম ছিল? কি কি বিদ্যা প্রচার ছিল? এতাদৃশ সকল বিষয়ে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত কি পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনাও আছে, কি আক্ষেপের বিষয়! ইহাও জানিবার জন্য কেহ অনুরাগী নহেন। গ্রীক, রোম, ফ্রান্স, জর্ম্মেণি প্রভৃতি ইউরোপস্থ সমস্ত দেশের প্রাচীন বা আধুনিক ইতিহাস সামান্যত কণ্ঠাগতই আছে, তথাপি কোন্ দিন কোন্ গ্রন্থ কর্ত্তা তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া কি নূতন ব্যাপার প্রকাশ করিলেন, ইহা জানিবার জন্য তাঁহারা কত উৎসাহী! নেবোরের রোমান ইতিহাস ও থরল্ ওয়ালের গ্রীক ইতিহাস পাঠের নিমিত্তে কত ব্যগ্র! কিন্তু ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত জানিবার জন্য কে অভিলাষ করে? এসিয়াটিক্ রিসর্চ্চ ও এসিআটিক সমাজের জর্নেল গ্রন্থ কে পাঠ করে? তদ্বিষয়ে এইক্ষণে

এসিয়া, ইউরোপ, ও আমেরিকা খণ্ডে যে কত চেষ্টা হইতেছে তাহার সন্ধান কে রাখে ?

যাঁহারদিগের এরূপ অস্বাভাবিক ও বিপরীত রীতি হইল, আত্ম ভাষার উচ্ছেদ মানস করা তাঁহারদিগের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। আপাততঃ তাঁহারদিগের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় ভেদ হইয়াছে বটে, যাঁহারা মৌখিক বলেন যে দেশ ভাষার অনুশীলন করা অতি আবশ্যক কর্ম্ম। কিন্তু ইহা কি তাঁহারদিগের আন্তরিক বাসনা ? ইহা কি তাঁহারদিগের এমত স্নেহের বিষয় যে তাহা সিদ্ধ না হইলে মনেতে অসহ্য বেদনা বোধ হইবে ? ইহা যদি হইবে তবে তাঁহারা ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ কোন মিত্রকে প্রাপ্ত হইলে কেবল ইংরাজী কথোপকথনেই মনের দ্বার কেন উদ্ঘাটন করেন ? বাঙ্গালির সভাতে ইংরাজী কথা ও ইংরাজী বক্তৃতা কেন করিয়া থাকেন ? যাহা হউক এ সকল ব্যবহার জন্ম ভূমির প্রতি প্রেমের চিহ্ন নহে। জন্ম ভূমির নাম উচ্চারণ করিলে কি অনির্ব্বচনীয় স্নেহ পাত্র সকল মনেতে উদয় হয়—প্রেমামৃত রস সাগরে চিত্ত প্লাবিত হয়! যে স্থানে আমরা শৈশবকালে স্নেহ মিশ্রিত যত্ন দ্বারা লালিত হইয়াছি, যে স্থানে বাল্য ক্রীড়া দ্বারা আহ্লাদের সহিত বাল্যকাল যাপন করিয়াছি, যে স্থানে যৌবনের প্রারম্ভাবধি সহযোগি মিত্রদিগের প্রীতি দ্বারা সতত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি, যে স্থানে আমারদিগের বয়োবৃদ্ধির সহিত সুহৃদ্ মণ্ডলীর সীমা বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং যে স্থানের প্রসাদে ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, যশঃ, সম্পদ্, যাহা কিছু সকলই আমারদিগের লব্ধ হইয়াছে, সে স্থানের প্রতি বিশেষ স্নেহ হওয়া কি স্বভাব সিদ্ধ নহে ? স্বদেশ এ প্রকার প্রিয় পদার্থ যে তাহার নদী, পর্ব্বত, মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আমারদিগের প্রণয় আকর্ষণ ও আহ্লাদ সঞ্চার করে। জন্ম ভূমির নাম দ্বারা সেই বস্তুর নাম উচ্চারণ করা হয় যাহার অপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ পৃথিবী মধ্যে আর নাই—যে নাম চিন্তা মাত্র পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা সুহৃদ্ বান্ধবের প্রেমার্দ্র আনন সকল মনেতে জাগ্রৎ হইয়া উঠে। যিনি প্রবাসী হইয়া দূর হইতে আপনার দেশ স্মরণ করিয়াছেন, তিনিই স্বদেশের মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই জানেন যে জন্ম ভূমি মনুষ্যের দৃষ্টিতে কি রমণীয় বেশ ধারণ করে। "কাশ্মীরের নির্ম্মল হ্রদ ও মনোহর উদ্যান, কিম্বা শিরাজের সুচারু গুলাব পুষ্পের উপবন" কিছুতেই তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট রাখিতে সমর্থ হয় না। তিনি বালুময় মরুভূমি বাসী হইলেও সেই স্বদেশ সন্দর্শন পিপাসায় ব্যাকুল থাকেন। এমত সুখের আকর যে জন্মভূমি তাহার প্রতি যাহার প্রীতি না থাকে, সে কি মনুষ্য ? পূর্ব্বে আমারদিগের স্বজাতীয় লোকের এরূপ ব্যবহার কখনই ছিল না। অদ্যাপি কাহার মুখে এই রমণীয় শ্লোকার্দ্ধ শ্রুত না হয় যে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ?" বীর্য্যবান গ্রীক জাতি ও জয়পিপাসু রোমান্ জাতির চরিত্র পাঠে আহ্লাদ সঞ্চার হয়,

কিন্তু অমরকীর্ত্তি পাণ্ডু পুত্র ও যুদ্ধদুর্ম্মদ রাজপুত্রদিগের নামোচ্চারণ মাত্র চিত্ত হর্ষোন্মত্ত হইয়া কি উৎসাহে উল্লম্ফন করিতে থাকে। সেক্‌স্‌পিয়ার স্তুতি যোগ্য এবং নিউটন্‌ অতি বরণীয় বটে, কিন্তু আমারদিগের কালিদাস ও আমারদিগের আর্য্য ভট্টের স্মরণে অন্তঃকরণ কি অপার প্রেমার্ণবে সন্তরণ করে! হোমর্‌ ও বর্জ্জিল অতি প্রসিদ্ধ মহাকবি, কিন্তু বিশাল মহাভারত ও হৃদয়রঞ্জন রামায়ণ এ সকল আমারদের! প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন্‌ এবং আধুনিক আরবী ও পারসীক বা ইংরাজী ও জর্ম্মাণ্‌, অবনীর সকল ভাষা এক দিকে, আর অন্য দিকে সুচারু সুমধুর শব্দ রত্নাকর মহাভাষা সংস্কৃতকে পরিমাণ করিলে আমারদিগের সংস্কৃতই সকল অপেক্ষা গুরুতর হইবে। হিন্দু নাম অতি মনোরম শব্দ! হিন্দু হইয়া হিন্দু নাম লোপ করিবার বাসনা ইহার পর যাতনার বিষয় আর কি আছে? জন্মভূমির হীন অবস্থা মোচনে যত্ন না করিয়া তাহার প্রতি অনাদর করা—জননীর জীর্ণ শরীর সুস্থ না করিয়া তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা করা, ইহার অপেক্ষা হৃদয় বিদীর্ণকারী ব্যাপার আর কি আছে?

যদিও এই লিপিপ্রকরণের পৃথক্‌ উদ্দেশ্য, তথাপি ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ অনেক যুবকের প্রবোধার্থে অনুষঙ্গাধীন স্বদেশের প্রীতি প্রসঙ্গ স্বভাবত উদয় হইল। এখন বিবেচনা কর, যে স্থানের নদী পর্বত মৃত্তিকা পর্যন্ত আমারদিগের প্রীতি পাত্র, সে স্থানের ভাষা, যে ভাষাতে আমরা মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া শৈশবকালের অর্দ্ধস্ফুট মধুর বাক্য ভাষণে মাতা পিতার হাস্যানন করিয়াছিলাম, সে ভাষার প্রতি প্রীতি না হওয়া মনুষ্য স্বভাবের যোগ্য নহে। জননীর স্তন দুগ্ধ যদ্রূপ অন্য সকল দুগ্ধ অপেক্ষা বল বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ জন্ম ভূমির ভাষা অন্য সকল ভাষা অপেক্ষা মনের বীর্য্য প্রকাশ করে। এই প্রকরণলেখকের কোন মান্য মিত্র অনেক উদাহরণ সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন যে পরভাষার আলোচনায় মনের শক্তি স্ফূর্ত্তি হয় না, এবং আত্ম ভাষার অনুশীলন বিনা কোন দেশে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের উদয় হয় নাই। দেখ ভারতবর্ষের সমীপবর্ত্তী পারসীক দেশে যে পর্য্যন্ত কেবল আরবী ভাষার আলোচনা বিশিষ্ট রূপে প্রচার ছিল, সে পর্য্যন্ত সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তার উদয় হয় নাই। তৎপরে মহাকবি ফের্‌দোসী আত্মভাষাতে শাহনামা গ্রন্থ রচনা করিলে কত কাব্যামৃত রস পূর্ণ গ্রন্থ সকল প্রকাশ হইতে লাগিল। তখন সাদি আপনার সুকোমল মধুরস্ফীত উপদেশ পুস্তকের সহিত উদয় হইলেন। তখন হাফেজ্‌ চিত্ত প্রমোদকারী অতি রমণীয় সঙ্গীত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। রোমানেরা অনেক দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, ও সে সকল দেশে আপনারদিগের ভাষা ও বিদ্যা প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বদেশ ইটালী ব্যতীত তাহারদিগের অধীন অন্য অন্য দেশে প্রায় কোন ব্যক্তি যশস্বী গ্রন্থকর্ত্তা রূপে বিদিত হয়েন নাই।

সুবিখ্যাত বর্জিল ও হোরেস্, এবং লিবি ও সিসরো ইহাঁরা সকলেই ইটালী-ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। জর্ম্মেণি দেশেতে কীর্ত্তিমান ফ্রেডরিক্ রাজার রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত ফ্রেঞ্চ ভাষার বহু সমাদর ছিল, তত্রস্থ বিদ্বান্ লোকেরা সেই ভাষারই অনুষ্ঠান করিতেন, এবং তাহাতেই রাজকার্য্য সম্পন্ন হইত, তথাপি তৎকাল পর্য্যন্ত সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই। পরে যখন গোএথি নামক মহাকবি স্বকৃত ললিত কবিতা দ্বারা আপনার দেশ ভাষা উজ্জ্বল করিলেন, তদবধি সে দেশীয় অন্য মহা মহা গ্রন্থ কর্ত্তা আপনারদিগের অসাধারণ মানসিক বীর্য্যোদ্ভব রচনা সকল প্রকাশ করিয়া মানব জাতিকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। ইংলন্ড দেশে যতদিন নর্ম্মান ফ্রেঞ্চ নামক ভাষার আলোচনা ছিল, ততদিন সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই. পরে যখন বিখ্যাত কবি চাসর্ স্বদেশীয় ভাষাতে আপনার কবিতা সকল প্রকাশ করিলেন, তদবধি কত মহত্তম মধুরতম গ্রন্থ সকলের উদয় হইতে লাগিল। সামান্যত দেখ ইউরোপ খন্ডে যে পর্য্যন্ত লাটিন্ ভাষায় বিদ্যাভ্যাসের রীতি প্রচলিত ছিল, সে পর্য্যন্ত সেখানে বিদ্যার স্ফূর্ত্তি হয় নাই. ও উত্তমোত্তম গ্রন্থ সকলও প্রকাশ হয় নাই; তৎখন্ডের লোক সেই কালের অন্ধ কাল সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তৎপরে ইটালী, স্পেন, পোর্টুগেল্, ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশীয় লোকেরা যখন স্ব স্ব দেশ ভাষার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, তদবধি ইউরোপ খন্ড গ্রন্থকারদিগের যশেতে আমোদিত ও জ্ঞানজ্যোতিতে উজ্জ্বল হইতে লাগিল। ইহা কি সুখের চিন্তা? যে যদি এই মহাত্মাদিগের ন্যায় আমরা আত্ম ভাষাকে সুশোভিত করিতে পারি এবং তাহাতে যদি সুরচিত গ্রন্থ সকল প্রকাশ হয়, তবে আমারদিগের অতি অনুপম আত্ম সন্তোষ লব্ধ হইবে, ভবিষ্যৎ পুরাবৃত্ত বেত্তারা আত্মভাষাপ্রেমিক পূর্ব্বোক্ত জাতিদিগের মধ্যে আমারদিগকেও গণ্য করিবেন, এবং পরজাতীয় লোকেরা আমারদিগের সুচারু রচিত প্রস্তাব সকল পাঠের নিমিত্তে আমারদিগের ভাষা অধ্যয়ন করিবেন। আমারদিগের দেশ ভাষা যে এমত সুললিত হইবে ইহা সম্যক্ সম্ভব, কারণ তাহার বর্ত্তমান আকর যে রত্নাকর সংস্কৃত, তাহার ন্যায় সুশোভন সর্ব্বার্থ প্রতিপাদক মহাভাষা এই ভূমন্ডলে কদাপি আর বিরাজমান হয় নাই।

2 more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either. Sir W. Jonse's Work

অতএব যে স্বদেশস্থ বিজ্ঞ যুবক গণ! আমারদিগের দেশ ভাষা অনুষ্ঠানের বিপক্ষে পরদেশীয় কোন লোক যাহা বলুক, কিন্তু তাহারদিগের সঙ্গী হইয়া তোমারদিগের হাস্যাস্পদ হওয়া উচিত নহে। পরন্তু অনেক ইংরাজেরও এই একান্ত মত যে সামান্য প্রকার বিদ্যাভ্যাস করা যাহারদিগের প্রয়োজন, তাহারদিগের আপন ভাষা শিক্ষাই কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা কি ইহাতেই তৃপ্ত

থাকিব ? আমারদিগের উচিত যে সর্ব্বস্থানের সমস্ত বিদ্যা আপন ভাষাতে সংগ্রহ করি, বেকন ও লাক্, নিউটন ও লাপ্‌লাস্, কুবিয়র্ ও হুম্বোল্‌ট প্রভৃতি সর্ববিধ তত্ত্বশাস্ত্র প্রকাশকাদিগের গ্রন্থ আত্ম ভাষাতে ভাষিত করি, যাহাতে অতি উৎকৃষ্ট গুরুতম বিদ্যাসকলও স্বদেশীয় ভাষার দ্বারা শিক্ষা করা যায়। যদিও সর্ব্ববিবেচনাতে দেশ ভাষায় বিদ্যাভ্যাসের রীতি প্রচলিত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজীর অনুশীলন রহিত করা কদাপি মত নহে। যাহারদিগের সময় আছে ও উপায় আছে, তাহারদিগের ইংরাজী ভাষা উপার্জ্জন করা অতি প্রয়োজনীয় ও মহোপকারী হইয়াছে। বরঞ্চ বর্ত্তমান কালে ইউরোপ খণ্ড যে সমস্ত বিবিধ বিদ্যার আধার হইয়াছে, সেই ইউরোপীয় ভাষা সকল শিক্ষা ব্যতীত তাহা কদাপি সম্যক রূপে উপার্জ্জিত হইবার নহে; আমারদিগের মূল ভাষা সংস্কৃত এদেশীয় সকল শাস্ত্র ও সকল বিদ্যার আধার ও বর্ত্তমান দেশ ভাষা সকলেরও আকর স্বরূপ হইয়াছে; এবং আরবী ও পারসিক ভাষা কাব্যামৃতের সমুদ্র, অতএব দেশ ভাষার পাঠশালা ব্যতীত স্থান বিশেষে এমত মহাবিদ্যাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন যেখানে বিদ্যার্থিরা ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, ও জর্ম্মান এবং সংস্কৃত, আরবী, ও পারসীক ভাষা সুন্দররূপে অভ্যাস করিতে পারে। এ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার যত বিলম্ব থাকুক, কিন্তু উৎকৃষ্ট নিয়মে দেশ ভাষার পাঠশালা সকল স্থাপন করা আশু প্রয়োজনীয় হইয়াছে। কিন্তু কি প্রকারে এই বৃহৎ কার্য্য সাধন হইতে পারে? ইহা বলা বাহুল্য যে গবর্ণমেণ্টের ইহাতে উৎসাহের সহিত সচেষ্ট হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য, কারণ প্রজাদিগকে বিদ্যাদান রাজ কার্য্যের প্রধান অঙ্গ হইয়াছে। সাধারণ প্রজারা বিদ্যার আস্বাদন প্রাপ্ত না হইলে অন্যকে বিদ্যাবিতরণে কিরূপে তাহারদিগের প্রবৃত্তি হইবে—জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে পিতার মন বিশুদ্ধ না হইলে পুত্রের বুদ্ধি সংস্কারে তাহার কেন যত্ন হইবে? বিশেষতঃ রাজার এক আজ্ঞাতে যাহা হইবে, সহস্র সহস্র প্রজার যুগপৎ চেষ্টাতেও তাহা সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর। রাজা যদি এই নিয়ম বলবৎ রাখেন যে সমস্ত রাজকার্য্য দেশ ভাষাতে সম্পন্ন হইবে, তবে আপনা হইতেই কত লোক আত্মভাষা শিক্ষাতে সযত্ন হয়েন। যদি বল গবর্ণমেণ্ট এ উপায় অগ্রেই করিয়াছেন—আগেই তাঁহারা শাখা নগরস্থ বিচারালয়ের কার্য্যে দেশ ভাষা ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছেন, এবং বঙ্গ দেশের স্থানে স্থানে এক শত বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহা নিরর্থক হইয়াছে? এই উভয় বিষয়েই তাঁহারদিগের যদ্রূপ অবহেলা তাহাতে সকলে অনায়াসে মনে করিতে পারেন, যে তাঁহারা কেবল এবিষয়ে আপনারদিগের অনুৎসাহ গোপন করিবার নিমিত্তে এই উভয় নিয়ম প্রচার করিয়াছেন। বঙ্গ দেশীয় বিচারালয় সকলে বঙ্গ ভাষা ব্যবহারের নিয়ম প্রচার করিয়া তাহা সফল করিবার জন্য কি উপযুক্ত উপায় চেষ্টা করিয়াছেন? তাঁহার কি তৎ পরে

অনুসন্ধান করিয়াছেন যে সে নিয়ম বলবৎ হইতেছে কি না? এইক্ষণে যে ভাষাতে সেই সকল বিচারালয়ে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় সে ভাষা বাঙ্গালা নহে, হিন্দী নহে, পারসীক নহে, কিন্তু তাহা এই সমুদয় ভাষার সন্নিপাত স্বরূপ হইয়াছে। বিচারালয়ের কোন লিপি এ পর্য্যন্ত শুদ্ধ দেখি নাই, যাহারা কোন কালে ভাষা রচনা শিক্ষা করে নাই, তাহারাই বিচারাগারের লিপি কর্ম্মচারী। জ্ঞানাপন্ন রাজাদিগের রাজকার্য্যের যে এইরূপ বিকৃতি হয়, ইহা অতি দুঃখের বিষয়। নিয়ম আছে অথচ তদনুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান হয় না, ইহা কদাপি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যোগ্য নহে। পূর্ব্বোক্ত এক শত বিদ্যালয়ের কথা কি কহিব? তাহার দুরবস্থা আলোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট বোধ হয় যে সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের লেশ মাত্রও যত্ন নাই, তাহার প্রয়োজন সিদ্ধ করা তাহারদিগের অভিপ্রায় নহে। এই সকল পাঠশালা অপেক্ষা ইংলণ্ডীয় ভাষার বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহারদিগের যেরূপ উৎসাহ, তাহা চিন্তা করিলেই তাঁহারদিগের আন্তরিক অভিপ্রায় সুন্দর প্রকাশ পায়। তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিমিত্তে প্রচুর ধন ব্যয় করেন, তাহার তত্ত্বাবধারণ বিষয়ে বহু মনোযোগ করেন, উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুতির জন্য পৃথক বিদ্যাগারও স্থাপন করিয়াছেন*, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঐ এক শত বাঙ্গালা পাঠশালার প্রতি তাঁহারদিগের যত্নের কি চিহ্ন প্রকাশ হইয়াছে? গ্রন্থ নাই, শিক্ষক নাই, এবং তাহার তত্ত্বাবধারণেরও নিয়ম নাই, অথচ তাহার কার্য্য সফল হইবেক, ইহা অপেক্ষা অলীক কথা আর কি হইতে পারে? একজন সাহেব যথার্থ কহিয়াছেন যে ইংরাজী পাঠশালা সকল গবর্ণমেণ্টের আপন সন্তান, আর বাঙ্গলা পাঠশালা সকল সপত্নী সন্তান। আত্ম সন্তানের ন্যায় সপত্নী সন্তানকে কে স্নেহ করিয়া থাকে? অতএব এ দেশে দেশ ভাষা প্রচারের জন্য গবর্ণমেণ্টের যে চেষ্টা সে কেবল নাম মাত্র, ইংরাজ রাজা যদি এদেশীয় প্রজাদিগের কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার করিতে স্বীকৃত হয়েন—আমারদিগের সর্ব্বস্বের পরিবর্ত্তে যদি কিঞ্চিৎ বিদ্যাদান করা উচিত বোধ করেন, তবে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে দেশভাষার পাঠশালা সকল সংস্থাপন করিয়া উৎকৃষ্ট নিয়মে শিক্ষাদান করুন। অনুরাগ, উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত ইহাতে সচেষ্ট হউন। অনুরাগ শূন্য হইয়া ইহাতে লিপ্ত থাকা অপেক্ষা এককালে নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ গুরু কার্য্যের গুরু উপায় আবশ্যক; উপযুক্ত উপায় অনুষ্ঠিত হইলে অবশ্য সে কার্য্য সিদ্ধ হইবেক। ইউরোপীয় ভাষা হইতে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সকল অনুবাদ করা এবং দেশ ভাষার উপযুক্ত শিক্ষক সকল প্রস্তুত করা এবিষয়ের মূল সাধন হইয়াছে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রজ্বলিত উৎসাহের সহিত এই উভয়

* বাঙ্গালা পাঠশালা অপেক্ষা ইংরাজী পাঠশালার নিমিত্তে তাঁহারদিগের কিঞ্চিৎ যত্ন দৃষ্ট হইতেছে, বাস্তবিক প্রজাদিগের বিদ্যানুশীলনের জন্য রাজার যদ্রূপ চেষ্টা কর্ত্তব্য, তাঁহারা তাহার সহস্র অংশের এক অংশও করিতেছে না।

অঙ্গ সুসম্পন্ন করুন, এবং সম্যক যত্নপূর্ব্বক পাঠশালা সমূহ স্থাপন করিয়া তাহার কর্ম্ম সুসম্পাদন জন্য সুনিপুণ অধ্যক্ষ সকল নিযুক্ত করুন, তখন তাঁহারা দিন দিন কৃতকার্য্য হইবেন, দিন দিন প্রজাদিগের উন্নতি দৃষ্ট হইবেক, এবং দেশ ভাষা অনুষ্ঠানের প্রতি যত বাক্য বিবাদ আছে, তখন তাহা কার্য্য দ্বারা খণ্ডন হইয়া চতুর্দ্দিকে জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ হইবেক।

দ্বাদশ বার্ষিক স্মৃতিসভা

১ জুন ১৮৫৭ মেডিকেল কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় ডেভিড হেয়ারের গুণ বর্ণনা করে একটি বাংলা প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ডেবিড্ হেয়ার সাহেবের গুণবর্ণন।

(মৃত ডেবিড্ হেয়ার সাহেবের মৃত্যু-দিবসীয়-বার্ষিক-সভা-সমীপে পঠিত হয়।)

অদ্য মৃত মহাত্মা হেয়ার সাহেবের স্মরণীয় দিবস উপস্থিত। সংবৎসরান্তে পুনরায় অদ্য আমরা এস্থলে একত্র উপবিষ্ট হইয়া সেই মহানুভাব পুরুষের গুণকীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অদ্য তাঁহার গুণ স্মরণ করিয়া ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-রসে মনঃ আর্দ্র হইতেছে। কি রূপে কি প্রকারে তাঁহার গুণানুবাদ করিব স্থির করিতে পারি না। তাঁহার গুণ সকল অসাধারণ ও আশ্চর্য্য। এমৎ দয়াশীল মানব—এমৎ পরহিতৈষী বান্ধব—এই বঙ্গদেশে কখনই দেখিতে পাই নাই। বিদেশীয় হইয়া ভিন্ন-জাতির কল্যাণার্থে এতাদৃশ কঠোরতর পরিশ্রম-কর্ত্তা অতি-দুষ্প্রাপ্য; তিনি আমাদিগের মঙ্গল সম্পাদনার্থ ও মানসিক-উন্নতি-সাধনার্থ যে কত পরিশ্রম—কত ব্যয়—করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ণন করা যায় না; সে সমস্ত আলোচনা করিলে আমাদিগের অন্তঃকরণে তাঁহার প্রতি প্রীতি ও ভক্তির উদয় হয়। আমরা তজ্জন্য যে তাঁহার নিকটে এক গুরুতর ঋণ-পাশে বদ্ধ আছি, সম্পূর্ণরূপে কি তাহা হইতে কখন পরিমুক্ত হইতে পারিব? কখনই নহে। আমরা এস্থলে আমাদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার চিহ্ন প্রকাশ করিতেছি মাত্র।

এ দেশের অবস্থা স্মরণ করিলে সর্ব্বাগ্রে হেয়ার সাহেবই স্মৃতিপথারূঢ় হয়েন; তাঁহার মনোহর মূর্ত্তি আমাদিগের মানসপটে জাজ্জ্বল্যমানরূপে প্রকটিত হয়। কি বিদ্যা-বিষয়ে, কি জ্ঞান-বিষয়ে, কি ধর্ম্ম-বিষয়ে, যে কোন প্রকারে এতদ্দেশীয় লোকের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকুক, হেয়ার সাহেবই তাহার অদ্বিতীয় কারণ। তিনিই আপনার যত্ন ও পরিশ্রমদ্বারা তাহা নিষ্পন্ন করিয়াছেন। যখন দেখি এতদ্দেশীয় কোন ব্যক্তি কোন কোন সভা-বিশেষে উপস্থিত হইয়া

সুযুক্তিযুক্ত বচনাবলিদ্বারা এদেশের মঙ্গল-সম্পাদনার্থে বক্তৃতা করিতেছেন, তখন হেয়ার সাহেবকেই সেই মঙ্গলোদ্দেশ্যের প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। যখন দেখি দেশীয় ভ্রাতৃগণ একত্র হইয়া স্ত্রীলোকদিগের মূর্খতা-নিরাকরণ জন্য কল্পনা করিতেছেন, বা চিরবিরহিণী বিধবাদিগের সুদারুণ বৈধব্য-যন্ত্রণা-দুষ্টে কাতর হইয়া তাহা মুক্ত করিবার উপায় চেষ্টা করিতেছেন, তখন হেয়ার সাহেবকেই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ যখন দেখি হিন্দু যুবকেরা জননী-জন্মভূমির রোগ-প্রতিকারের নিমিত্ত মনঃ-সমর্পণ করিয়াছেন, তখন হেয়ার সাহেবকেই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। যখন দেখি এতদ্দেশস্থ কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি চিকিৎসা-বিদ্যা-বিশারদ হইয়া বহু প্রাণীর প্রাণরক্ষণ করিতেছেন, তখন হেয়ার সাহেবকেই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক দেশস্থ ভ্রাতৃগণকে যখন যে স্থলে যে কিছু বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতে দেখি হেয়ার সাহেবকেই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়, সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন অবস্থা ক্ষণমাত্র স্মরণ করিয়া দেখিলে কি এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন প্রতীত হয়! কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের মূল-কারণ হেয়ার সাহেবকেই কহিতে হইবেক। এই বঙ্গদেশ এককালীন নিবিড়-অজ্ঞানান্ধ-কূপে নিক্ষিপ্ত ছিল। চিরমূর্খতা এদেশে আধিপত্য করিত, বঙ্গ-সন্তানেরা কুসংস্কার-পাশে বদ্ধ থাকিয়া নিতান্ত অমানববৎ ব্যবহার করিতেন। করুণাকর হেয়ার সাহেব আমাদিগের তাদৃশ হীনাবস্থা দেখিয়া অতিশয় দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া তাহা দূর-করিবার নিমিত্ত তৎপর হইয়াছিলেন। বিশেষ পরিশ্রম-পূর্ব্বক তিনি এই হিন্দুকালেজ সংস্থাপন করেন। মেডিকেলকালেজ যদ্দ্বারা সহস্র ২ প্রাণির প্রাণ-রক্ষা হইতেছে, তাঁহার প্রণীত বিদ্যালয়, যাহা অদ্যাপি তাঁহার নামদ্বারা আখ্যাত আছে, তাহাতে তাঁহার কত পরিশ্রম ও ব্যয় হইয়াছে! বঙ্গভাষার অনুশীলন-নিমিত্ত যে একটি পাঠশালা সংস্থাপিত হয়, তিনিই তাহারও সূত্র-পাত করেন। এই বিদ্যালয়সমূহে যে কত শত ব্যক্তি সুশিক্ষিত হইয়াছেন, এবং হইতেছেন, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না।

হেয়ার সাহেবের অসাধারণ দয়ার কথা কি কহিব? তিনি আপন বিদ্যালয়ে দরিদ্র দুঃখী এবং অন্যান্য বালকদিগকে বিনা বেতনে বিদ্যা-দান করিতেন; তাহাদিগকে পুস্তকাদি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করিতেন, এবং সময়ে২ অর্থ সাহায্য করিতেও বিরত ছিলেন না। তিনি বঙ্গদেশস্থ দুঃখি বালকগণের পিতাস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে কত শত পিতৃমাতৃহীন বালকেরা পুনরায় পিতৃহীন হইয়া অনাথ হইয়াছে। তাঁহার যত্নে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়া কত শত ব্যক্তি ধন মান যশঃ ও সৌভাগ্যাদি সঞ্চয় করিয়াছেন! এতদ্দেশীয় অনেক ব্যক্তি তাঁহার স্নেহ ও করুণা রসের আস্বাদন করিয়াছেন; এই

সভায় উপস্থিত অনেক মহাশয়েরা হেয়ার সাহেবের ছাত্র। তিনি এতদ্দেশস্থ লোকদিগের যে কি এক প্রিয়বন্ধু ছিলেন, তাহা বচনাতীত। যাহাতে আমাদিগের বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা বৃদ্ধি হয়, আমরা মনুষ্য সমাজে মান্য ও গৌরবান্বিত হই, এবং সর্ব্ব-প্রকার-সুখে সুখী হই, হেয়ার সাহেব যাবজ্জীবন তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার অর্থ সামর্থ্য আমাদিগেরই কল্যাণার্থে সমর্পিত হইয়াছিল। বোধ হয় তিনি কেবল আমাদিগেরই মঙ্গলসাধনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়। আক্ষেপের বিষয় এই যে তিনি কিছুকাল জীবিত থাকিয়া আপনার পরিশ্রমের সাফল্যানুভব করিতে পারিলেন না যে তাঁহাদ্বারা কি পর্য্যন্ত এদেশের বর্তমান সৌভাগ্যাভিবৃদ্ধি স্বচক্ষুদ্বারা দর্শন করিতে পারিলেন না। হা বন্ধো হেয়ার সাহেব। তুমি এক্ষণে জীবিত থাকিলে আমাদিগের সুখ সৌভাগ্য যে কতগুণে বৃদ্ধি হইত, তাহা বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। হা মাতঃ বঙ্গভূমি! যাহারা তোমার মুমূর্ষু'বস্থার-প্রতিকারের নিমিত্তে যত্নযুক্ত হয়, তুমি কি তাহাদের ভারবহনে অসমর্থা? হায়! এক্ষণে রামমোহন রায়, যাঁহাকে প্রসব করিয়া তুমি জগৎ-মধ্যে ধন্যা হইয়াছিলে, সে মহাত্মা এখন কোথায়? বিদেশীয় সাধুলোকেরা যাঁহারা তোমার পোষ্য-সন্তানের ন্যায় হইয়া তোমাকে মাতৃবৎ জ্ঞানে তোমার সেবা শুশ্রূষা করিতে অতীব তৎপর ছিলেন, তাঁহারাই বা এখন কোথায়? কি আশ্চর্য্য যাঁহারা তোমার কল্যাণ-পথ চিন্তা করেন, তাঁহারাই কি অগ্রে তোমার অঙ্কহইতে অপহৃত হইয়া কৃতান্ত মন্দিরের অঙ্কবৃদ্ধি করিতে গমন করেন! হায়! তাঁহারা সকলেই বিলুপ্ত, সকলেই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তোমার আত্ম সন্তান বা পোষ্য সন্তানের মধ্যে তোমার প্রতি যথার্থ প্রেমিক ব্যক্তি না দেখিতে পাইয়া আমার চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে। কবে ভয়ঙ্কর জাত্যভিমান, বিষময় কৌলীন্যপ্রথা, কুৎসিত সামাজিক রীতিনীতি, যাহা তোমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে, কবে কি প্রকারে কাহার চেষ্টাদ্বারা তুমি তাহাদের হস্তহইতে পরিত্রাণ পাইবে, কবে বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা স্বাধীনতা জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোক চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া তোমার অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইবে, তোমার মুখশ্রী উজ্জ্বল হইবে, কবে তোমার পূর্ব্ব-গৌরব পুনঃ স্থাপিত হইয়া তুমি ধরাতলে পুনরায় মান্যা ও গণ্যা হইবে?

যিনি আমাদিগের এমৎ প্রিয় মহোপকারী বন্ধু ছিলেন, আমাদিগের কল্যাণ-সাধন যাঁহার জীবনের এক মাত্র ব্রত ছিল ও যে ব্রত উদ্যাপনের-নিমিত্তে তিনি যত্ন, ধন ও শারীরিক ক্লেশ, বিন্দুমাত্র বক্রী রাখেন নাই। অদ্য তাঁহার বিরহে চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতেছি, মনঃ আকুল শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া কোনরূপেই

যে সকল-প্রবন্ধ-পরিশেষে লেখকের স্বাক্ষর বা চিহ্ন থাকে, এতৎপত্রের সম্পাদক তদুক্ত অভিপ্রায়ের দায়ী নহেন। বি. স. স.

আর শান্ত্বনা প্রাপ্ত হইতেছে না। তাঁহার অভাবে আমাদিগের সুখলালসা চরিতার্থ হইতেছে না। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদিগের সুখনদীর গতি খর্ব্ব হইয়াছে। যদিও আমরা অর্থব্যয় ও শারীরিক ও মানসিক আয়াসদ্বারা আমাদিগের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য বিবিধ উপায় ও চেষ্টা করিতেছি, তথাচ তাহা সুসিদ্ধ হইতেছে না; যেহেতুক আমাদিগের চেষ্টার প্রতিপোষক হয়, এমৎ বন্ধু অতিবিরল। স্বার্থশূন্য হইয়া পরজাতির মঙ্গল অন্বেষণ করেন, এতাদৃশ মনুষ্য এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। যাঁহারা আমাদিগের বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ সে প্রকার নহে; সুতরাং তাঁহাদের যদ্রূপ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করা উচিত, তাহা না করাতেই আমাদিগের মনোরথ কিছুই পূর্ণ হইতেছে না। উপস্থিত চার্টর-পরিবর্তনের সময়ে হেয়ার সাহেবের বি হ আমাদিগের সন্তপ্ত হৃদয়ে পুনরুদ্দীপন হইয়াছে। তিনি যদি এমৎ সময়ে বর্ত্তমান থাকিতেন, তবে কি আমাদিগকে আর কিছু আক্ষেপ করিতে হইত? তবে কি আমাদিগের কিছু অকল্যাণ থাকিত? তিনি আমাদিগের দেশীয়-ভ্রাতৃগণের সহযোগী হইয়া যাহাতে আমাদিগের সমস্ত দুঃখ দূর হয়. এবং যাহাতে আমরা সম্পদের পদে সংস্থাপিত হই, তাহা অবশ্যই করিতেন। তাঁহার উদার স্বভাব ইহা না করিয়া কখন নিবৃত্ত হইত না, কিন্তু হতভাগ্য ভারতবর্ষের বুঝি এরূপ মঙ্গল কখন উপস্থিত হইবে না। আমরা বুঝি চিরকাল আক্ষেপ করিয়া জীবন হরণ করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

যিনি এতদ্দেশস্থ লোকদিগের বিদ্যা বৃদ্ধি ও সভ্যতা বৃদ্ধির নিমিত্ত এত পরিশ্রম ও ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, অত্রত্য স্ত্রীলোকবর্গও বিদ্যাবতী হয় ইহা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, সন্দেহ নাই। তবে যে তিনি তাহার বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, তাহার অনেক কারণ ছিল। প্রকাশ্যরূপে অবলাদিগকে বিদ্যা-শিক্ষা দেওয়া হয়, ভারতবর্ষের তাদৃশ সময় তখন হয় নাই। এক্ষণে তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহার মহদভীষ্ট অবশ্যই সিদ্ধ করিতেন। আমরা যে এক্ষণে নানাপ্রকার সাংসারিক রীতি নীতি এবং কুপ্রথা সকল পরিবর্ত্তন-করিবার চেষ্টা করিতেছি, এবং ক্রমশঃ সভ্যতার সোপানে আরূঢ় হইবার উপায় দেখিতেছি. হেয়ার সাহেব এতদ্দৃষ্টে অতিশয় আহ্লাদিত হইতেন, এবং যাহাতে আমরা কৃতকার্য্য হই, তাহার বিলক্ষণ সহযোগিতা করিতেন। তিনি জীবিত থাকিলে বঙ্গভাষার অনেক উন্নতি হইত, এবং বিদ্যা-প্রচারের সুন্দর প্রণালী সংস্থাপিত হইত।—বলিতে কি আমরা সর্বপ্রকারে সুখী হইতাম।

আর কি বলিব, কতই বা আক্ষেপ করিব, কতই তাঁহার গুণ মরিব। যতই তাঁহার গুণ স্মরণ করি, ততই বিচ্ছেদানল পুনরুদ্দীপ্ত হয়। মনের কি মহীয়সী শক্তি বলিতে ২ বোধ হইল, যেন হেয়ার সাহেব এই সভা-গৃহে প্রবেশ করিলেন,

এবং প্রবিষ্ট হইয়া যেন তিনি আমাদিগকে সস্নেহ-বচনে জ্ঞানোপদেশ-প্রদান করিতে লাগিলেন।

কলিকাতা শ্রী শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়।

১লা জুন, ১৮৫৪ শাল

স্মারক প্রবন্ধ

[সংবাদ]

গত দিবস রাত্রি আট ঘটিকা সময়ে হিন্দু কালেজের প্রধান প্রকোষ্ঠে এতদ্দেশের পরম হিতৈষি বন্ধু মৃত ডেভিড হেয়ার সাহেবের স্মরণ সূচক সাম্বৎসরিক সভা হইয়াছিল, সেই সভাতে মৃত মহাত্মার সদ্গুণান্বিত কৃতবিদ্য কৃতজ্ঞ বান্ধবেরা সমাগত হইয়া তাঁহার প্রণয়, স্নেহ, দয়া, সদ্ভাব, সৌজন্য প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণাবলী স্মরণ করত সরলচিত্তে জগদীশ্বর সমীপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। ভিন্ন দেশীয় লোকের মধ্যে মেং হেয়ার সাহেবের তুল্য অস্মদ্দেশের সর্ব্বতোভাবে কুশলকারি ব্যক্তি এইক্ষণে আর কাহাকেই প্রায় দেখিতে পাই না, অতএব তাঁহার বিষয়ে এতদ্রূপ সুকর্ম্ম করাতে যুবকদিগের মহন্মনের এক বিশেষ চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে, একারণ ইহা তাবল্লোকের পক্ষেই সন্তোষকর হইবেক। সভাধ্যক্ষেরা গত বারের ন্যায় এবারেও ছাত্রদিগের রচনা বিষয়ের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ একটি পারিতোষিক নির্দ্দিষ্ট করিয়া ছিলেন, এবং কয়েক মাস হইল তদ্বিষয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন, যথা 'হিন্দু স্ত্রীদিগের বিদ্যা শিক্ষার কর্ত্তব্যতা বিষয়ে যে ছাত্র উত্তমরূপে আপনাভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেক তাহাকে ৭৫ টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক," 'সংস্কৃত এবং হিন্দু কালেজ প্রভৃতি বিদ্যালয়ের পাঁচ জন ছাত্র তাহা রচনা করিয়া প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে তারাকান্ত ভট্টাচার্য্য নামক সংস্কৃত পাঠশালার একজন সুশিক্ষিত ছাত্রের বিরচিত বিষয় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়াতে পরীক্ষক মহাশয়েরা তাহাই গ্রাহ্য করিয়া সভ্য দিগের গোচরার্থে সভায় অর্পণ করেন, সভাতে সেই লেখা পাঠ হইলে সকলে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, এই লেখক পুরস্কৃত হওনের সুযোগ্য হইয়াছেন, অতএব ইঁহাকেই প্রস্তাবানুসারে ৭৫ টাকা প্রদান করা যাউক, বোধ করি আমরা স্বাবকাশক্রমে উক্ত সভার আর ২ বিবরণ লিখিতে পারিব।

—সংবাদ প্রভাকর ২ জুন ১৮৪৯ সাল।

[সম্পাদকীয়]

আমাদিগের পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন যে শ্রীযুত তারাশঙ্কর শর্ম্মা পণ্ডিত মহাশয় ডেবিড হিয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সভার দত্ত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব রচনা করিয়া গত বৎসর শত মুদ্রা পারিতোষিক পাইয়াছেন এবং উক্ত সভা

হইতে তাঁহার সেই রচনা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তকের এক খণ্ড এ পর্য্যন্ত অস্মদাদির হস্তগত না হওয়াতে আমরা তদ্বিষয়ে আপনারদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারি নাই সংপ্রতি জনৈক বন্ধুর দ্বারা…হার একখানি পাওয়াতে পাঠ করিয়া দেখিলাম পণ্ডিত মহাশয় এতদ্দেশীয় অবলা দিগের সকল প্রকার অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাহাদের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে শাস্ত্র ও প্রাচীন ব্যবহার প্রমাণ দর্শাইয়া শিক্ষা দেওয়া অত্যাবশ্যক ইহা সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় শাস্ত্র ব্যবসায়ী হইয়াও স্ত্রীলোকের প্রতি শাস্ত্রের কঠিন নিয়ম দর্শনে যে খেদ প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে আমারদিগের কিঞ্চিৎ চমৎকার বোধ হইতেছে এতদ্দেশীয় শাস্ত্রে যাহা বৈধ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন তাহাকে শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিত মহাশয় কি প্রকারে অযুক্তিক কহিলেন? তিনি আপনার প্রবন্ধের প্রথম প্রকরণে লিখিয়াছেন "হায় শাস্ত্রের কি কঠিন শাসন সতীর লক্ষণ সহমরণ যাহা স্মরণ করিলে চিত্ত সভয় ও কায় লোমাঞ্চিত হয়" আমরা পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি ঐ কঠিন নিয়ম কি তিনি শাস্ত্রীয় বলিয়া গণ্য করেন না, যদি শাস্ত্রের ঐ নিয়ম গ্রাহ্য হয় তবে অন্যান্য সকল শাস্ত্রই অগ্রাহ্য করিতে হইবেক তাহা হইলে শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত মহাশয় কি লইয়া স্বীয় ব্যবসা রক্ষা করিবেন, আমাদিগের এরূপ লিখনে পাঠকবর্গ এমত মনে করিতে পারেন যে আমরা মাৎসর্য্যান্ধ হইয়া উক্ত প্রবন্ধরচক মহাশয়ের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিতেছি কিন্তু এতৎ প্রস্তাব প্রসঙ্গে আমাদের তাদৃশ তাৎপর্য্য কখনই নয় তবে প্রবন্ধরচক মহাশয়ের প্রতি ঐ রূপ জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্য এই যে তিনি শাস্ত্রের যে সকল অযুক্ত বিধি বা নিয়ম দর্শাইয়া দেশীয় অঙ্গনাদের দুরবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা স্বয়ং অগ্রাহ্য করেন কি না যদি তাহা করেন তবে আমরা স্বদেশীয় সর্ব্ব সাধারণ জনগণকে সাহস পূর্ব্বক পরামর্শ দিতে পারিব যে শাস্ত্রের অযুক্তিক বাক্য গ্রাহ্য নয় ইহাতে যদি স্ত্রীশিক্ষা দান সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত কন্যাদের বিবাহ কাল অতীত 'হইয়াও যায় তাহাতেও দোষানুসন্ধান না করিয়া শিক্ষার সম্পূর্ণতা করাই কর্ত্তব্য। সে যাহা হউক এ বিষয়ে বৃথা বাক্য ব্যয় করা এক্ষণে উচিত নয়। এখন আমরা উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠে দেশীয় অবলা-বর্গের শিক্ষা দান শাস্ত্র ও যুক্তি ও প্রাচীন ব্যবহার সিদ্ধ বলিয়া যে প্রমাণ পাইলাম তাহাতেই পরম পারিতোষান্বিত হইতেছি। আমাদের দেশের লোকেরা স্ত্রীদিগের শিক্ষা দান প্রসঙ্গে ঐ তিন কারণই দর্শাইয়া মহা আপত্তি করিয়া থাকেন অতএব ঐ তিন আপত্তির খণ্ডন যদি সাধ্যবৎ হইল তবে আর কেন জ সকলে স্ব ২ বালিকাকে বিদ্যাধ্যয়ন না করাইবেন। আমরা বোধ করি উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিলে, দেশীয় মহাশয়দের অজ্ঞানতা দূর হইয়া যাইবেক অতএব অনুরোধ করি দেশীয় সকল ব্যক্তি উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের পুস্তক পাঠ করিয়া মর্ম্মাবধারণ পুরঃসর তদুক্ত উপদেশ পালনে সত্বর হয়েন।

পরন্তু আমরা পরম্পরায় অবগত হইয়া দুঃখিত হইলাম যে ঐ পুস্তক অতি স্বল্প সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে অর্থাৎ একশত মাত্র পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এ দেশের যাবতীয় লোককে ঐ পুস্তক পাঠনা দ্বারা স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে সংস্কার হইতে মুক্ত করিতে হইবেক ইহাতে একশত সংখ্যক পুস্তকে কি হইতে পারিবেক অতএব আমরা অনুরোধ করি হিয়ার সাহেবের স্মরণার্থক সভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা তাহা পুনশ্চ বহুল সংখ্যায় মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বত্র প্রেরণ করুন এতদ্বিষয়ে আমাদের যথাসাধ্য এই করিতে পারি এবং করিব অর্থাৎ ঐ পুস্তক ক্রমশ কিঞ্চিৎ ২ করিয়া স্বীয় পত্র মধ্যে উদ্ধৃত করত পাঠক বর্গের গোচর করিব।

—সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ২৩ কার্তিক ১২৫৭ (১৭ নভেম্বর ১৮৫০)

A

PRIZE ESSAY

On Hindu Female Education

শ্রীতারাশঙ্কর শর্ম্ম বিরচিত

ভারত বর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষা।

ENCYCLOPÆDIA PRESS

1851

THE ZENANA OPENED

OR

A BRAHMIN

Advocating Female Emancipation

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

CALCUTTA

1851

Encyclopædia Press. 148, Cornnallis Street

2nd Edition.

7000, copies.

ভারত বর্ষীয়

স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষা।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের এক্ষণে বিদ্যানুশীলন না থাকাতে কেহ কেহ কহেন, স্ত্রীজনের বিদ্যানুশীলন শাস্ত্র সম্মত নহে। কেহ কহেন পূর্ব্বকালেও এ প্রথা ছিল না অতএব স্ত্রীগণের বিদ্যানুশীলন লোকাচার বিরুদ্ধ। কেহ বা কহেন,

স্ত্রীলোক বিদ্যাভ্যাস করিলে বিধবা হয় সুতরাং তাহাদিগের বিদ্যানুশীলনে স্পষ্ট দোষ দৃষ্ট হইতেছে। ইহাও অনেকে কহিয়া থাকেন স্ত্রী লোকের এতাদৃশ বুদ্ধি নাই যাহাতে তাহারা বিদ্যোপার্জ্জন করিতে শক্ত হয়। এদেশের লোকেদের এই সকল ভ্রম নিরাকরণ নিমিত্ত প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক যথা সাধ্য কিঞ্চিৎ লিখিতে অভিলাষ করি।

আমি এই বিষয়ে সকলের সুখাববোধার্থ ও বিস্তৃতি করণার্থ চারি খণ্ডে বিভাগ করিয়া লিখিলাম। স্ত্রীলোকের প্রতি শাস্ত্রের যে রূপ কঠিন শাসন ও তাহাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থা বিশেষতঃ বিদ্যা ব্যতিরেকে যে রূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে তাহার বিবরণ প্রথম খণ্ডে বিস্তৃত করিলাম। পূর্ব্বতন যোষিদ্‌গণ বিদ্যাভ্যাস করিত তাহার প্রমাণ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদর্শন করা গেল। তৃতীয় খণ্ডে স্ত্রীগণ বিদ্বান হইলে এদেশে কি উপকার সম্ভাবনা তাহা বিস্তারিত করিয়া লিখিলাম। বনিতাগণের বিদ্যানুশীলনের উপায় সকল চতুর্থ খণ্ডে বিস্তৃত হইল।

প্রথম খণ্ড

স্ত্রীলোকের প্রতি শাস্ত্রের নিয়ম ও তাহাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থা বিশেষতঃ বিদ্যা ব্যতিরেকে যে রূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে তাহার বিবরণ।

এদেশের স্ত্রী সকল দাসীর মত অন্তঃপুর বাসী হইয়া অহর্নিশি গৃহ কর্ম্ম রাশি নির্বাহ করে। তাহাদিগের জন্মাবধি যাবজ্জীবনের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করি যদ্দ্বারা তাহারা অত্যন্ত দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছে ইহা প্রকাশিত হইতে পারিবে।

গর্ভবতীকে একটি পুত্র সন্তান হউক বলিয়া সকলেই আশীর্ব্বাদ করেন কিন্তু একবার ভ্রম ক্রমেও কন্যা হউক এমত কেহ কহেন না। যদি প্রসূতি শুভাদৃষ্টে পুত্র সন্তান প্রসব করেন তবে সকলের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র হয়েন ও আহ্লাদ সূচক নানা বাদ্যোদ্যম ও দান এবং পুত্রের কল্যাণার্থ নানা স্বস্ত্যয়ন হইয়া থাকে কিন্তু কি আশ্চর্য্য কন্যা সন্তান হইলে সকলে শোকাকুল প্রায় বিষণ্নমনা হয়েন। ইহাতেই বিলক্ষণ অবগতি হইতেছে এদেশের লোকেরা কন্যা সন্তানকে ঘৃণিত ও অপকৃষ্ট বোধ করিয়া থাকেন।

পুত্রের বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর হইলে তাহাকে যত্ন পূর্ব্বক পিতা মাতা বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত করেন কিন্তু দুর্ভাগা বালিকারা কেহ বা গৃহ কর্ম্মে মনোভিনি-বেশ কেহ বা ক্রীড়াতে কাল যাপন করে। কি কহিব ইহারা গৃহ কর্ম্মেও কাহার উপদেশ প্রাপ্ত হয় না কেবল অন্যের তদ্বিষয়ক পারিপাট্য দেখিয়া বিনা উপদেশে স্বয়ং শিক্ষা করিতে বাধিত হয়।

শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন পুরুষের বিবাহ কাল ত্রিংশ বৎসর অথবা চতুর্বিংশ

বৎসর এবং কন্যার বিবাহ কাল দ্বাদশ বৎসর বা অষ্টম বৎসর (১) এক্ষণে পুরুষের পাণি গ্রহণ কালের স্থিরতা নাই কিন্তু কন্যার বিবাহে শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন হয় না অতএব লোকাচারের সুনিয়মতার পরিচয় ইহাতেই সকলে অবগত হইতে পারিবেন। অজ্ঞান দশায় বিবাহ হইলে বালিকারা আত্ম সমর্পণ কালে কোন আপত্তি করিতে পারে না সুতরাং পিতা মাতার সম্মতিতেই সম্মত হইতে হয়।

বিবাহের পর স্ত্রীগণ শ্বশুরালয়ে অন্তঃপুর নিরুদ্ধ থাকে পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের মুখ অবলোকন করিতে পায় না তাহাদিগের জীবনের প্রধান কর্ম্ম কেবল পতি ভক্তি ও পতি শুশ্রূষা, যাহা চিরকাল মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক করিতে পারিলে সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় এবং চরমে পরম ফল স্বর্গ ও অপবর্গ লাভ করে।

হায় শাস্ত্রের কি কঠিন শাসন সতীর লক্ষণ সহমরণ যাহা স্মরণ করিলে চিত্ত সন্তপ্ত ও কায় রোমাঞ্চিত হয়। শাস্ত্রে লিখিয়াছেন ভর্ত্তা মরিলে সতী নারীদিগের অনলে অঙ্গ প্রদান ব্যতিরেকে আর ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই (২) যদি স্বামী বিদেশে আয়ুঃশেষ হইয়া সেইখানে প্রাণ পরিত্যাগ করেন তবে তাঁহার পাদুকাদ্বয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া পতিব্রতাগণ জ্বলনে জীবন সমর্পণ করিবে ( ) লোকে সতী ও পতিব্রতা বলিবে এই সুখ্যাতির প্রত্যাশায় কত ব্যভিচারিণীও জ্বলন্ত দহনে জীবন সমর্পণ করিত।

এ সময় মহাত্মা বেণ্টিক সাহেব ও রাজা রামমোহন রায়ের গুণ স্মরণ করিলে স্তব্ধ হইতে হয় এবং তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতে অগণ্য রসনা ভজন করিতে হয়। এক জন সহমরণ নিবারণ করিয়াছিলেন আর এক জন সহমরণ নিবারণের পথ প্রদর্শক হইয়াছিলেন যাহাতে এক্ষণে সহস্র সহস্র মহা প্রাণির প্রাণ রক্ষা হইতেছে এবং প্রার্থনা করি এই সকল মহা প্রাণির জীবন রক্ষা জন্য পুণ্য তাঁহাদিগের হউক। হায় কি নিষ্ঠুরের কর্ম্ম। ভারত বর্ষীয় লোকেরা কি কুকর্ম্ম না করিতে পারে? তাহারা কি রূপে নির্দ্দোষ যোষাদিগের দেহ দহন সাৎ করিত তাহা এক্ষণে মনে করিলেও আমাদিগের অন্তঃকরণ ব্যাকুল হয়।

---

(১) ত্রিংশদ্বর্ষোবহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং। ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ। মনুঃ।

(২) সাধ্বীনামেব নারীণামগ্নিপ্রপতনাদৃতে। নান্যোহি ধর্ম্মো বিজ্ঞেয়ো মৃতে ভর্ত্তরি কর্হিচিৎ। অঙ্গিরাঃ।

(৩) দেশান্তরমৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ং।
নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাতবেদসং। ব্রহ্মপুরাণং।

এদেশের বিধবাদিগের শাস্ত্র বিহিত ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ অপেক্ষা মরণই শরণ। যাবজ্জীবন দুঃসহ দুঃখ সম্ভোগ করা অপেক্ষা এক বার ক্লেশ সহ্য করা শ্রেষ্ঠ। বিধবাদিগের একেতঃ বৈধব্য যাতনা দ্বিতীয়তঃ বিদ্যারসাস্বাদে বঞ্চনা তৃতীয়তঃ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারণা, মানব দেহে ইহা অপেক্ষা আর ক্লেশ কি ঘটিতে পারে! আমারদিগের একটি উপবাস করিলে কত ক্লেশ হয় কিন্তু বিধবাদিগের শরীরে কেবল বিবিধ উপবাসের আবাস (১) স্বেচ্ছাধীন আহার এক দিনও ঘটে না তাহারা এক বেলা কিঞ্চিৎ নীরস নিকৃষ্ট দ্রব্য আহার করিয়া কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ মাত্র করে।

কি দুঃখ। স্ত্রীগণের বর্ত্তমান দূরবস্থা দেখিলে কে না শোকাকুল হয়। বঙ্গদেশীয় নবীন অবধি প্রবীণ পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই কহিয়া থাকেন কামিনীদিগের দিন যামিনী রন্ধনশালার যন্ত্রণা সহ্য করাই প্রধান কর্ম্ম। যাহারা আলস্য শূন্য হইয়া এই কর্ম্ম উত্তম রূপে সমাধা করিতে সমর্থ হয় তাহারাই সুখ্যাতি ও প্রশংসা লাভ করে যে অভাগা ইহাতে অশক্তা তাহাকে স্ত্রীজাতি মধ্যে গণনাই করে না। তাহারা দাসদাসীর মত অনবরত গৃহ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এমত সময় নাই যাহাতে আমোদ ও আহ্লাদে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে পারে। ইহাতেও যদি কোন দিন কর্ত্তাদিগের আহারীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হওনে কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব হয় অথবা ভ্রম ক্রমে কোন ত্রুটি হয় তবে আর তাঁহারা রোষ ও অসন্তোষ প্রকাশ করিতে ক্ষণকাল বিলম্ব করেন না। এমত অনেক অবলোকন করা গিয়াছে যাহাতে অবলারা নির্দ্দোষে অথবা অল্প দোষে নির্দয় পুরুষদিগের রোষ ভাজন হয়।

আহা একেতঃ অবলারা বাল্যাবস্থায় কোন বিদ্যার উপদেশ প্রাপ্ত হয় না যাহাতে পরিণামে অশেষ ক্লেশের হ্রাস হইতে পারে, দ্বিতীয়তঃ শৈশবাবস্থা গত না হইতেই পিতা মাতা কন্যার বিবাহোদ্যোগ করেন। অনুমান কর যাহার সহিত চিরকাল এক শরীরের মত একত্রে বাস করিতে হয় ও যাহার দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইতে হয়, (শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন স্বামী ভার্য্যার অর্দ্ধাঙ্গ ও ভার্য্যা স্বামির অর্দ্ধাঙ্গী) সেই স্বামি শব্দের অর্থ না জানিতেই যখন বিবাহ সম্পন্ন হয় তখন আর এতদ্বিষয়ে পিতামাতার অবিবিচ্যকারিতা শাস্ত্রকারদিগের নির্দ্দয়তা ও লোকাচারের জঘন্যতার পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র।

এতদ্দেশে ব্যবহার আছে যে বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার পিতা অথবা বন্ধুবর্গ পাত্র পরীক্ষা জন্য স্বয়ং গমন করিয়া থাকেন পরীক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ঐশ্বর্য্য। পাত্র রূপবান্ বুদ্ধিবান্ কিম্বা বিদ্যাবান্ অথবা বিশুদ্ধ আভিজাত্যবান্ হউন্ ধনবান্ না হইলে তিনি

(১) উপবাসাংশ্চ বিবিধান্ কুর্য্যাৎ শাস্ত্রোদিতান্ শুভে। ব্যাসঃ।

কদাচ মনোনীত হয়েন্ না। পাত্র পরীক্ষকের রুচি অনুসারে কখন কখন ঐশ্বর্য্যের অগ্রেও কুলমর্য্যাদা গণনীয়া হইয়া থাকে। বল্লালসেনীয় কুল মর্য্যাদাপন্ন কুলীনের মধ্যে যাঁহারা বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান অথবা রামেশ্বর চক্রবর্ত্তির সন্তান তাঁহারা কুলভঙ্গ আশঙ্কায় জরাজীর্ণেন্দ্রিয় অশীতিবর্ষ বয়স্ক পাত্রের সহিত পঞ্চম বর্ষীয় বালিকারও বিবাহ দেন এবং কুলগন্ধে অন্ধ হইয়া অতি দুর্ব্বৃত্তকেও সুশীলা কন্যা সম্প্রদান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন্ কেহবা স্বীয় কুলোচিত পাত্রের অভাবে পঞ্চাশদ্বর্ষীয় কন্যাও অবিবাহিত রাখেন্।

যাঁহারা দীন ও ধনহীন অথচ কুলীন বহুতর অর্থব্যয়ে অসমর্থ তাঁহারা একেবারে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য এক পাত্রকে পাঁচ ছয় কন্যা সম্প্রদান করেন। যদি সে জামাতা তাঁহার সকল নিশ্চিন্ততার সহিত সংসার লীলা সম্বরণ করে তবে তাঁহার সকল দুহিতা এক কালে বিধবা হইয়া তাঁহার উৎকণ্ঠা ও চিন্তা অহর্নিশি প্রজ্বলিতা করে।

স্বকৃত ভঙ্গ অথবা স্বকৃত ভঙ্গের পুত্রের পরিণয়ই জীবনের প্রধান উপজীবিকা। তাঁহারা একশত নারীর ভর্ত্তা ও ধর্ম্মরক্ষিতা হন, ধর্ম্মরক্ষা কি করিবেন্ অধর্ম্মের পতাকা অগ্রগামিনী হইয়া থাকে। পিতা নির্দ্দয় ও নির্বিবেক হইয়া এই শত স্ত্রীর পতির হস্তে কন্যা সমর্পণ করেন ও গর্ব্ব করিয়া কহেন্ স্বকৃত ভঙ্গের পুত্রের সহিত দুহিতার বিবাহ দিলাম। কুলীন কন্যাদিগের দুঃখের কথা কি কহিব স্বামী জীবিত থাকিতেও তাহারা বিধবা প্রায় হইয়া থাকে। কোন কোন স্ত্রীর স্বামী বৎসরে একবার আইসেন কোন বা স্বামী বিবাহের পর সে পথ একেবারে বিস্মৃত হন্ আর সে দিকে ভ্রম ক্রমেও পদার্পণ করেন না। এই কুলীনাভিমানি স্বামিগণের গুণের কথা কি বলিব তাঁহাদের বৎসরান্তে যদি একবার আগমন হয় এবং আসিবা মাত্র যদি দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণা পান তবে চিরদুঃখিনী কামিনীর সহিত আলাপ করেন সুতরাং তাহাদিগের ধর্ম্ম কি রূপে থাকে।

যাঁহারা ইহার মধ্যে ভদ্র তাঁহারা সকল সংসার লইয়া গৃহ কর্ম্ম করিবার বাঞ্ছা করেন কিন্তু তাঁহাদিগের দুঃখের শেষ থাকে না। অধিক স্ত্রী লইয়া গৃহ কর্ম্ম ও সংসার ধর্ম্ম করায় যে কত সুখ তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন সর্ব্বদা পরস্পর বিবাদ ও কলহ শ্রবণ করিয়া শ্রবণ বিদীর্ণ হয় ফলতঃ অধিক সংসার লইয়া সংসারী হইলে তাহার কোন সুখ সম্ভাবনা নাই।

এক পাত্রে অনেক কন্যা দান হওয়াতে এবং কুলানুরোধে পাত্রের বার্দ্ধক্য ও চিররুগ্নতাদি দোষ না দেখিয়া বিবাহ দেওয়াতে কুলীন কন্যাদিগের মধ্যে অনেককে বিধবা দেখা যায়। এ দেশের বিধবা দিগের দুর্দ্দশা নিরীক্ষণ করিলে সচেতন ব্যক্তিমাত্রেরি অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মে। বিধবাদিগের অবস্থা

ভেদে দুঃখের তারতম্য নাই। প্রৌঢ়াবস্থায় বিধবা হইলে তাহাকে যে রূপ নিত্ত নৈমিত্তিক উপবাস ও প্রতিদিন হবিষ্যান্ন ভোজনাদি দ্বারা শরীরে ক্লেশ সহন করিতে হয় অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা পতি হীনা হইলে তাহারও কোন অংশে ন্যূনতাতিরেক নাই। মানসিক সুখ দূরে থাকুক যথাভিলষিত ভোজন দ্বারা শারীরিক সুস্থতাও অতি কঠিন।

এতদ্দেশে যাঁহার কুল মর্য্যাদাহীন বংশজ তাঁহারদিগের কন্যা সন্তান এক প্রকার বাণিজ্য দ্রব্য। তাঁহারদিগের কন্যা হইলে আর আহ্লাদের সীমা থাকে না। বিবাহের সময়ে কন্যা বিক্রয় করিয়া অনেক অর্থ পাইব এই প্রত্যাশায় দিন যামিনী যাপন করেন্। কন্যার তিন চারি বৎসর বয়ঃক্রম না হইতেই বিবাহোদ্যোগ করেন। ইহা প্রসিদ্ধই আছে অর্থের নিকটে বিদ্যা ও গুণের গৌরব গ্রাহ্য হয় না সুতরাং প্রকাশ্য পণ্য স্থানে উচ্চ মূল্যে যেমত দ্রব্য সকল বিক্রয় হয় তাহাতে ক্রেতার গুণাগুণ বিবেচনা নাই বংশজদিগের কন্যা সম্প্রদানও সেইরূপ। অশীতিবর্ষ বয়স্ক পাত্রও যদি অধিক অর্থ দিতে শক্ত হয় তাঁহাকেই পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা সমর্পণ করা হয়। এই প্রথার প্রচার থাকাতে বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ অথচ রূপবান ব্যক্তি অর্থ হীন হইলে তাহার বিবাহ হওয়াই দুষ্কর কিন্তু জঘন্য পুরুষাধমের অর্থ থাকিলে অসংখ্য বিবাহও দুর্ঘট নহে। উক্ত রূপ কৌলীন্যাদ্যনুকারিণী ব্যবস্থা কেবল বিপ্রজাতি মধ্যেই প্রচলিতা এমত নহে এতদ্দেশীয় কায়স্থ প্রভৃতি শূদ্রজাতি মধ্যেও ব্যবহৃতা হয়।

এদেশের কতক গুলিন বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের কন্যা বিবাহের রীতি শ্রবণে বধির হওয়াই উচিত। তাঁহারা গর্ভস্থিত বালকের সহিত গর্ভস্থ বালিকার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। সমবয়স্ক পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিলে গুণ দোষ ও সুখ দুঃখ অল্প বিবেচনা করিলেই সকলের বোধ গম্য হইতে পারে সুতরাং তদ্বিষয়ে বাহুল্য বর্ণন বাহুল্য মাত্র।

বিদ্যা রূপ আলোকাভাবে বঙ্গ দেশীয় যোষিদ্‌গণের যে রূপ দুর্দশা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহা লিখিতে বিস্মৃত হয় নাই। প্রাবৃট্ কালে মেঘাচ্ছন্ন দিবসে গভীর ধ্বনি বিশিষ্ট বৃষ্টিধারা নেত্র পথ প্রবিষ্ট হইয়া যে চিত্তকে আহ্লাদিত করে বসন্ত কালে মন্দ মন্দ গন্ধবহ হিল্লোলে কম্পিত তরঙ্গাকার শ্যাম বন অরণ্যের চারুতা অবলোকন করিয়া যে আনন্দ সঞ্চার হয় শরৎ সময়ে গগনের নির্ম্মলতা ও পয়ঃ প্রবাহের স্বচ্ছতা যে নয়ন ও মনকে আকর্ষণ করে এই সকল দর্শন সুখের এক মাত্র কারণ সেমত ভাস্বান্ তদ্রূপ বিদ্যানুশীলন মানব জাতির মানসিক সুখের মূল কারণ। সুতরাং তাহার অভাবে যোষাগণের সুখেরও অভাব হইয়াছে দোষেরও শাখা প্রশাখা

বৃদ্ধি হইতেছে ঈর্ষ্যা মাৎসর্য্য দ্বেষ হিংসা ও অসূয়া নারীদিগকেই আশ্রয় করিয়াছে।

যদি আমরা পাঁচ জন বন্ধু একত্র মিলিত হইয়া বাস করি তবে মনে কর আমাদিগের স্নেহ ও সৌহার্দ্দ কি প্রকার বর্দ্ধিত হয় সর্ব্বদা সদালাপে কাল যাপন করি পরস্পর সততা ব্যবহার পূর্ব্বক দিন যামিনী সুখী হই ফলতঃ যথার্থ মিত্রের সহিত কালক্ষেপ অপেক্ষা সংসারে আর সুখ নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের ভূমণ্ডলে কেহ মিত্র নাই প্রায় কেহ কাহাকে ভাল বাসে না চিরসঙ্গিনীকেও দ্বেষ ঈর্ষ্যা করে কেবল কলহানুসন্ধানেই কাল হরণ করে আমরা কলহকারির কলহ ভঞ্জন করিতে চেষ্টা করি কিন্তু ইহারা যাহাতে বিবাদ বর্দ্ধন হয় তাহারি উপায় অন্বেষণ করে। নির্লজ্জতার কথা কি কহিব সর্ব্বদা যাহার সহিত চারি চক্ষু একত্র করিতে হয় তাহার প্রতিও কটু ও অবক্তব্য দুর্বাক্য প্রয়োগ করে যাহা শ্রবণ করিলে আমাদিগের মনের বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং মনে হয় যে স্ত্রীলোকের মুখ আর কদাচ অবলোকন করিব না। তাহারা মানসিক অলঙ্কার বিদ্যা বিহীন হইয়া শরীরের অলঙ্কার ও উত্তম পরিচ্ছদকে সংসারের সার করিয়া ভাবে এবং উহা না পাইলে জীবন সর্ব্বস্ব পতির প্রতিও অসাধারণ প্রেম প্রকাশ করে না। বিশেষতঃ যাহাদিগের সাংসারিক কর্ম্ম অধিক নাই তাহারা অবকাশ পাইলেই লোকের দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এবং ঐ কর্ম্মই যোষিদ্‌গণের জীবনের প্রধান আলম্বন। তাহারা লোকের অখ্যাতি ও কুযশঃ প্রকাশ করিতে অশেষ রূপে চেষ্টা করে উভয়ের প্রণয় দেখিলে ইহাদিগের অন্তঃকরণ ব্যাকুল হয় ও প্রণয় ভঙ্গের উপায় অনুসন্ধান করে। অনেক প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে যে পূর্ব্বে উভয় সহোদর প্রীতি পূর্ব্বক একত্র বাস করিত কিন্তু কেবল স্ত্রীলোকের কুমন্ত্রণায় প্রাণ প্রিয় সহোদরকে তৎক্ষণাৎ পৃথক করিয়া দিয়াছে।

কামিনীগণের রসনা রূপ ভুজঙ্গী যাহার অঙ্গে দংশন করে সে উন্মত্ত প্রায় হইয়া কার্য্যাকার্য্য বিবেক বিহীন হয়। কোশলদেশাধিপতি রাজা দশরথ কৈকেয়ীর মন্ত্রণা জালে পতিত হইয়া প্রাণ তুল্য পুত্র রাম লক্ষ্মণ ও পুত্রবধূ সীতাকে বনবাস দিতে আজ্ঞা করিলেন তদনন্তর পুত্র বিয়োগে শোকাকুল হইয়া স্বজীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সে জাল হইতে মুক্ত হইলেন। লঙ্কাধিপ রাবণ কেবল সূর্পণখার দোষে স্ববংশে ধ্বংশ হইয়াছিলেন।

অবশেষে এই বক্তব্য স্ত্রীগণ বিদ্যানুশীলন না করিলে এ সকল দোষ হইতে মুক্ত হইবে না।

দ্বিতীয় খণ্ড

স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষা করিবার যুক্তি ও প্রমাণ।

পূর্ব্ব খণ্ডে এতদ্দেশীয় নারীগণের বর্ত্তমান দুরবস্থা ও তাহাদিগের প্রতি শাস্ত্রের কঠিন নিয়ম যথাসাধ্য দর্শাইয়াছি এক্ষণে স্ত্রীলোকের শিক্ষা বিষয়ে যুক্তি ও প্রমাণ যথাশক্তি সংকলন করিতে ইচ্ছা করি।

স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাস করিতে সামান্যতঃ শাস্ত্রীয় নিষেধ আছে বলিয়া অস্মদ্দেশীয় লোকের যে চিরকালিক ভ্রম আছে এবং সেই ভ্রম নিবন্ধন এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতির যে দুরবস্থা ঘটনা হইয়াছে তৎসংশোধনার্থ এ পর্য্যন্ত কেহই যত্ন করেন নাই, কেবল যত্ন করেন নাই এমত নহে এতদুপলক্ষ্যে একাল পর্য্যন্ত একটি কথাও কেহ উচ্চারণ করেন নাই। এক্ষণে স্ত্রীগণের কোন অনির্ব্বচনীয় শুভগ্রহ সঞ্চার হওয়াতে এতদ্বিষয়ে যে বাগান্দোলন ও উপায়ান্বেষণ হইতেছে ইহাতেই সদন্তঃকরণ ব্যক্তির অন্তঃকরণ অপর্য্যাপ্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছে সন্দেহ নাই যেহেতু সংকর্ম্মের অনুকরণও শুভাবহ অতএব এতদ্বিষয়ে উৎসাহ বর্দ্ধক ও প্রবৃত্তি প্রবর্ত্তক মহাশয়দিগকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক যুক্তি অনুসারে প্রমাণ সংকলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

স্ত্রীলোকের শাস্ত্রাধ্যয়নে যে নিষেধ আছে সে কেবল দুর্গম্য ও আয়াস সাধ্য বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়নে এবং বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে। নতুবা নীতি কাব্য অলংকার পদার্থ ও জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতির অনুশীলন বিষয়ে নিষেধ শাস্ত্রকরদিগের অভিপ্রেত নহে। যথা।

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈঃ। মনুঃ।

স্ত্রীলোকের বৈদিক মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক কোন ক্রিয়া নাই।

সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রয়োর্নেচ্ছন্তি
সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রী শূদ্রো যদি জানীয়াৎ
সমৃতোহধোগচ্ছীত। তিথিতত্ত্ব ধৃত নৃসিংহতপনীয়বচনং।

গায়ত্রী প্রণব যজুর্মন্ত্র ও লক্ষ্মী বীজ এ সকল উচ্চারণে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার নাই স্ত্রী ও শূদ্র এ সকল জানিলে মরণান্তর নরকগামি হয়।

স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে বিধান।

স্নানং দানং তপোবিদ্যা সর্ব্বমঙ্গল্যবর্দ্ধনং।
উদ্বাহশ্চ কুমারীনাং জন্মমাসে প্রশস্যতে।
শ্রীপতিব্যবহার সমুচ্চয়বচনং।

স্নান দান তপস্যা বিদ্যারম্ভ ও সকল মাঙ্গলিক কর্ম্ম এবং বিবাহ কুমারীদিগের জন্ম মাসেই প্রশস্ত।

কন্যাপ্যেবং পালনীয় শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্ন সমন্বিতা। মহানির্বাণতন্ত্রং।

কন্যাকেও এইরূপ পালন করিবে ও অতিযত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান করিবে তদনন্তর ধর্ন ও রত্ন দিয়া বিদ্বান পাত্রের সহিত বিবাহ দিবে।

এই সকল বচনের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে গ্রন্থকারদিগের অভিপ্রায় এই স্পষ্ট বোধ হয় যে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ ও বেদ অধ্যয়নে স্ত্রীদিগের অধিকার নাই অন্য অন্য শাস্ত্র অধ্যয়নে শাস্ত্রকারদিগের নিষেধ দূরে থাকুক বরং পূর্ব্বোক্ত বিধানই আছে। ইহাও অনুমান সিদ্ধ হইতেছে অজ্ঞ স্ত্রী শূদ্রাদির প্রতি বেদাধ্যয়নে নিষেধ কিন্তু তাহারা জ্ঞান লাভের পথে প্রবিষ্ট হইলে বেদ ও বেদান্ত পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতে পারে তাহা না হইলে মৈত্রেয়ী ও গার্গী ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু হইয়া বেদের শ্রবণ মনন ও উচ্চারণ করিতেন্ না ও পরম জ্ঞানি ভগবান্ মহর্ষি যোগি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাদিগের বেদের উপদেশ প্রদান করিতেন্ না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উহার প্রমাণ আছে।

যদি শাস্ত্রে বনিতাদিগের বিদ্যানুশীলনের নিষেধ থাকিত তবে পূর্ব্বতন যোষিদ্‌গণ কখন বিদ্যাভ্যাস করিত না। পরন্তু পূর্ব্বকালে অনেক স্ত্রী বিদ্যাবতী ছিল ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

যখন রুক্মিণীর অনভিমতে দমঘোষের পুত্র শিশুপাল তাঁহাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছিল তখন তিনি সুদামা নামক ব্রাহ্মণ দ্বারা কৃষ্ণকে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে পত্র শ্রীমদভাগবতে প্রকাশিত আছে পাঠ করিলে বোধহয় রুক্মিণীর বিলক্ষণ বিদ্যা ছিল।

শকুন্তলা যিনি মেনকার গর্ভে কৌশিক রাজার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ও যিনি কণ্ব মুনির দুহিতা, তাঁহাকে দুষ্মন্ত রাজা গান্ধর্ব্ব বিবাহে বিবাহ করিয়া তপোধনদিগের তপোবিঘ্ন বিনাশ পূর্ব্বক যখন গৃহে প্রত্যাগমন করেন্ এবং যখন শকুন্তলা সাশ্রুনয়না হইয়া কাতরতা পূর্ব্বক আবেদন করিলেন আবার কত দিনের পর এ অধীনীকে স্মরণ করিবেন তখন তিনি এক অঙ্গুরীয় তাঁহার অঙ্গুলিতে প্রদান করিলেন ও কহিলেন এই অঙ্গুরীয় মুদ্রিত অক্ষর প্রতিদিন একটি একটি করিয়া পাঠ করিবে যেদিন পাঠ শেষ হইবে সেইদিন আমার লোক লোক তোমাকে লইতে আসিবে(১)। ইহাতে বোধ হইতেছে শকুন্তলা লেখা পড়া জানিতেন।

মহাকবি ভবভূতি কৃত উত্তর রাম চরিত্র নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কে আত্রেয়ীর

(১) একৈকমত্র দিবসেদিবসে মদীয়ং নামাক্ষরং গণয় গচ্ছসি যাবদন্তং। তাবৎ প্রিয়ে মদনুরোধনিদেশবর্ত্তী নেতা জন স্তব সমীপমুপৈষ্যতীতি। কালিদাস কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলং।

সহিত বাল্মীর কথোপকথন প্রস্তাবে এমত বর্ণনা আছে যে আত্রেয়ী বাল্মিকীর নিকট বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন্। পূর্ব্বকালীন কামিনীগণ বিদ্যাধ্যয়ন না করিলে কবিরা এমত বর্ণনা কখন করিতেন্ না।

হিমালয় দুহিতা পার্ব্বতী বিদ্যাবতী ছিলেন্ কালিদাস কৃত কুমার সম্ভব কাব্যে ইহার প্রমাণ আছে (১)।

কালিদাসের জীবন সময়ে স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা শিক্ষা করিত এ বিষয়ে আরও প্রমাণ আছে। কর্ণাট রাজার পত্নী কালিদাসের প্রতিযে কবিতা দ্বারা ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছিলেন (২) তাহাতে বোধ হয় তাঁহার সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল।

কালিদাসের কামিনীও বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। বিবাহের পর কালিদাস এবং তাঁহার ভার্য্যা এক শয্যায় বসিয়া আছেন এমত সময়ে এক উষ্ট্র শব্দ করিল। কে শব্দ করিল এই কথা তাঁহার পত্নী জিজ্ঞাসা করাতে কালিদাস উত্তর করিলেন উষ্ট, পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করাতে কহিলেন উট্র, ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার পত্নী কপালে করাঘাত পূর্ব্বক কহিল (৩) বিধাতা রুষ্ট হইলে কি না করেন্ এবং তুষ্ট হইলে কি না করিতে পারেন যে ব্যক্তি উষ্ট্র শব্দের একবার রলোপ একবার ষলোপ করে এমত মূর্খকে এতাদৃশী পণ্ডিতা ও সুন্দরী কন্যা সমর্পণ করিলেন।

বাভটের কন্যা সংস্কৃত শাস্ত্র বিশেষতঃ ব্যাকরণ সুন্দর রূপ জানিতেন্। যখন এক জন ধনগর্ব্বিত হীন জাতি তাঁহার বিদ্যাবত্তা শ্রবণ করিয়া বল পূর্ব্বক বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল তজ্জন্য তাঁহার পিতা জাতি বিনাশ আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া রোদন করাতে সে তাঁহার পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল হে তাত তুমি কেন রোদন করিতেছ আমাদিগের গুণ দোষের নিমিত্তই হইয়া থাকে(৪)।

এতদ্ভিন্ন বল্লাল সেনের পুত্রবধূ, অনসূয়া, দ্রৌপদী, চিত্রলেখা, ও খনা, ইহাদিগেরও শাস্ত্র-জ্ঞান ছিল বিশেষতঃ খনার জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শিতা

(১) তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ। স্থিরোপদেশামুপদেশকালে প্রপেদিরে প্রাক্তন জন্মবিদ্যাঃ।

(২) একোঽভূন্নলিনাত্ততশ্চ পুলিনাদ্বল্মীকতশ্চাপরস্তে সর্ব্বে কবয়স্ত্রিলোকগুরব স্তেভ্যো নমস্কুর্ম্মহে। অর্বাঞ্চো যদি গদ্যপদ্য রচনৈশ্চেতশ্চমৎকুর্ব্বতে তেষাং মূর্দ্ধ্নি দদামি বামচরণং কর্ণাট রাজপ্রিয়া।

(৩) কিং ন করোতি বিধির্যদি রুষ্টঃ কিং ন করোতি স এব হি তুষ্টঃ উষ্ট্রে লুম্পতি রষা যষা তস্মৈ দত্তা বিপুলনিতম্বা। [তুষ্টঃ

(৪) তাত বাভট মা রোদীঃ কর্ম্মণোগতিরীদৃশী। দুষধাতোরিবাস্মাকং দোষসম্পত্তয়ে গুণঃ।

ছিল যাহার ভাষা বচন স্মৃতি শাস্ত্র সংগ্রহকার রঘুনন্দন স্বীয় অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে নানা স্থানে প্রমাণ দিয়াছেন। অধিক কি কহিব ভারতবর্ষীয় যোষাগণ এমত বিদ্বান্ ছিল যে কেহ বা গ্রন্থকার মধ্যেও গণিত হইয়াছে।

বিশ্বদেবী গঙ্গাবাক্যাবলী নামে এক স্মৃতি শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন যাহা সংস্কৃত পাঠশালার পুস্তকালয়ে একখানি আছে পাঠ করিলে বোধহয় তাঁহার ধর্ম্ম শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। যদি স্ত্রীলোকের শাস্ত্রানুশীলনের বিধান না থাকিত তবে বিশ্বদেবী মহর্ষিদিগের বচন অধ্যয়ন, ও ঐ সকল বচনের মীমাংসা পূর্ব্বক গঙ্গাবাক্যাবলী নামে ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রস্তুত করিতেন না।

প্রাচীন নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী বিদ্যাবতী ছিল। লোক মুখে শ্রুত হয় শংকরাচার্য্যের সহিত মণ্ডন মিশ্রের বিচার স্থলে তিনি মধ্যস্থ ছিলেন অতএব তাঁহার দর্শন শাস্ত্রে বিশিষ্ট বিদ্যা না থাকিলে উক্ত উভয় দর্শনবেত্তার মধ্যস্থতা পদে অভিষিক্ত হইতে পারিতেন না।

আর এক লীলাবতী যাঁহাকে ভাস্করাচার্য্য প্রায় প্রতি উদাহরণ শ্লোকে সম্বোধন করিয়া লীলাবতী নামক গ্রন্থ করিয়াছেন বোধ হয় তাঁহারও অংক শাস্ত্রে বিদ্যা ছিল।

পূর্ব্ব কালে স্ত্রীগণ বিদ্যানুশীলন করিত ইহাতে সন্দেহ নাই। মধ্য সময়ে ভারত বর্ষে রাজ্য শাসনের সুশৃংখলতা ছিল না অসভ্য যবন রাজারা যাহার স্ত্রী কন্যা গুণবতী ও সুন্দরী দেখিত তাহাকেই ছল পূর্ব্বক অথবা বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিত এই রূপ নানা উপদ্রব ঘটনা সম্ভাবনায় বালিকাদিগকে কেহ গৃহ বহির্গত করিত না ও তাহাদিগের বিদ্যানুশীলনে অল্প লোক সযত্ন হইত।

কেবল শাস্ত্র বিদ্যায় পূর্ব্বতন কামিনীগণ ব্যুৎপন্ন ছিল এমত নহে তাহারা শিল্প কৌশলে বিলক্ষণ নিপুণ ছিল ইহার প্রমাণ অনেক আছে। ভারত ভূমিস্থ স্ত্রীগণ বিচিত্র রূপে চিত্রপট লিখিতে পারিত তাহার প্রমাণ প্রায় সকল নাটকেতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। উদাহরণ রূপে একটা স্থল উল্লেখ করা যাইতেছে। রত্নাবলী নাটিকাতে এ রূপ বর্ণনা আছে যে রত্নাবলী বৎসদেশাধিপতি উদয়ন রাজাকে একবার নেত্রপথের অতিথি করিয়া তাহার প্রতিমূর্ত্তি চিত্রপটে উত্তম চিত্রিত করিয়াছিল এবং তাহার সখী চিত্রপট অবলোকন করিয়া তাহাকে অত্যন্ত প্রশংসা ও ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

পূর্ব্ব কালে স্ত্রী লোকেরা এক্ষণকার মত অন্তঃপুর নিরুদ্ধ থাকিত না ইহার প্রমাণ মহাভারতে ও অন্য অন্য স্থানে দেখা যায়। গান্ধারী কুন্তী এবং অন্য অন্য রাজ মহিষী যুদ্ধ শিক্ষা পর্য্যন্তও দেখিতো যাইতেন ইহা

মহাভারতে স্পষ্ট লেখা আছে। শিশুপালবধকাব্যে এমত বর্ণনা আছে যে শ্রীকৃষ্ণ সপরিবারে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ দেখিতে গিয়াছিলেন এবং সে গ্রন্থের অনেক স্থানে বিশেষতঃ সপ্তম অবধি একাদশ পর্য্যন্ত এই পাঁচ সর্গ পাঠ করিলে বোধ হয় অনেক স্ত্রী লোক তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিল।

পূর্ব্বে কামিনীগণ সকল অবস্থাতেই স্বামি সঙ্গে বাস করিত যখন রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্র পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার পত্নী জনক নন্দিনীও তাঁহার সমভিব্যাহারিণী হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডব যখন দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাত বাসে ছিলেন তখন তাঁহাদিগের ভার্য্যা দ্রৌপদী একত্রে দিন রাত্রি যাপন করিতেন। আর পর পুরুষে সাক্ষাতে স্ত্রীলোকের উপস্থিত হওনের প্রথা না থাকিলে পূর্ব্বকালে গান্ধর্ব্ব বিবাহের রীতিই সংস্থাপিতা হইতে পারিত না। ইন্দুমতী ও দ্রৌপদী স্বয়ম্বরে গান্ধর্ব্ব বিবাহের প্রথা স্পষ্ট গম্য হইতেছে।

এতদ্দেশীয় যোষাগণের রণোৎসাহ ও স্বাধীনতাভিলাষের বিষয় লিখিতে হইলে গ্রীক ও কার্থেজ্ দেশীয় স্ত্রীলোকের চরিত্র স্মরণ হয়। যখন প্রদ্যুম্ন শাল্বরাজ কর্ত্তৃক রণে শরাঘাতে পীড়িত হইয়া মূর্চ্ছিত হয়েন তখন তাঁহার সারথি তাঁহাকে সংগ্রাম ভূমি হইতে গৃহে আনয়ন করিতেছিল পথিমধ্যে তিনি চেতন হইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলেন ও সংগ্রাম পরাঙ্মুখ আপনাকে দেখিয়া সারথির প্রতি অনেক বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক কটূক্তি করিলেন ও কহিলেন নারীগণ আমাকে নির্বীর্য্য জ্ঞান করিবে এবং তিরস্কার করিবে অতএব তৎকালীন স্ত্রীগণের রণোৎসাহ না থাকিলে তিনি একথা কহিতেন না।

হিন্দু নারীগণ স্বাধীন জন্মভূমির প্রতি অসাধারণ প্রীতি প্রকাশ করিয়া মহামুদ সাহের বিপক্ষে উজ্জয়নী দিল্লী প্রভৃতির ভূপতিরদিগকে স্বীয় অঙ্গের অলঙ্কার সকল বিক্রয় করিয়া সংগ্রামে সাহায্য করিয়াছিল এমত অনেক প্রমাণ আছে যাহাতে বোধহয় ভারত বর্ষীয় পুরুষ ও স্ত্রীদিগের বল, বীর্য্য, উৎসাহ, স্বাধীনতা, ও বিদ্যা প্রচুর রূপ ছিল যাহা স্মরণ করিলে অতি নিব্বীর্য্য মনেও একবার উৎসাহ শিখা প্রদীপ্তা হয়। কিন্তু এক্ষণকার দুরবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া তাহাতে আর বিশ্বাস হয় না।

প্রাচীন সময়ে স্ত্রীগণ অন্তঃপুরনিরুদ্ধ থাকিত না বিদ্যা শিক্ষা করিত এবং ইচ্ছা পূর্ব্বক মনোমত পাত্রকে বিবাহ করিত। ইদানীন্তন বনিতাগণও সকলে একেবারে বিদ্যা রসের আস্বাদ হইতে বঞ্চিত নাই। রাণী ভবানী ও শ্যামা সুন্দরী ইহাদিগের বিদ্যা বিষয়ে বিলক্ষণ সুখ্যাতি ছিল বীরসিংহ

রাজার বিদ্যা বিদ্যাবতী ছিল ইহাও অসম্ভব নহে! এক্ষণেও এই কলিকাতা নগরীস্থ এবং কোন কোন পল্লিগ্রামবাসি কতক গুলিন স্ত্রী লোক লেখা পড়া জানে।

আমরা শুনিয়াছিলাম শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একটি বুদ্ধিমতী কন্যা বাল্যাবস্থাবধি বিদ্যা শিক্ষায় রত ছিলেন এবং সকলে আশা করিত তাঁহা হইতে দেশের উপকার হইতে পারিবে কিন্তু অতি নৃশংস ও কৃতঘ্ন কাল বঙ্গ দেশের মঙ্গল সহ্য করিলেন না সুতরাং কতক বিলাপ অনুতাপ উপস্থিত হয়।

স্ত্রী লোকের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে আর কি প্রমাণ দিব চরাচর সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ পরমকারুণিক পরমেশ্বরের এমত অভিপ্রায় নহে যে নারীগণ বিদ্যানুশীলনে বঞ্চিত থাকিবে। ঈশ্বরের এমত অভিপ্রায় হইলে তিনি বুদ্ধি বিবেক উৎসাহ ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ও উন্নতির আশা প্রভৃতি যে সকল মানসিক ক্ষমতা তাহা স্ত্রীদিগের মনে সংস্থাপিত, ও তাহাদিগকে পুরুষের মত হস্ত পদাদি দ্বারা নির্ম্মিত, করিতেন না।

পৃথিবী মণ্ডলের যে সকল খণ্ডে সামাজিকতার স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছে সেই স্থানেই কামিনীগণ বিদ্যা চর্চ্চা করিয়া থাকে সুতরাং ইহা অপেক্ষা আর কি প্রমাণ দিব।

অবশেষে এই বক্তব্য দুই এক জন বিদ্বান হইলে দেশের উপকার হয় না আর শাস্ত্রতঃ ও লোকতঃ যাহা নিষিদ্ধ নহে তাহা অনুষ্ঠান করিলে অধর্ম্ম ও অপ্রতিষ্ঠ নাই অতএব সকলে প্রাচীন রীতির অনুবর্ত্তি হইয়া চির-দুঃখিনী গৌড়ীয় কামিনীর দুঃখ দূর করিবার উপায়ান্বেষণ করুন।

তৃতীয় খণ্ড

স্ত্রীলোকের বিদ্যা হইলে এদেশের কি অবস্থা হয়।

দ্বিতীয় খণ্ডে স্ত্রীগণের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ক শাস্ত্রীয় ও লৌকিক প্রমাণ অনেক প্রদর্শন করিয়াছি তাহাতে ইহা নিশ্চয় হইতে পারে পূর্ব্বতন যোষিদ্‌গণ বিদ্যাভ্যাস করিত ও কেবল অন্তঃপুর নিরুদ্ধ থাকিত না তাহারা পুরুষের মত সাহস ও উৎসাহ শক্তি সম্পন্ন ছিল প্রয়োজন বশতঃ সর্ব্বত্রে গতি বিধি করিত এক্ষণে স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাবতী হইলে ভারতবর্ষের সুন্দর সৌভাগ্য হইতে পারে তাহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

লজ্জা লোকাচার ভয় স্নেহ দাক্ষিণ্য সরলতা সুশীলতা ও নম্রতা প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণ শরীর ও মনের ভূষণ তাহা কেবল বিদ্যার আলোকাভাবে

এদেশের স্ত্রীলোকেদের প্রকাশিত হয় না। আমরা নিশ্চয় জানি গৌড়ীয় কামিনীগণকে যে সকল গুণ একেবারেও পরিত্যাগ করে নাই কিন্তু বিদ্যার আলোকাভাবে তাহার প্রভা আমরা দেখিতে পাই না। যদি স্ত্রীগণ বিদ্যানুশীলন করে তবে বঙ্গ দেশ এই সসাগরা ধরার সকল প্রদেশ অপেক্ষা বিখ্যাত হইতে পারে।

আমরা আশা করি এদেশের বুদ্ধিমান নারীগণের মনে বিদ্যারূপ বীজ নিঃক্ষেপ করিয়া উৎসাহ বারি দ্বারা সেচন করিলে অবশ্য অমৃত ফল ফলিতে পারে। তাহারা নীতিজ্ঞ হইলে কদাচ কুমার্গে ধাবমান হয় না ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অধর্ম্মকে ঘৃণা করে, অন্য অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের উপকার তাহারাই স্বতন্ত্ররূপে সম্পাদন করিতে পারে, পুরুষের সাহায্য করিয়া কোন কোন বিষয়ে তাহাদিগের ক্লেশ ও শ্রম লাঘব করিতে শক্ত হয়, গৃহ কার্য্যের সুশৃঙ্খলতা ও সুনিয়ম তাহারাই স্থাপন করে, প্রয়োজন বশতঃ পত্রাদি লিখিতে হইলে পরের উপাসনা করিতে হয় না, বালক ও বালিকাদিগের বিশেষ উপকার তাহারাই করিতে সমর্থ হয়।

স্ত্রীগণ বিদ্যাভ্যাস করিলে অনেক মঙ্গল সম্ভাবনা। মনে কর যদি কন্যার মাতা বিদ্যার স্বাদ অবগত থাকেন তবে কি জামাতার ঐশ্বর্য্যের প্রতি দৃষ্টি করেন? না তিনি বিদ্বান ও সুশীল পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দেন সন্দেহ নাই সুতরাং পরস্পর বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইলে দম্পতির অসম্প্রীতি ও কলহ নিবারণ এবং পরম সুখে কাল যাপন সম্ভাবনা। ভার্য্যা মূর্খ হইলে স্বামির যে রূপ দুঃখের আধিক্য বিদ্যাবতী হইলে সেই রূপ সুখের প্রবাহ বৰ্দ্ধিত হয়। যদি ভার্য্যা কোন বিষয়ের সুরস পদ্য অথবা গদ্য উত্তম রূপ লিখিতে পারে তবে স্বামির মনে কত আহ্লাদ ও সন্তোষ উদিত হয় তাহা বর্ণনা সাধ্য নয়।

এক্ষণে বালিকাদিগের শিক্ষা প্রদানে যত্ন ও উৎসাহ হইলেও কি রূপে সমাধা হইবে ইহা ভাবিয়া অস্থির হইতে হয় কিন্তু বাটীর মধ্যে এক জন স্ত্রী লোক লেখা পড়া জানিলে অনায়াসে সকল বালিকার উত্তম রূপ শিক্ষা হইতে পারে। এক জনের বিদ্যানুশীলনে যত্ন দেখিয়া সকলের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহ হয় ও তাবতেই কৃত বিদ্য হইতে পারে।

কেহ কেহ কহেন স্ত্রী লোকের এতাদৃশী বুদ্ধি নাই যাহাতে বিদ্যাভ্যাস করিতে সমর্থ হয় কিন্তু এ অতি অজ্ঞের কথা যেহেতু তাহারা অনেকে বিদ্যার পারদর্শিনী হইয়াছে ইহার অনেক প্রমাণ পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে বরং পুরুষ অপেক্ষা তাহাদিগের মেধা অধিক যাহাতে তাহারা শীঘ্র অভ্যাস করিয়া বহুকাল মনে স্মরণ রাখিতে পারে। এদেশে অবলাদিগের বিনা উপদেশে শিল্প কর্ম্মে যে রূপ পারিপাট্য অবলোকন করি তাহাতে বোধ হয় পুরুষ

অপেক্ষা তাহাদিগের বুদ্ধির চতুরতার ন্যূনতা নাই। তাহাদিগের লেখা পড়ার বিষয়ে বুদ্ধি পরীক্ষা না করিয়া এমত কথা কহা অতি অন্যায়।

বহু কালাবধি গৌড়ীয় কামিনীগণের বিদ্যা চর্চা না থাকাতে তাহাদিগের মতে এমত কুসংস্কার জন্মিয়াছে যে সকলেই কহিয়া থাকে স্ত্রীলোক বিদ্যা শিক্ষা করিলে বিধবা হয় অতএব যদি কোন ব্যক্তির তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতে চেষ্টা হয় তথাপি তাহারা সে উপদেশ গ্রাহ্য করে না। হায় বিদ্যা বিষয়ক সংস্কার থাকিলে কি এমত অমূলক কুসংস্কার জন্মিতে পারে? সর্ব্বদা তাহারা দেখিতে ও শুনিতে পায় ইংলণ্ডীয় ও অন্যান্য দেশীয় নারীগণ বিলক্ষণ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও স্বামী সৌভাগ্য সুখে সময় সম্বরণ করিতেছে।

এক্ষণে বিধবাদিগের দুঃখ স্মরণ করিলে হৃদয় ব্যাকুল হয় কিন্তু বিদ্যা থাকিলে তাহাদিগের এতাদৃশ দুঃখ ও দুর্দ্দশা কখন থাকে না। তাহারা বিদ্যা রস বশম্বদ হইয়া সকল অসুখ ও অসৌভাগ্য একেবারে বিস্মৃত হয় এবং অন্তঃপুরস্থ সমস্ত বালিকাদিগকে বিদ্যা প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট ও পুস্তকের উপরি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া হৃষ্ট থাকে। ফলতঃ এদেশের বিধবা নারী স্বামী বিয়োগে কাতরা হইয়া রাত্রি দিন সেই চিন্তা করে তাহাদিগের এমত কোন উপায় নাই যাহাতে দুই দণ্ড মনঃ সুস্থ থাকে অতএব কেহ কেহ ধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া অধর্ম্মকে আশ্রয় করে কেহবা কুলে জলাঞ্জলি দিয়া কলঙ্কিনী হয়। অধিক কি কহিব কখন কখন তাহারা গুরুর গুরুতর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া অজ্ঞান প্রভাবে আত্মঘাতিনী পর্য্যন্ত হয়। অতএব তাহাদিগের ক্লেশ নিবারণ ও ধর্ম্মাবলম্বন এ উভয়ের পথ কেবল বিদ্যা, বিদ্যাভ্যাসে সতত চিত্ত রত থাকিলে সকল দুঃখ বিস্মৃত হওয়া যায় অন্য দিকে কখন মনঃ ধাবমান হয় না। বস্তুতঃ বিদ্যা রূপ অঙ্কুশ ব্যতিরেকে মনোরূপ মত্তমাতঙ্গকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবারণ করা অতি কঠিন।

আমাদিগের দেশে এমত শত শত দেখিতেছি পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি ধনী ছিল অথবা প্রথমাবস্থায় অনেক ধনোপার্জ্জন করিত পরে অদৃষ্ট ক্রমে ব্যয় করিয়া বা ধনোপার্জ্জনের উপায় হীন হইয়া দীন হইলে, প্রকৃত বন্ধু নহে অথচ বন্ধুত্ব প্রকাশ করে এমত ব্যক্তিরা আর তাহার নিকট যায় না এবং তাহার প্রেয়সীও পূর্ব্বের মত প্রিয় বাক্য কহে না এবং শ্রদ্ধা ভক্তি ও স্নেহ করে না, সম্প্রীতিরও হ্রাস প্রকাশ করে। অতএব বিবেচনা কর প্রথমতঃ তাহার ধন হানি জন্য চিন্তা, দ্বিতীয়তঃ বন্ধুবান্ধবের বিচ্ছেদ জন্য কাতরতা, তাহাতে ভার্য্যার অপ্রীতি সূচক গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিলে যে কি আকস্মিক দুঃসহ দুঃখের উদয় হয় তাহা লেখনী ও বচনের বর্ণনাতীত। তাহার

কখন সংসার বৈরাগ্য হইয়া সন্ন্যাসাশ্রমে বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় কখন জীবনে বিরক্তি হইয়া আত্মঘাত করিবার অভিলাষ হয় এ রূপে তাহার সকল পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হওয়াও কঠিন নহে। কিন্তু স্ত্রী বিদ্যাবতী হইলে কখন এ রূপ ব্যবহার করে না বরং প্রবোধ বাক্য দ্বারা তাহাকে সকল চিন্তা ও ভাবনা হইতে মুক্ত করে।

স্বামি দিনমান বিষয় কর্ম্মে পরিশ্রম করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে প্রিয়তমার মিষ্ট ও সন্তোষ জনক বাক্যে তাহার সকল পরিশ্রম দূর হয় ও বিদ্যা বিষয়ক আলাপে কাল যাপন করে। গৃহস্থাশ্রমের এই প্রধান সুখ কিন্তু বঙ্গ দেশে নারীগণের বিদ্যাভাব প্রযুক্ত তাহারও অভাব হইয়াছে।

বনিতাগণের মনে বিদ্যা রস প্রবাহিত হইলে ধর্ম্মজ্ঞান, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, মানসিক ক্ষমতা, আচারের সুশৃঙ্খলতা, ও সুখের উন্নতি, অতিশয় রূপে হয়। আমরা প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছি ভ্রাতৃ বিরোধের কারণ প্রায় যোষিদ্‌গণ, কিন্তু তাহারা বিদ্যা শিক্ষা করিলে তাহাদিগের মনে ঈর্ষ্যা হিংসা অসূয়া ও মৎসরতা কখন থাকে না এবং কদাপি কলহে কাল যাপন করে না কিন্তু সকলের সহিত প্রণয় পূর্ব্বক সুখ্যাতি লাভের আকাঙ্খায় সময় সম্বরণ করে।

সংসার আশ্রমে বাস করিয়া বিদ্যা যে কি পদার্থ তাহা ক্ষণকাল মনোমধ্যে বিবেচনা করিলে রসনা তাহার কত গুণ আলোচনা করে। দেহি মাত্রেই কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলেরি বিদ্যোপার্জ্জনে অন্তঃকরণকে নিয়ত নিযুক্ত রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই অসার জগৎ বিদ্যা রূপ সার বস্তু থাকাতে সংসার নামে বিখ্যাত হইয়াছে ফলতঃ সংসারের সকল বস্তুই অসার কেবল বিদ্যাই সার। বিদ্যা তুল্য হিতকারি বন্ধু আর দৃশ্যমান হয় না। যেমত অতি মলিন ও ধূলিধূসর প্রস্তর যত শান দ্বারা ঘর্ষণ করে ততই তাহার প্রভা প্রভাকরের আভার ন্যায় প্রদীপ্ত হয় তদ্রূপ বিদ্যা শান দ্বারা লোকেরা যে পরিমাণে আপন মনকে ঘর্ষণ করিবে ততই তাহাদিগের বুদ্ধি উজ্জ্বল ও অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইবে।

পয়ঃপান দ্বারা পিপাসা শান্তি হইলে যে প্রকার আনন্দ হয় চির বিযুক্ত মিত্র মিলন দ্বারা যেরূপ হৃদয়ে সুখ ধারা বর্ষণ করে নিবিড় ঘন ঘটায় ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে রাজমার্গে আলোক অবলোকন করিয়া যে রূপ চিত্ত হর্ষে পুলকিত হয় তদ্রূপ বিদ্যামৃত অজ্ঞান তৃষ্ণা নষ্ট করিয়া হৃদয়কে হৃষ্ট ও প্রফুল্ল করে। সেই বিদ্যামৃত পান করিলে স্ত্রীলোকেরা সুখী হইবে ইহাতে সন্দেহ কি? বরং আরও পুরুষদিগের অশেষ ক্লেশ নিবারণ হইবার সম্ভাবনা। বিবেচনা করিলে ভারতবর্ষীয় পুরুষদিগের সংসারের অশেষ দুঃখ সম্ভোগ করিতে হয়। প্রথমতঃ

ধনোপার্জ্জন ধন রক্ষণ ও ধন বর্দ্ধনের চিন্তা দ্বিতীয়তঃ তাহার সুনিয়মে ব্যয় তাবৎ চিন্তাই পুরুষদিগকে করিতে হয়। কি কহিব কোন স্থানে একখানি পত্র লিখিতে হইলে পুরুষের উপাসনা ব্যতিরেকে তাহা সম্পন্ন হয় না কোন গৃহস্থ বিদেশে গমন করিতে বাধিত হইলে তাঁহার অগ্রে এই ভাবনা উপস্থিত হয় বাটীতে কে থাকিবে ও কি রূপে গৃহ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইবে। বিশেষতঃ যাঁহাদিগের জমিদারি অথবা বাণিজ্য কিম্বা লাভ সংক্রান্ত ব্যাপার থাকে তাঁহাদিগের পুরুষ ব্যতিরেকে কোন প্রকার চলে না। তদ্বিষয়ক লেখা পড়া ও হিসাব আমাদিগের অভাগা স্ত্রী লোকেরা কিছুই জানে না তাহারা প্রায় এক কুড়ি দশ টাকা বই ত্রিশ টাকা কহিতে জানে না সুতরাং অনেক স্থানে শুনিয়াছি ও দেখিতেছি যোষিদ্‌গণের হস্তে তাবৎ বিষয় কর্ম্মের ভার অর্পিত হইলে তাহা শীঘ্র বিনষ্ট হয়। দুষ্ট লোকেরা প্রলোভ দেখাইয়া, বা অপর উপায় দ্বারা তাহার বিষয় হস্তগত করে। ফলতঃ এতদ্দেশীয় স্ত্রী জনকে প্রতারণা করা অতি সহজ। কিন্তু তাহারা লেখা পড়া জানিলে বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সক্ষম হয় ও তদ্বিষয়ক সকল লেখা পড়া বুঝিতে এবং বুঝাইতে পারে। রাণী ভবানী যদি বাল্যাবস্থায় বিদ্যাভ্যাস না করিতেন তবে তাঁহার স্বামী মরণানন্তর কখন তাবৎ বিষয় রক্ষা করিতে পাবিতেন না ও সকলের নিকট প্রতিষ্ঠা এবং সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইতেন না রাণী ভবানীর এতাদৃশী কীর্ত্তি যে বাঙ্গলায় অদ্যাপি সকল লোকে তাঁহার নাম স্মরণ করিতেছে কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাঁহার পতির নাম অল্প লোকে অবগত আছে। শাস্ত্রকারেরাও ধন রক্ষণ ও ধন ব্যয়ের ভার স্ত্রী লোকের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন।

অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিযোজয়েৎ। মনুঃ

অর্থের সংগ্রহে ও ব্যয়ে স্ত্রী লোককে নিয়োগ করিবে।

স্ত্রী লোক লেখা পড়া জানিলে ধন রক্ষা করিতে দক্ষ হয়। স্বাভিলষিত পত্রাদি পতির নিকট লিখিতে হইলে তাহারা আপনারাই লেখে এবং স্বামিকে নিজ দুঃখে দুঃখী ও সুখে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে।

ভূত প্রেত ও ব্রহ্মদৈত্যের ভয় প্রায় স্ত্রী লোককে আশ্রয় করে তাহার কারণ কেবল বিদ্যার অননুশীলন। অজ্ঞ লোকেরা ভুজঙ্গ ভল্লুক এবং ব্যাঘ্র প্রভৃতির স্বাভাবিক ভয় ও ভয়ানক মৃত্যু ভয়ে অসন্তুষ্ট হইয়া কাল্পনিক ভয়ের কল্পনা করিতে ত্রুটি করে না কিন্তু যে স্থানে বিদ্যার আলোচনা বাহুল্য রূপে হইতে থাকে সেখানে আর ভূত ব্রহ্মদৈত্যের ভয় লোকের হৃদয়কে আক্রমণ করিতে পারে না। এক্ষণে এই কলিকাতা নগরীতে যে সকল ভয় বিরল প্রচার প্রায় পরন্তু পল্লীগ্রামে বিশেষতঃ বনবিষ্ণুপুর প্রদেশে লোকেরা ভূত প্রেতের কাল্পনিক গল্প প্রত্যক্ষের ন্যায় জল্পনা করে শ্রোতারাও অত্যন্ত ভয়ে

ভীত হয়। অনেক স্থানে শ্রবণ করা গিয়াছে ভূতের ভয়ে অনেকে মূর্চ্ছাপন্ন ও জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া থাকে। ইহা কি লোচন গোচর হয় নাই যে বিকারাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে ভূতাবিষ্ট ভাবিয়া অচিকিৎসাতে ভীষণ কাল সদনের অতিথি করে। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি পল্লিগ্রামে এক বাটীতে কতক গুলিন স্ত্রী লোক বসতি করিত ও পুরুষেরা বিদেশে থাকিত এক গর্ভবতী সূতিকা গৃহে প্রসূতা হইয়া ঘোর বিকারে উন্মত্ত প্রায় প্রলাপ করাতে সকলে কহিল ইহার উপরি ভাব হইয়াছে (অর্থাৎ ইহাকে ভূতে পাইয়াছে) এই স্থির করিয়া বিজ্ঞলোকের উপদেশ তৃণ জ্ঞান পূর্ব্বক ভূতের রোজা আনাইল এবং ভূতের রোজার কাল্পনিক ও ভয়ানক চিকিৎসাতে শীঘ্র তাহাকে শমন সদনের অতিথি হইতে হইল। এ রূপে এদেশে সহস্র সহস্র লোকের বিশেষতঃ স্ত্রী লোকের প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে স্ত্রীগণকেই ডাইনে টান দেয় ইহাদিগকেই ভূতে পায় পক্ষি প্রভৃতির কোলাহল ধ্বনিতে ইহারাই অশুভ অনুমান করিয়া থাকে। পূর্ব্বে রোম ও গ্রীক দেশেও পশু প্রভৃতির নাড়ীর আকৃতি পরীক্ষা করিয়া ভাবি মঙ্গল বা অমঙ্গল বলিতে পারিত, কিন্তু এক্ষণে যত বিদ্যা ও সামাজিকতার স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে ততই আর ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের ভবিষ্যৎ মঙ্গল ও অমঙ্গল সূচক বাক্য আমাদিগকে প্রতারণা করিতে পারে না অতএব বনিতাগণের মনে বিদ্যাঙ্কুর জন্মিলে ভূত প্রেতাদির কাল্পনিক ভয় জনিত অনিষ্ট নিবারণ হয় ও এবম্বিধ অন্যান্য মিথ্যা ভয় অদৃশ্য হইতে পারে।

অবলাগণ বিদ্বান্ হইলে বালক ও বালিকারা অনায়াসে সুপণ্ডিত হইতে পারে যেহেতু তাহারা সর্ব্বদা বিদ্যা বিষয়ক উপদেশ পাইলে ক্রীড়ায় অধিক কালক্ষেপ করিতে পারে না ও উপদেশকাভাবে বসিয়া থাকে না মনে কর যাহারা পল্লিগ্রামে বাস অথচ অর্থোপার্জ্জন জন্য নগরে প্রবাস করে অধিক অর্থ ব্যয়ে অসামর্থ্য অথবা নগরে রোগ ভয় প্রযুক্ত স্বীয় সন্তানদিগকে নিকটে রাখিতে পারে না তাহাদিগের পরিবারের যদি শিক্ষা প্রদানে শক্ত হয় তবে সেই প্রবাসি ব্যক্তির অসন্নিধান বশতঃ তদীয় সন্তান কখন মূর্খ হয় না কিন্তু এক্ষণে আমি সহস্র সহস্র বালক দেখাইতে পারি যাহাদিগের ঈশ্বর দত্ত স্বাভাবিক তীক্ষ্ন বুদ্ধিও আছে কেবল উক্ত কারণ বশতঃ মূঢ়তা হইতে মুক্ত হয় নাই। প্রসূতি বিদ্যাবতী হইলে পুত্রের অনেক উপকার হয়। মাতা যে রূপ শৈশবাবস্থাতে স্তন্য দুগ্ধ দ্বারা ও তদনন্তর উত্তম আহার দ্বারা শরীরের পুষ্টি বর্দ্ধন করেন তদ্রূপ বাল্যাবস্থায় জ্ঞান প্রদান করিলে মনের সংস্কার এমত সুদৃঢ় হয় যাহা বার্দ্ধক্যাবস্থায়ও বিস্মৃত হওয়া যায় না। মাতৃ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ড দেশে অনেকে বহুদর্শিতা ও বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। সার উইলিয়ম জোন্স তিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী

ছিলেন এবং যাঁহার অনুসন্ধান নানা বিষয়ক ছিল তিনি মাতৃ উপদেশ অশেষ রূপে প্রাপ্ত হইয়া এতাদৃশ কৃতবিদ্য ও যশস্বী হইয়াছিলেন। ইংলণ্ড দেশে যাঁহারা বিদ্যাবত্তা ও বহুদর্শিতায় লোক সমাজ মধ্যে প্রধান তাঁহারা কহেন মাতৃ উপদেশে আমরা এতাদৃশী মানসিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ধন্যম্মন্য হইয়াছি।

এক্ষণে পিতা মাতা কৌলীন্য মর্যাদা অথবা ধনের উন্নতি দেখিয়া কুৎসিত ও মূর্খকেও কন্যা সম্প্রদান করেন। তাহাতে সেই সেই কন্যা আত্ম সমর্পণ কালে কোন আপত্তি উত্থাপন না করিয়া পিত্রাদি প্রারিপ্সিত সেই বিবাহে সম্মত হওয়াতে তাহাদিগকে দোষী বলিতে পারি না কারণ তাহাদিগের বিদ্যা নাই যাহাতে সদসদ্বিবেচনা পূর্ব্বক মনোগত পাত্রের সহিত বিবাহের অভিলাষ প্রকাশ করিতে পারে দ্বিতীয়তঃ পরাধীন। কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি তাহাদিগের বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা সদসদ্বিবেচনা হইলে এরূপ বিবাহের রীতির প্রতি অবশ্যই আপত্তি করে এবং পিতা মাতাও সেই সেই কন্যার সম্মতি ব্যতিরেকে কখন বিবাহ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়েন না। বিশেষতঃ মাতা বিদ্যাবতী হইলে বাল্যাবস্থায় কন্যার বিবাহ দিতে কখন অনুমতি করেন না। এ রূপে সদসদ্বিচার করিয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বিবাহ হইলে স্বামী কন্যার মনোভিমত হয় ও পরস্পর বিবাদ কলহ ঘৃণা ঈর্ষ্যা প্রভৃতি অসুখের হেতু কিছু হইবার সম্ভাবনা থাকে না সুতরাং ইহাও অল্প সৌভাগ্যের কর্ম্ম নহে।

বিবেচনা করিলে আমাদিগের দেশে বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী ধনী প্রায় বিরল, যাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ সঞ্চিত ধন আছে তাঁহারা অনেকে অপব্যয়ে নিরর্থক অর্থ নাশ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন কেহবা কৃপণতা প্রযুক্ত স্বীয় উদর সম্পূর্ণ রূপে পরিপূর্ণ করিতে কাতর হয়েন সুতরাং দেশের উপকার ও দেশীয় ব্যক্তির সাহায্য কি রূপে করিবেন। বিশেষতঃ ভারত বর্ষীয় পুরুষেরা কেহবা অল্প বিদ্যাভ্যাস কেহবা কিছুই না করিয়া সংসারের ভারগ্রস্থ হইলেই ধনোপার্জ্জনের চেষ্টা করেন তাঁহাদের হইতেই বা দেশের কি উপকার হইবে স্বীয় উদর পরিপূরণই তাহাদিগের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু নারীগণের ধনোপার্জ্জন করিবার চিন্তা নাই, পরের সেবা ও তোষামোদ প্রায় করিতে হয় না, ধনমদোম্মত্ত গর্ব্বিত লোকের গর্ব্ব যুক্ত বাক্যকে কর্ণ কুহরে স্থান দান করিতে হয় না, বাণিজ্য কার্য্যে দুর্যোগ জন্য অধৈর্য্য নাই, লাভালাভ ভাবনায় রজনীতে নিদ্রা না হইয়া অসুস্থতাক্রান্ত হইতে হয় না, নদী তরঙ্গে নৌকা ভগ্ন হইয়া দ্রব্যাদি বিনাশের আশঙ্কা নাই, কৃষিকুসীদের ব্যাঘাত চিন্তা করিতে হয় না, কেবল গৃহ কর্ম্ম নির্ব্বহন কালে কায়িক পরিশ্রম, তদ্ভিন্ন সকল কালেই বিশ্রাম করে। যদি এই অবস্থায় তাহারা শিল্প বিদ্যা

ও শাস্ত্র বিদ্যা অনুশীলন করে এবং তাহাতে ব্যুৎপন্ন হইতে পারে তবে বঙ্গ দেশের মহিমার সীমা থাকে না, দেশের উপকার, বিশেষতঃ পুরুষদিগের উপকার, তাহারা যথেষ্ট রূপে করিতে পারে। মনে কর যদি তাহারা কোন প্রতিমূর্ত্তি কিম্বা কোন বস্ত্রাদিতে সূচীর সূক্ষ্ম কর্ম্ম পারিপাট্য ও বৈচিত্র্য রূপে বিস্তার করিতে পারে তবে সেই সকল দ্রব্য অধিক মূল্যে বিক্রয় করিলে গৃহস্থের অনেক ভার লাঘব হইবার সম্ভাবনা, এক্ষণে বিবিরা যাঁহাদিগের স্বামী সংসারের ব্যয়োপযোগি অর্থ না রাখিয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছেন, তাঁহারা প্রায় এই রূপে সংসার নির্বাহ করিয়া থাকেন।

যদি বঙ্গদেশস্থ বনিতারা শাস্ত্র বিদ্যায় নিপুণ হইয়া কোন ইতিহাস, কিম্বা কোন কাব্য, অথবা অঙ্ক শাস্ত্র কিম্বা কোন মহাত্মার জীবন বৃত্তান্ত, কিম্বা আকাশ বিষয়ক গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতির গতি বিধি নিরূপণ, ইত্যাদি কোন গ্রন্থের অনুবাদ অথবা রচনা গদ্য কিম্বা পদ্যেতে করিতে পারে তবে তৎপাঠে দেশস্থ লোকের উপকার, অধিক মূল্যে বিক্রয় হইলে সংসারের উপকার, ও স্বীয় নাম ও যশঃ জগন্মণ্ডলে ব্যাপ্ত হইলে স্বীয় উপকার হয়। আমরা যখন একটি কিম্বা দুইটি পদ্য রচনা হেতু চির বিনষ্ট কামিনীগণকে অদ্যাপি স্মরণ করিতেছি তখন গ্রন্থকারের কীর্ত্তি চিরজীবিনী ভূমণ্ডল ব্যাপিনী হইবে ইহাতে সন্দেহ কি। যদি গৌড়ীয় সীমন্তিনী ইংলণ্ড কামিনী এজ্‌ওয়ার্থ, সমরবিল, হ্যানামূর, ল্যাণ্ডন, হীমেন্স, সেলি ইহাদিগের তুল্য বিখ্যাত গ্রন্থকারিণী হইতে পারে তবে ইহা অপেক্ষা আমরা আর কি সৌভাগ্যের প্রত্যাশা করিব।

হায় কত কালের পর এদেশ পণ্ডিতময় হইবে, স্ত্রীলোকেরা গ্রন্থকর্ত্তা হইবে, পুরুষদিগের চিন্তা হ্রাস হইবে ও আমাদিগের আশা পরিপূর্ণ হইবে।

চতুর্থ খণ্ড

স্ত্রীগণের বিদ্যানুশীলনের উপায়।

স্ত্রীলোকের বিদ্যা হইলে যে উপকার ও মঙ্গল সম্ভাবনা তাহা লিখিয়াছি। আমাদের দুর্ভাগ্য ভারত বর্ষে সে সকল উপকারের আশা করিতে পারি না যে সকল উপায় দ্বারা স্ত্রীগণ বিদ্যানুশীলন করিতে সমর্থ হয় তাহার কোন উপায় এক্ষণে প্রত্যক্ষ গোচর হয় না। ফলতঃ যে সকল উপায় ভারত বর্ষীয় নারীকে বিবিগণের সহচরী করিতে পারে এ উপায় বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ সকলেরি অনুসন্ধের অতএব তাহার বিস্তার করা আবশ্যক। এই খণ্ডে এই বিষয়ে যথাশক্তি বিস্তারিত করিয়া লিখিতে প্রস্তুত হইলাম।

বিদ্যানুশীলন প্রকাশ্য পাঠশালায় অথবা স্বীয় সদনে গোপনে উভয়

স্থানেই হইতে পারে। আমরা প্রকাশ্য বিদ্যা মন্দিরে বিদ্যাভ্যাসে অধিক উপকার দেখিতে পাই সেখানে কেবল বিদ্যাবৃদ্ধি হয় এমত নহে কিন্তু বিদ্যাবৃদ্ধির সহিত স্বভাবের পরিবর্ত্তণ হয়। মনে কর যদি কোন বালক অথবা বালিকার অসৎ স্বভাব থাকে সে যদি অনবরত সৎসঙ্গে সৎস্বভাবের উপদেশ অশেষ রূপে প্রাপ্ত হয় তবে কি সে স্বীয় খলতা ও চঞ্চলতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎপথের অতিথি হইতে অভিলাষ করে না? সে কি অন্যের বিদ্যা-বিষয়ক দৃঢ়তর উৎসাহ ও উদ্যম অবলোকন করিয়া আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা স্বয়ং সেই রূপ উৎসাহী ও উদ্যুক্ত হইতে মানস করে না অবশ্য তাহারা উৎসাহান্বিত হয়। সন্দেহ নাই। সকলেই অবশ্য স্বীকার করেন বালক ও বালিকাদিগের এমত স্বভাব যে তাহারা স্বেচ্ছাধীন কোন দিন বিদ্যাভ্যাস করে না, তাহারা সর্ব্বদা ক্রীড়াতে আসক্ত, তাহাদিগের শারীরিক পরিশ্রমে বিশ্রাম নাই, মানসিক শ্রমে কখন মনঃ ধাবন করে না, তাহারা কেবল শিক্ষকের ভয়ে পাঠাভ্যাস করে অতএব প্রথমতঃ তাহাদিগকে প্রকাশ্য বিদ্যাসদনে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।

বাল্যাবস্থায় বিবাহ, ইতর লোকের সহিত বাসে ঘৃণা, এবং সামান্য পরিচ্ছদ এই তিন আপাততঃ এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাভ্যাসের প্রধান প্রতিবন্ধক বোধ হইতেছে। এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণ বিবাহের পর আর প্রায় গৃহের বাহির হইতে পায় না পঞ্জর বদ্ধ পক্ষির মত অন্তঃপুররুদ্ধ থাকে। কি কহিব এতদ্দেশীয় পুরুষেরা যাঁহার সহিত পরম বন্ধুতা আছে এবং যাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষাও স্নেহ করেন তাঁহার সহিতও আলাপ দূরে থাকুক চক্ষুর সম্মুখে নিজ ভার্য্যাকে গমন করিতেও বারণ করিয়া থাকেন। উৎকৃষ্ট জাতির দুহিতা নিকৃষ্ট জাতির সমভিব্যাহারিণী হইলে পিতা-মাতা অপমান জ্ঞান করেন ও হীন জাতির সঙ্গকে ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করাইতে চেষ্টা করেন। এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের পরিচ্ছদের পরিচয় কি দিব তাহারা যে পরিচ্ছদ পরিধান করেন সে অতি সামান্য। বিশেষতঃ ধনিগণের পরিবারেরা প্রায় এমত অম্বর পরিধান করিয়া থাকেন যে তাহাকে অম্বর বলিলে বলা যায় অর্থাৎ সে বস্ত্র পরিধান ও অপরিধান দুই সমান। শাস্ত্রানুসারে অর্থাৎ দ্বাদশ বৎসর সময়ে কন্যার বিবাহ দিলেও এবং অপকৃষ্ট জাতির সহবাস না করিয়াও যে রূপ বালিকারা বিদ্যা সদনে বিদ্যাভ্যাস করিতে সমর্থ হয় এ উপায় পশ্চাৎ লিখিব কিন্তু তাহাদিগের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্ত করা ত্বরায় কর্ত্তব্য। পশ্চিম দেশীয় যোষিদ্‌গণ যে রূপ পরিচ্ছদ পরিধান করে সেই রূপ কাঁচলি ঘাগরা ও প্রাবার এতদ্দেশীয় নারীদিগের ব্যবহার করা উচিত যেহেতু এরূপ বস্ত্র পরিধান করিলে তাহারা প্রকাশ্য স্থানে উপহাসাস্পদ ও অসভ্য প্রায় লোচন গোচর হয়।

এতদ্দেশে বহুকালাবধি স্ত্রীগণের প্রকাশ্য স্থানে গতাগতি না থাকাতে এতাদৃশী প্রথা হইয়াছে যে যদি এক্ষণে কোন ভদ্রলোকের গৃহিণী কোন প্রকাশ্য সমাজে উপস্থিত হয়েন তবে সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করেন ও তাঁহার স্বামির অথবা পিতা-মাতার অপমানসূচক অবক্তব্য বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক অখ্যাতি ঘোষণা করিতে সকলেরি বাসনা হয়, সুতরাং যাঁহাদিগের মনে স্ত্রীলোকের দূরবস্থা দূর করিবার বাঞ্ছা আছে তাঁহারাও এই লোকাপবাদে ভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় মনোরথ মনেই লীন করেন প্রকাশ করিতেও ভয় হয়। অতএব ভারত ভূমির বন্ধুবর্গকে এই পরামর্শ প্রদান করা উচিত যে তাঁহারা প্রথমতঃ নির্ভয় হউন এবং সকলে একেবারে স্বীয় কন্যাদিগকে পুত্র সন্তানের মত বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষার্থ প্রেরণ করুন এ রূপে ক্রমে অধিকাংশ লোক বঙ্গ দেশের মঙ্গলাকাংখী হইয়া এই দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইলে লজ্জাই বা কি ? ভয়ই বা কি ? দশ জন মিলিত হইয়া যদি কোন অসৎ কর্ম্মও করে তথাপি তাহাদিগের লজ্জা ও ভয় হয় না পরন্তু এ অসৎ কর্ম্ম নহে।

যদি পুরুষেরা পুরুষ মণ্ডলী মধ্যে স্ত্রী কন্যা প্রেরণ করিতে সন্দেহ করেন এবং তাহাতে সন্দেহ হইবারও সম্ভাবনা যেহেতু এদেশের লোকেরা তাদৃশ্য সভ্য নহেন তাঁহাদিগের মনঃ অত্যন্ত অশুদ্ধ ও কপট। ফলতঃ এতদ্দেশীয় পুরুষেরা প্রায় সকলেই ইন্দ্রিয় রিপুর বশীভূত তবে এমত পাঠশালা স্থাপন করা আবশ্যক যাহাতে স্ত্রীগণ বিদ্যা প্রদান করে এবং কেবল বালিকারা ছাত্র রূপে পরিগণিত হয় পুরুষের সম্পর্কও না থাকে। অথবা পাঠশালায় শিক্ষার সমুদয় ভার বিদ্বান্ স্ত্রীগণের হস্তে সমর্পিত থাকে এবং তাহাদিগের সমক্ষে পুরুষেরা শিক্ষা প্রদান করে ইহা হইলেও বোধ হয় কোন আপত্তি হইতে পারে না।

যদিও এতাদৃশ বিদ্যাভবনে স্ত্রীগণের অধীনে বয়স্থা স্ত্রীলোকও বিদ্যাভাস করিলে কোন আশঙ্কা ও অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা নাই এবং ইহাও বিবেচনা করা উচিত যাহারা সতীত্ব ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে অভিলাষ করে তাহারা অন্তঃপুররুদ্ধ ও দ্বারপাল নিরুদ্ধ থাকিলেও অধর্ম্ম আশ্রয় করিতে পারে ইহা অনেকের লোচন গোচর আছে। রাজ বাটীর অবরোধগণেরও ব্যভিচার দোষ অনেক শ্রবণ করা গিয়াছে এবং বোধ হয় এই নিমিত্তই পল্লিগ্রামে প্রায় সকল স্ত্রীই সকল বাটীতে গমনাগমন করে তাহাতে পুরুষেরাও নিষেধ করেন না কিন্তু এতদ্দেশের এতাদৃশ অসভ্য অবস্থায় বয়স্থা কন্যা অথবা ভার্য্যাকে প্রকাশ্য পাঠশালায় প্রেরণ করিতে কোন ব্যক্তির সম্মতি হইবে না অতএব এই এক সাধারণ উপায় আছে যাহা লোক বিরুদ্ধ ও শাস্ত্র নিষিদ্ধ নহে তাহা অনুষ্ঠান করিলেও চেষ্টা সফল হইতে পারে পিতা মাতা একাদশ বা দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রকাশ্য বিদ্যাশালায় স্বীয় বালিকা-

দিগকে বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করুন তদনন্তর পাত্রের কেবল ধন মাত্র না দেখিয়া বিদ্যাবত্তা সুশীলতা চতুরতা পরীক্ষা করিয়া বিবাহ দিলে তৎকর্ত্তৃক বিদ্যাভ্যাস অনায়াসে হইতে পারে এবং জায়া পতি উভয়ের সম্প্রীতির সম্ভাবনা হয়। অথবা কোন সুশিক্ষিতা নির্দোষা যোষাকে বেতন দিয়া রাখিলে অন্তঃপুর মধ্যেও বিদ্যা অসাধ্যা হয় না।

এক্ষণে যে রূপ বিবাহের সময় পাত্রের গুণ ও বিদ্যা পরীক্ষা করিয়া থাকেন তদ্রূপ বিবাহ কালীন কন্যার বিদ্যা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য যেহেতু এ রূপ প্রথা প্রচলিতা হইলে সকলে স্বীয় বালিকাগণকে শিক্ষা দিতে উৎসাহান্বিত হইতে পারেন্। এ দেশে কন্যার বিবাহের নিমিত্তেই পিতা মাতা অধিক উদ্বিগ্নচিত্ত থাকেন তাহাতে এ রূপ নিয়ম করিলে বালিকাদিগের বিদ্যানুশীলনে সকলে সযত্ন হয়েন্ তাহাতে সন্দেহ নাই।

উক্তরূপ কন্যা পাত্র উভয়ের বিদ্যা পরীক্ষা পূর্ব্বক কার্য্য সম্পন্ন হইলে স্বামী ভার্য্যাকে বিদ্যা প্রদান করিতে পারে। বিশেষতঃ যাঁহাদিগের প্রচুর ঐশ্বর্য্য আছে তাঁহারা বালিকাদিগের শিক্ষার্থ অর্থ ব্যয় করিয়া বিদ্বান্ স্ত্রীজনকে বেতন প্রদান পূর্ব্বক রাখিতে কোন ক্লেশ বোধ করেন না এবং তৎসাহায্যে পার্শ্বস্থ সমস্ত দীন দুঃখি ব্যক্তিদের দুহিতারাও বিনা মূল্যে বিদ্যারূপ অমূল্য রত্ন কেবল কায়িক যত্ন করিলেই লাভ করিতে পারে। যে রূপ এক্ষণে ঐশ্বর্য্য যুক্ত ব্যক্তিদের সাহায্যে অনেক দীন ও ধনহীন গণের পুত্রের বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে তদ্রূপ তাহাদিগের দুহিতারাও এই প্রমাণের অনুবর্ত্তিনী হইলে ভারত বর্ষের মহিমার সীমা থাকে না।

প্রায় সকল স্থানেই দুই একজন ধনবান্ বসতি করেন তাঁহারা অকাতরে অর্থ ব্যয় করিলে সকলই সফল হয় আর এই সকল কর্ম্মেই অর্থ ব্যয় আবশ্যক কিন্তু এতদ্দেশীয় ধনি মহাশয়েরা তামসিক নৃত্যগীতাদি দর্শন শ্রবণে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন এমত সাত্ত্বিক কর্ম্মে দুই পয়সা দানও নিরর্থক বোধ করেন। পরোপকার ও স্বদেশের মঙ্গল যে কি পদার্থ তাহা কখন কর্ণেও শ্রবণ করেন নাই। অতএব সকল ধনি মহাশয়েরা ঐকমত্য পূর্ব্বক উৎসাহী হইয়া নগরে ও পল্লিগ্রামে স্থানে স্থানে বালিকা শিক্ষার্থ পাঠশালা স্থাপন করুন।

এ বিষয়ে রাজার উৎসাহ থাকিলে সুবর্ণে সোহাগা হয়। প্রজার ধন প্রাণেও তাদৃক উপকার হয় না যাহা রাজার অনুমতি ও আজ্ঞা মাত্রে সম্পন্ন হইতে পারে। অন্ততঃ প্রজার স্থানে অর্থ লইয়াও রাজাদিগের বালিকা ও বালক শিক্ষার্থ স্থানে স্থানে পাঠশালা স্থাপন ও তাহার কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

বাল্যাবস্থায় বালিকাদিগকে প্রকাশ্য পাঠশালায় প্রেরণ না করিলে আমরা অধিক উপকার প্রত্যাশা করিতে পারি না। আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি যাঁহারা গৃহে শিক্ষক রাখিয়া বিদ্যা শিক্ষা করেন তাহাদিগের অপেক্ষা পাঠশালার ছাত্রদিগের বিদ্যা, সুশীলতা, সামাজিকতা, সততা, রীতি, নীতি প্রভৃতির আধিক্য হয়। বালিকার পরিণয় কাল পর্যন্ত প্রকাশ্য বিদ্যা মন্দিরে বিদ্যানুশীলন করিলে তাহাদিগের মনে এমত সংস্কার জন্মে যে তাহারা কখন বিদ্যার আস্বাদ বিস্মৃত হইতে পারে না সুতরাং অন্তঃপুর মধ্যেও বিদ্যার নিমিত্ত স্বয়ং উপায় অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

অগ্রে কোন্ ভাষা অভ্যাস করা উচিত এই প্রশ্ন এক বালককেও জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করে স্বদেশীয় ভাষা, বালক ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি জন্য দুগ্ধ পানের সহিত যে ভাষা ব্যগ্র হইয়া শ্রবণ করে ও শিক্ষা করিতে যত্ন করে এবং বৃদ্ধ হইলেও যে ভাষা কখন বিস্মৃত হইতে পারে না সে ভাষা অগ্রে শিক্ষণীয়া হইতে সন্দেহ কি? স্বদেশীয় ভাষানুশীলন অতি সুলভ ও মহোপকারক। বালক বালিকা পাঁচ বৎসরের মধ্যেই দেশীয় ভাষার অর্দ্ধেক অভ্যাস করে এবং অল্পায়াসেই কৃতবিদ্য হইতে পারে। বিদেশীয় ভাষা অভ্যাস করিতেই জীবনের অধিকাংশ বিনষ্ট হয় অতএব তাহাতে অধিক উপকার প্রতীক্ষা করা যায় না। বিদেশীয় ভাষানুশীলন বহু পরিশ্রম ও ধন সাধ্য। এক্ষণে ইংলণ্ডীয় ভাষার বাহুল্য রূপে প্রচার হইয়াছে তথাপি অনেকে অর্থ ব্যয়ে অসমর্থ হইয়া তদনুশীলনে অশক্ত হইয়া রহিয়াছেন।

আমরা অঙ্গীকার করি বঙ্গ ভাষায় কোন উত্তম পুস্তক ছিল না সুতরাং বিষয় কর্ম্মোপযোগি যৎকিঞ্চিৎ অঙ্ক কতিপয় অশুদ্ধ পত্রাবলী, অদূরদর্শি শুভঙ্করের আর্য্যা, সরস্বতী বন্দনা, গুরু বন্দনা, গঙ্গা বন্দনা, ও দাতাকর্ণ, প্রভৃতি সমুদয় পাঠশালার পাঠ্য গ্রন্থ ছিল এবং চাণক্যের শ্লোক অত্যন্ত অশুদ্ধরূপে অভ্যাস করিত। যে অশুদ্ধ পত্রাবলী ও অশুদ্ধ শ্লোকের কুসংস্কার ব্যুৎপন্ন হইলেও বিস্মৃত হওয়া কঠিন। অনেক লোককে বিলক্ষণ ব্যাকরণ ব্যুৎপন্ন দেখি কিন্তু সেই বাল্যাবস্থায় অভ্যস্ত অশুদ্ধ শ্লোক ও অশুদ্ধ পত্র কহিয়া ও লিখিয়া থাকেন। এক্ষণেও তাদৃশ উপকারক উত্তম পুস্তক সকল প্রস্তুত হয় নাই। বঙ্গ ভাষায় কোন উত্তম পুস্তক আছে কি না এই চিন্তা করিলে অন্ধকার দেখিতে হয়। অতএব যাঁহারা দেশীয় ভাষায় উন্নতি আকাঙ্খা করেন, স্বীয় পুত্র ও কন্যা সন্তানদিগকে দেশীয় ভাষায় কৃতবিদ্য করিতে অভিলাষ করেন, ও দেশের মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তাঁহারা অগ্রে সংস্কৃত বা ইংলণ্ডীয় অথবা অন্য ভাষা হইতে উত্তম পুস্তক সকলবঙ্গ ভাষার অনুবাদ করুন সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া বালিকারা দেশীয় ভাষা অভ্যাস করিবে ও দেশের উপকার করিতে সমর্থ হইবে।

এক্ষণে স্ত্রীলোক শিক্ষক পাওয়া দুর্লভ ও দুষ্কর বোধ হইতেছে কিন্তু সকলে বিদ্যানুশীলন করিতে আরম্ভ করিলে ক্রমে সুলভ হইবে ও অল্প বেতনে সুশিক্ষিত স্ত্রী জন শিক্ষক রাখা দুষ্কর হইবে না। যখন এক বাটীর একজন স্ত্রী বিদ্যাবতী হইলে তৎসাহায্যে বাটীর সকলে অল্পায়াসে বিদ্যা শিক্ষায় দক্ষ হইতে পারে তখন অশেষ যোষিদ্‌গণ বিদ্বান্‌ হইলে বিনা ক্লেশে সকলে বিদ্যা শিক্ষা করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইংলণ্ডীয় ভাষার গুণ আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না ও তদভ্যাস জন্য উপকারে কৃতঘ্নতাচরণ করা ধর্ম্মের কর্ম্ম নহে। যদিও ইংরাজেরা ল্যাটিন গ্রীক প্রভৃতি বিখ্যাত ভাষা হইতে স্বীয় ভাষার বিস্তার ও সংস্কার করিয়াছেন কিন্তু এক্ষণে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন ইংলণ্ডীয় ভাষার বিলক্ষণ শাখা বৃদ্ধি হইয়াছে ও ক্রমে হইতেছে। যে ব্যক্তি একবার ইংলণ্ডীয় ভাষার রসাস্বাদন করে সে কখন তাহার গুণ বিস্মৃত হইতে পারে না বিশেষতঃ ভূগোলতত্ত্ব, আকাশ বৃত্তান্ত, পদার্থ জ্ঞান শারীরিক অনুসন্ধান, অঙ্ক বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা শিল্প কৌশল, সংগ্রাম নৈপুণ্য, ইংলণ্ডীয়দের মত প্রায় কোন জাতির নাই। উক্ত বিদ্যাসকলের ফল প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইহাতে পারলৌকিক ফল বিরল, কেবল ঐহিক ফলই দৃষ্টি গোচর হইতেছে। ইংলণ্ডীয় ভাষায় এমত অনেক গ্রন্থ আছে যাহা বাঙ্গলা ও সংস্কৃত সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ পণ্ডিত মণ্ডলীরও অনবগত থাকে অতএব যে সকল গ্রন্থ শিক্ষার আবশ্যকতা হেতু ইংরাজি ভাষা অবশ্য শিক্ষণীয় হইয়াছে। যদিও অন্য দেশীয় ভাষা শিক্ষা বহু পরিশ্রম সাধ্য কিন্তু ইংরাজী ভাষা অভ্যাস করিলে অধিক উপকার দেখিতে পাই সুতরাং তাহা শিক্ষা করা অত্যাবশ্যক।

এতদ্দেশীয় যোষিদ্‌গণকে ইংলণ্ডীয় ভাষার উপদেশ প্রদান সহজেই হইতে পারে। এমত অনেক বিদ্বান্‌ বিবিগণ ভারত বর্ষে বাস করেন যাঁহাদিগের মধ্যে কেহ অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া অবেতনে কেহ বা অল্প বেতনে, কেহ বা সম্পূর্ণ বেতনে বঙ্গ দেশীয় কামিনীদিগকে বিদ্যা দান করিতে পারেন। স্বজাতির অনিষ্ট ও কষ্ট নিবারণ করা শিষ্টাচার সম্মত এবং স্বভাব সিদ্ধ। তবে কি বিবি সকল বঙ্গ দেশীয় অবলা জনের অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন মনঃ স্বভাবোজ্জ্বল বিদ্যা রূপ ভাস্কর কর দ্বারা আলোকময় করিবেন না? আমরা ইহা একবার মনেও করি না। বরং তাঁহাদিগের এমত সৎ স্বভাব যে তাঁহারা বিনা মূল্যে বিদ্যা রূপ অমূল্য রত্ন এ দেশের সহচরীগণকে প্রদান করিতে পারেন।

বিবিদিগের কারুণিকতার কথা কি কহিব তাঁহারা ভারত বর্ষীয় সীমন্তিনী-গণের শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে চাঁদা করিয়া অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন (অস্মদ্দেশীয় শ্রীযুক্ত রাজা বৈদ্যনাথ রায় মহোদয়কে বহু প্রশংসা করিতে

হয় তিনিও এই চাঁদায় ২০০০০ মুদ্রা দান করিয়াছেন) তাঁহাদিগের সমাজ সাহায্যেই এই কলিকাতা নগরীতে ও হাবড়াতে স্ত্রী শিক্ষার্থ পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছে। এই পাঠশালায় অস্মদ্দেশীয় কতক গুলিন স্ত্রী লোক বিদ্যাভ্যাস করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও মনুষ্য জন্ম সফল করিতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য এ দেশের কোন ভদ্র লোক শিক্ষার্থ স্বীয় কন্যাদিগকে তথায় প্রেরণ করেন না এবং প্রেরণ করিবেন এমত সম্ভাবনাও না যেহেতু ইহা পূর্ব্বেই লেখা গিয়াছে এ দেশের ভদ্র লোকেরা স্বীয় সন্তানদিগের অপকৃষ্ট জাতি সহবাসে বিরক্তি প্রকাশ করেন। সুতরাং সেখানে কেবল দীন দুঃখি হীন জাতির দুহিতারা লেখা পড়া করিয়া থাকে।

যদিও হিন্দুদিগের শাস্ত্রের শাসন অতি কঠিন বিশেষতঃ বিপ্রজাতির তদনুসারে চলিলে প্রায় কোন কর্ম্মই করিবার অবকাশ থাকে না কেবল প্রাতঃকালাবধি তৃতীয় প্রহর সময়ে সন্ধ্যাবন্দন প্রভৃতি আহার পর্য্যন্ত নির্বাহ হইতে পারে এবং ব্রাহ্মণ পত্নীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য রন্ধন ভর্ত্তৃশুশ্রূষা ও অন্যান্য গৃহ কর্ম্ম নির্বাহ করিতেই প্রায় সকল সময় বিনষ্ট হয় সুতরাং অবকাশের অল্পতা প্রযুক্ত কখন বা বিদ্যা শিক্ষায় পরিশ্রম কখনই বা বিশ্রাম, করে। শূদ্র বৈশ্য প্রভৃতি অপর বর্ণ যাঁহারা ধনবান তাঁহাদিগের ভার্য্যা ও কন্যারা অবকাশ প্রাপ্ত হইতে পারেন কিন্তু যাঁহারা দীন ও ধনহীন তাঁহাদিগের গৃহ কর্ম্ম অভাগা অবলাদিগকেই করিতে হয় অতএব কখন্ তাহারা বিদ্যাভ্যাস করে। এ রূপ বিলাপ করিলে শাস্ত্রকার ও অদৃষ্টের প্রতি দোষাৰ্পণ করিতে হয়। কিন্তু এতাদৃশ অবস্থাতেও মনোযোগ পূর্ব্বক উপায় স্থাপন করিলে স্ত্রীদিগের বিদ্যা শিক্ষা হইতে পারে। আমরা দেখিতেছি বালিকারা শৈশবাবস্থায় প্রায় ক্রীড়াতেই আসক্ত থাকে তাহারা সাংসারিক কর্ম্মে কোন যত্ন করে না অতএব দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগের বিদ্যাভ্যাসে কোন বাধা নাই। গৃহ কর্ম্মের ভার পাড়লেও অবকাশ মতে বিবাদ ও কলহ পূর্ব্বক কালহরণ না করিয়া বিদ্যালোচনায় কালক্ষেপ করিলে দিনের বিফলতায় জন্মের নিরর্থকতা হয় না। মনে কর যে বাটীতে দশ জন স্ত্রীলোক আছে যদি তাহার মধ্যে দুই জন করিয়া প্রতিদিন গৃহ কর্ম্ম নির্বাহ করে তবে আট জনের প্রত্যহ বিদ্যাভ্যাস অবাধে হয়। বিশেষতঃ ধনিগণের পরিবারদিগের বিদ্যা শিক্ষার বাধা কিছুই দেখিতে পাই না।

স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষার্থ পাঠশালা স্থাপনের বিষয় প্রায় লিখিয়াছি সম্প্রতি তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করি। ইংরাজি ভাষা অনুশীলনের পাঠশালা প্রথমতঃ এই কলিকাতা নগরীতে সংস্থাপিত হইয়াছিল তদনন্তর ক্রমে চর্চার আধিক্য হইলে পল্লিগ্রামেও অনেক স্থানে হইয়াছে এবং এক্ষণেও হইতেছে তদ্রূপ স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষার বিদ্যা গৃহ

প্রথম নগর ভিন্ন অন্যত্র হইবার সম্ভাবনা নাই। কোন নূতন অথচ আয়াস ও ধন সাধ্য কর্ম্ম নগরে প্রথম হয় ক্রমে বাহুল্য রূপে প্রচলিত হইলে পল্লিগ্রামেও হইয়া থাকে। অতএব কলিকাতাস্থ সমস্ত ধনি মহোদয়েরা উৎসাহান্বিত হইয়া তিন চারিটি পাঠশালার ব্যয়োপযোগি ধন প্রদান করুন এবং এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত সমুদয় বিদ্যা মন্দিরের যেরূপ শিক্ষা সমাজ আছে তদ্রূপ সমাজ স্থাপন করিয়া বিদ্বান্ এবং প্রধান সভ্যাদিগের হস্তে তাবৎ ধন ও শিক্ষার ভার সমর্পণ করুন। বিদ্যালয়ে ইংরাজি শিক্ষার্থ বিবিগণকে শিক্ষক রাখুন এবং বাঙ্গলা শিক্ষার্থ পণ্ডিত নিযুক্ত করুন যাহারা এক ঘণ্টা অথবা দুই ঘণ্টা বাঙ্গলা পুস্তক অনুশীলন করায়।

ইংরাজি ভাষায় যে সকল গ্রন্থ আছে তাহা পাঠ না করিলে কখন বহুদর্শিতা নীতিজ্ঞতা বিজ্ঞতা ও সভ্যতা হয় না যেহেতু বঙ্গ ভাষায় অদ্যাপি তাদৃশ উপকারক গ্রন্থ সকল রচিত অথবা অনুবাদিত হয় নাই অতএব বালিকাদিগকে অধিক কাল ইংরাজি ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত। সুতরাং শিক্ষার সমুদায় ভার বিবিদিগের করে নিঃক্ষেপ করা কর্ত্তব্য তাহা হইলে পুরুষেরা বাঙ্গলা শিক্ষা দেওয়াতে কোন অনিষ্ট ঘটে না। বিবিদিগকে অধিক বেতন দিতে হয় তাহাতে অসমর্থ হইলে ক্রিশ্চ্যান বঙ্গ দেশীয় অনেক স্ত্রীলোক আছে তাহার মধ্যে যাহারা ইংরাজি ভাষায় সুশিক্ষিত তাহাদিগকে ইংরাজি ভাষার শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত করিলে অল্প বেতনেও হইতে পারে।

এইরূপ পাঠশালা স্থাপন করিয়া তাহাতে সকল ভদ্র লোক এক কালে স্বীয় কন্যা সন্তান দিগকে প্রেরণ করুণ। যদি কোন ভদ্র লোক প্রকাশ্য স্থান বলিয়া পাঠশালায় স্বীয় কন্যাগণকে প্রেরণ করিতে সন্দেহ ও লোকাচার ভয় করেন তবে প্রায় সকলেই তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইবে সুতরাং কোন কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে না অতএব এ বিষয়ে সকলের উৎসাহ ও সম্মতি আবশ্যক। যদি অপর জাতীয় নারীর সহিত কন্যাদিগের বাস ও বিদ্যাভ্যাস করা মনোনীত না হয় এবং সেই কারণ বশতঃ এক্ষণকার স্ত্রী শিক্ষার্থ পাঠশালায় (লেডি ইস্কুলে) কোন ভদ্র লোক কন্যা সন্তানদিগকে প্রেরণ করেন না তবে এমত বিদ্যাসদ্ম নির্ম্মিত করুন যাহার একদিকে ভদ্র লোকের অপর দিকে অপর জাতির দুহিতারা বিদ্যাভ্যাস করিতে পারে। যে রূপ এক্ষণে শিক্ষক হইবার নিমিত্ত নরম্যাল পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করে তদ্রূপ ইতর জাতীয় বালিকারা স্বতন্ত্র রূপে বিদ্যানুশীলন করিলে অতি সুশৃঙ্খলতা ও সুনিয়ম হয়। ইতর লোকের কন্যারা বিদ্যা শিক্ষা না করিলে পাঠশালায় শিক্ষক পাওয়া অতি কঠিন ও বহু ধন সাধ্য হইবার সম্ভাবনা। ভদ্র লোকের কন্যাদিগের শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত হওয়া অসম্ভব কারণ

তাহাদিগের বিবাহের পর প্রায় শ্বশুরালয়েই বাস করিতে হয় এবং স্বামির বশীভূত হইয়া স্বেচ্ছাধীন কোন কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা থাকে না পতির অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহের বাহির হইতে পায় না সুতরাং কি রূপে পাঠশালার শিক্ষকতা পদের ভারগ্রহণ করিবে। বরং তাহারা শ্বশুরালয়স্থ কামিনীগণের শিক্ষার্থে সেখানে নানা উপায় অনুসন্ধান করিতে সযত্ন হয় কিন্তু ইতর লোকের কন্যা ভিন্ন পাঠশালায় শিক্ষক প্রাপ্ত হওয়া কঠিন।

এক্ষণে ভদ্র লোকের স্ত্রী যাঁহারা বাঙ্গালা উত্তম রূপে জানেন তাঁহারা পাঠশালাস্থ ছাত্রদিগের বঙ্গ ভাষার পরীক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন প্রশ্ন সকল প্রস্তুত করিয়া পাঠশালায় পাঠাইলে সতর্কতা পূর্ব্বক ছাত্রগণ দ্বারা উত্তর লেখাইয়া পুনর্ব্বার তাঁহারদের নিকট প্রেরণ করিলে সদসদ্বিবেচনা পূর্ব্বক যাহারা পারিতোষিক ও প্রশংসার যোগ্য হইবে তাহাদিগের নাম লিখিলে যথাযোগ্য পারিতোষিক মাসে ষন্মাসে অথবা সম্বৎসরে দেওয়া কর্ত্তব্য এবং হিন্দুকালেজের অথবা অন্য পাঠশালার সুশিক্ষিত ছাত্র যাঁহারা এ বিষয়ে উৎসাহ সম্পন্ন তাঁহারা অবশ্য ইংরাজি ভাষার পরীক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। এ রূপে স্ত্রী শিক্ষার্থ পাঠশালার ছাত্রদিগের উৎসাহ উদ্যম ও বিদ্যা বৃদ্ধি হয়।

যে রূপ এক্ষণে নরম্যাল্ ইস্কুলের ছাত্রেরা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে প্রশংসা পত্র পায় তদনন্তর কোন পাঠশালার শিক্ষকতা পদ শূন্য হইলে তাহাতে নিযুক্ত হইতে পারে তদ্রূপ ইতর লোকের দুহিতারা উপযুক্ত হইয়া যথাযোগ্য শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত হইতে পারিবে। ভদ্র লোকের কন্যারা যাঁহারা পাঠশালায় প্রশংসা পত্র পাইবেন তাঁহাদিগের বিবাহের সময় পুনর্ব্বার পরীক্ষার আবশ্যকতা নাই যাঁহারা প্রশংসা পত্র না পাইবেন তাঁহাদিগের বিবাহ কালীন পরীক্ষা করা উচিত যেহেতু ইহাকেও স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষার এক প্রধান উপায় করিতে হইবে।

যাঁহাদিগের বাঙ্গালা ইংরাজি উভয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি আছে তাঁহাদিগের প্রতি এই ভারার্পণ করা উচিত যে তাঁহারা ইংরাজি ভাষা হইতে উত্তম উপকারক পুস্তক সকল সাধু ভাষায় অনুবাদ করেন। ইহাতে যদি অর্থ ব্যয়ও করিতে হয় তাহাও কর্ত্তব্য যেহেতু বঙ্গ ভাষায় উত্তম পুস্তক সকল অনুবাদিত হইলে স্ত্রী লোকেরা সে সকল পুস্তক অনায়াসে অভ্যাস করিতে পারে ও গুরুতর উপকার হয়।

অধিক কি কহিব যে রূপ এক্ষণে হিন্দুকালেজ সংস্কৃত কালেজ এবং অন্য ২ কালেজে শিক্ষার পারিপাট্য ও সুশৃঙ্খলতা আছে তদ্রূপ নারীগণের শিক্ষার্থ পাঠশালা ও সুনিয়ম সংস্থাপন করিলে তাহারা বিদ্যা সংস্কভাব প্রাপ্ত হইয়া সুখ্যাতি লাভ পূর্ব্বক ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হইতে পারে।

আমরা এতদ্দেশের অবস্থানুসারে এক্ষণে এই মাত্র আশা করিতে পারি যে এই নগরীতে নারীগণের বিদ্যা শিক্ষার্থ বিদ্যা মন্দির হওয়া অসম্ভব নহে কিন্তু পল্লিগ্রামে প্রথমতঃ ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে না। একেতঃ পল্লিগ্রামে ধনবান নাই দ্বিতীয়তঃ বিদ্যাবান্ অল্প, পল্লিগ্রাম বাসি লোকেরদের মনঃ অত্যন্ত অশুদ্ধ তাঁহারা সদসদ্বিবেচনা না করিয়া কেবল পিতৃ পিতামহের কর্ম্ম অনুসারে চলিতে বাঞ্ছা করেন। কোন নূতন কর্ম্ম মাঙ্গলিক উপকারক অথচ উত্তম হইলেও আচার বিরুদ্ধ বলিয়া কদাচ আচরণ করেন না। মনে করি স্ত্রীগণের বিদ্যানুশীলন প্রচলিত হইলে যখন আর ইহাতে কোন ব্যক্তির দোষ জ্ঞান হইবে না যখন স্ত্রীগণের বিদ্যাভ্যাস দুষ্কর্ম্ম লোকাচার বিরুদ্ধ ও শাস্ত্র নিষিদ্ধ বলিয়া আর লোকেরদের মনে ভ্রম উপস্থিত হইবে না যখন লোক সকল নারীগণের বিদ্যা শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল অনুভব করিবেন তখন পল্লিগ্রামেও কামিনীগণের প্রকাশ্য বিদ্যা মন্দিরে বিদ্যানুশীলন প্রচলিত হইতে পারে।

এক্ষণে যাঁহাদিগের পল্লিগ্রামে বাস কিন্তু বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে অভিলাষ আছে তাঁহারা যে রূপ বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থ এই কলিকাতা নগরীতে প্রেরণ করিয়া থাকেন তদ্রূপ বালিকাদিগকেও তৎসমভিব্যাহারে প্রেরণ করিলে অনায়াসে অভিলাষ সিদ্ধ হইতে পারিবে।

অবশেষে এই বক্তব্য পিতা মাতা স্বীয় পুত্র সন্তানদিগের বিদ্যানুশীলনে যে রূপ যত্নশীল হয়েন তদ্রূপ কন্যা সন্তানগণের প্রতি সদয় হইয়া বিদ্যারস প্রদান করিলে তাহারা ভাবি সুখের আশা হইতে বঞ্চিত হয় না। বিদ্যার প্রধান ফল অর্থ লাভ নহে কিন্তু সুখ ও সন্তোষ।

শরীর-সাধনী বিদ্যাশিক্ষার গুণোৎকীর্ত্তণ

আমি এই প্রবন্ধ চারি অংশে বিভক্ত করিয়া লিখিলাম ; প্রথম পরিচ্ছেদে শারীরিক বলপ্রাচুর্য্যের প্রয়োজন, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রাচীন সাময়িক হিন্দু-দিগের মধ্যে ব্যায়াম চর্চ্চা, তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রাচীন ইয়ুরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে তদ্বিষয়ের প্রাদুর্ভাব, এবং অবশিষ্ট পরিচ্ছেদে উক্ত শিক্ষার সদুপায় ও বাঙ্গালিদিগের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ অভাব হেতু অশেষপ্রকার দোষোদ্ভাব তথা রাজকীয় বিদ্যালয় প্রভৃতিতে তাহা প্রচলিত করণের আবশ্যকতা, ইত্যাদি বর্ণিত হইল।

১। দৈহিক বলপ্রাচুর্য্যের প্রয়োজন

এতদ্দেশীয় কোন প্রাচীন গ্রন্থকার কহেন, "বলং বলং বাহুবলং নচ অন্যবলং বলং"— যদিও অধুনা এবাক্য বাহুবল প্রশংসার অত্যুক্তি বলিয়া গণনীয় ফলতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবেক যে মনুষ্য-মণ্ডলীর সভ্যতা, ভব্যতা, আচার, ব্যবহার, পৌরুষ, পরাক্রম প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় সম্বন্ধে বাহুবলেরই অতিমাত্র প্রাধান্য সপ্রমাণ হয়। ধরাতলে যে সকল জাতি প্রভুত্ব-প্রতিভা লব্ধ হইয়াছিলেন বা হইয়াছেন, তাঁহারা মানসিক বলাধান পূর্ব্বে বাহুবেলের নিমিত্তই প্রসিদ্ধ ছিলেন ;—বাহুবলের ফলোৎপত্তিরূপ রাজ্যবৃদ্ধি প্রভৃতি সৌষ্ঠব লাভ পরে শান্তি সূচক কার্য্যের প্রয়োজন মতে মানসিক বলের ক্রমশঃ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ভারতবর্ষে যে কালে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ক্ষত্রিয়কুলজ বিপুল-বলবিক্রম সম্পন্ন বীরগণ বাহু-বলে দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি ভয়ানক অসভ্যজাতিপূর্ণ দেশসমূহ স্বকরতলে আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং গ্রীস্ দেশে যৎকালে প্রবলপরাক্রান্ত পিলাস্‌গি ও হেলিনিক জাতিরা নানা দেশাধিকার পূর্ব্বক বসতি করিয়াছিলেন—তথা জগজ্জিরি রোমানদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যৎকালে মৃন্ময় প্রাকার পরিবেষ্টিত নগরী আশ্রয় পূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তি রাজ্যানিকরের প্রতি যথেচ্ছাচার প্রচার করিয়াছিলেন,—সেসময়ে তাঁহাদিগের একমাত্র বাহুবলেরই প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয়, সেসময়ে মানসিক পরাক্রম-প্রাচুর্য্যের কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না।—তদনন্তর দৈহিক ও মানসিক উভয় প্রকার বলের সহকারিতায় তাঁহারা এককালে ধরাধামে একাধিপত্য সংস্থাপন পূর্ব্বক সর্ব্ববিষয়ে ধন্য মান্য রূপে গণনীয় হইয়াছিলেন। কিন্তু স্মরণ করিতে অন্তর্বাষ্পে কণ্ঠাবরোধ করে, এই দৈহিক বল-প্রাধান্যে মানসিক বলের অনেক হানি সম্ভাবিত হয়। ফলত দৈহিক এবং মানসিক বলের সমতা থাকিলেই শুভোৎপত্তির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ; রাম লক্ষ্মণের সময়ে বশিষ্ঠ, ভীমার্জ্জুনের সময়ে ব্যাস, ফিলিপের সময়ে অরিষ্টতল এবং কৈসরের* সময়ে সিসিরো প্রভৃতি মহাত্মাগণ স্ব স্ব জন্মভূমির পরম গৌরবের নিমিত্তই জন্মিয়াছিলেন। যখন যেজাতির মধ্যে মানসিক বলের অপ্রাধান্য হইয়াছে, তখন যদ্যপি শারীরিক বলের প্রাধান্য হয় তবে আর অমঙ্গলের অবশেষ থাকে না ; বাহুবল-গর্ব্বিত দুষ্টেরা জন্মভূমির মুখোজ্জ্বলকারি মহানুভবদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত লইয়া ক্ষান্ত হইয়াছে। যদিও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ সর্ব্বদেশের পুরাবৃত্তে প্রাপ্তব্য, তথাপি আথিনী দেশে ত্রিংশৎ সংখ্যক নির্দ্দয় রাজপুরুষদিগের অত্যাচার কালে মহাত্মা সক্রেটিসের প্রাণদণ্ডই এক প্রধান দৃষ্টান্ত স্বরূপ : উক্ত

*Caesar শব্দের আরবী উচ্চারণ।

জানিবরের দোষ এই যে তিনি মনুষ্যকে মানসিক বলে বলী করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তথাহি ;—

The Godlike crime was to be kind
To render with thy Precepts less
The sum of human wre tchedness,
And strengthen man with his own mind".

[BYRON'S PROMETHEUS]

তব দেববৎ দোষ দয়া আচরণ।
মানুষের তাপ তম হরণ কারণ ৷৷
আর তারে চিত্তবলে করিবারে বলী।
বলিতে বিজ্ঞানময়ী বচন আবলী ৷৷

পক্ষান্তরে যে জাতি শারীরিক বলে অপটু এবং কোন কোন মানসিক বলের প্রাচুর্যের জন্য প্রসিদ্ধ, সে জাতি জাতিমধ্যেই গণনীয় নহে,—তাহাদিগের মধ্যে একতা সঞ্চারের সম্ভাবনা নাই,—দেশানুরাগ ব্রতে তাহাদিগের কোনরূপেই আন্তরিক প্রগাঢ় স্পৃহা জন্মে না, দৈহিক বলবিহীনতা ও ভীরুতা বশতঃ প্রবঞ্চনা, প্রতারণা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি কণ্টকজালে তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্র সমাকীর্ণ হয়। একটা প্রধান জাতির লক্ষণ এইসকল ;—তাহাদিগের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, প্রকৃতি প্রভৃতির একতা, স্বদেশ হিতব্রতে একাগ্রতা, পরজাতি কর্ত্তৃক অপমান প্রাপ্তে অসহিষ্ণুতা এবং সেই অপমান প্রতিশোধনার্থ প্রাণপণে প্রযত্নপরতা।—কিন্তু দৈহিক বলের অসম্ভাবে এসকল পুরুষার্থ লাভের সম্ভাবনা কি ? সুতরাং অনৈক্যপরায়ণ, ভীরুস্বভাব, পরাপমানগ্রস্ত, উদ্যোগবিহীন জাতিকে জাতিমধ্যে গণনা করাই অকর্ত্তব্য ; যেখানে পশুপক্ষি প্রভৃতি ইতর প্রাণিগণ স্ব স্ব দলের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে একতা প্রদর্শন করিতেছে, সেখানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণিমনুষ্য মণ্ডলী মধ্যে যদ্যপি কোন জাতি দৈহিক বলহীনতা বশতঃ একতা-শূন্য হয়, তবে তাহাদিগকে উক্ত ইতর প্রাণিদিগের অপেক্ষাও অধমকল্প জ্ঞান করিতে হইবেক।

এতএব এতদ্দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে দৈহিক এবং মানসিক বলের সামঞ্জস্যই মনুষ্যজাতির সুখ বৃদ্ধির নিদান হইয়াছে,—একের অভাব এবং অন্যের প্রাদুর্ভাব হইলে বিপরীত ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা। এতাবতা মনুষ্যজাতির পুরুষার্থ কল্পে দৈহিক এবং মানসিক বলের সমান সহকারিতাই আবশ্যক।

অপিচ বিগ্রহ, বাণিজ্য, এবং কৃষিকার্য্য প্রভৃতি কার্য্য মনুষ্যজাতির খ্যাতি প্রতিপত্তির নিদান হইয়াছে, এতাবৎকেই মনুষ্যের প্রকৃত পুরুষার্থ

কহা যায়। পুরাকালে রোমানেরা বিগ্রহ হেতু,—টায়রীয় বা সুরীয় লোকেরা বাণিজ্য হেতু,—এবং ভারতবর্ষীয় তথা মিসরীয় লোকেরা কৃষিকার্য্য হেতু প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন,—কিন্তু এতাবৎ বৃত্তিতেই বাহুবলের বিশিষ্ট প্রয়োজন আছে। বিগ্রহপ্রিয় জাতিদিগের লক্ষণ; তাহারা সরল-হৃদয়, উদার, ন্যায়পথাবলম্বি, গৌরবেচ্ছু, দুর্দ্ধর্ষ, স্বদেশহিতৈষি, প্রতিহিংসা-পরায়ণ এবং উগ্রমূর্ত্তি। বাণিজ্যপ্রিয় জাতিদিগের লক্ষণ তাহারা দেশপ্রকাশাদি মহতী মহতী কীর্ত্তির সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি,—বিশিষ্ট রূপ সাহস ও উৎসাহ সম্পন্ন,—শিল্প বিজ্ঞানাদি নানা হিতকর বিষয়ের উন্নতি বিধায়ক, স্বদেশীয় বিধি ব্যবস্থাদির যথাবৎ মর্ম্ম-পালনে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিতর্কপরায়ণ,—আচার ব্যবহারের বিশুদ্ধতা নির্ণায়ক,—এবং মিতাচারপ্রিয়। কৃষিকার্য্যাসক্ত জাতিদিগের লক্ষণ; তাহারা শান্তি রসাভিষিক্ত, আতিথ্যাদি ধর্ম্মানুরক্ত, কাব্য সাহিত্য দর্শনাদি শাস্ত্রের উৎকর্ষ সম্পাদক এবং বহ্বাশাবিহীন। যদিও উল্লেখিত প্রাচীন জাতিদিগের মধ্যে বিগ্রহ, বাণিজ্য এবং কৃষি কার্য্যাদি সর্ব্বপ্রকার বৃত্তিরই ন্যূনাতিরেক প্রাদুর্ভাব থাকুক কিন্তু তাহারা যে যে বিশিষ্ট বৃত্তির নিমিত্ত ধরাতলে গণনীয় হইয়াছিলেন সেই বৃত্তিকেই তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষণ রূপে নির্দ্দিষ্ট করা গেল।

পুরাকালে উল্লেখিত নানা বৃত্তির মধ্যে একমাত্র বৃত্তির প্রাধান্য থাকিলেই সেই জাতি প্রধান পদবীতে গণনীয় হইতেন, কিন্তু এইক্ষণে আর সেকাল নেই, অধুনা কোন জাতি দুই তিন বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা না রাখিতে পারিলে প্রাধান্যের অভিমান করিতে পারেন না;—ইংলণ্ড, আমেরিকা, এবং ফ্রান্স প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজ্য, বিগ্রহ বাণিজ্য কৃষিকার্য্যাদি সকল বিষয়েই প্রাদুর্ভাব রাখাতে মহতী গরিমার আস্পদ হইয়াছেন;—ওলন্দাজ ও চীন প্রভৃতি দেশীয়েরা একমাত্র বাণিজ্যবৃত্তিতে গণনীয় হইলেও শ্রেষ্ঠজাতিদিগের সহিত সমানাস্পর্দ্ধা রাখিতে পারেন না। অতএব বাঙ্গালি জাতির হিতৈষিগণ বিবেচনা করুন,—যেখানে বাঙ্গালিরা উক্ত সমুদায় পুরুষার্থের প্রতিপাদক বাহুবল বিষয়ে সম্পূর্ণ নিকৃষ্টকল্প, সেখানে তাঁহাদিগের পুনরুদ্ধার কল্পে শরীর-সাধনী বিদ্যাশিক্ষার কতদূর পর্য্যন্ত আবশ্যকতা আছে।

পরন্তু ইহাও সত্য বটে, দেশ কাল পাত্রের অবস্থা ভেদে বাহুবলের ন্যূনাতিশয্য হইয়া থাকে, যে সকল দেশে আতপতাপের নিরতিশয় প্রাখর্য্য, অশন বসনাদি জীবধারণোপযোগি দ্রব্যাদির সৌলভ্য,—ফল, মূল, ওষধিতে ক্ষুধার নিবারণ ও কূপ, তড়াগ, নির্ঝরাদির নির্ম্মল রজতসন্নিভ বারিতে পিপাসার শান্তি হয়, সে সকল দেশে নৈসর্গিক বিড়ম্বনা হেতু বাহুবলবৃদ্ধির কথঞ্চিৎ বিঘ্ন আছে। কিন্তু যেসকল দেশে হেমন্তের ঘোরতর প্রাদুর্ভাব, জীবিকা সংস্থানে আয়াস ও পরিশ্রমের বিশিষ্ট আবশ্যকতা, এবং জঠরাগ্নির

দাবদহনবৎ তীক্ষ্নতা বশত মাংসাদন ও সমীরণের শৈত্য গুণাতিশয্যে মদিরা পানই ব্যবস্থা,—সেসকল দেশের লোকেরা স্বভাবতই শারীরিক বলবিশিষ্ট হইয়া থাকেন এবং সেই বলবৃদ্ধি করাই তাঁহাদিগের একটা প্রধান সংকল্প হইয়া পড়ে, সেসকল দেশীয় মনুষ্যেরা উষ্ণাতিশয় দেশবাসিদিগের ন্যায় ভোগ সুখানুরক্ত নহেন, তথায় শরীর ক্ষয়কারী ইতরেন্দ্রিয়সমূহ তরুণ বয়সে তেজস্বি হয় না, সুতরাং যৌবনের নিতান্ত অচিরতা এবং জরার অকালাধিকার প্রায়ই নাই। জীবিকাসুলভ উষ্ণাতিশয় দেশে বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, প্রভৃতি দেহভঙ্গকর কুপ্রথা প্রাবল্যের অবধি নাই, কিন্তু জীবিকা-দুর্লভ হিমাতিশয় দেশে তদ্বিপরীতে পরিপক্ব যৌবন অথবা প্রৌঢ়াবস্থায় একমাত্র বিবাহ করাই প্রসিদ্ধ, তথায় জীবিকা সংস্থানে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত কেহ পরিণয়পাশে বদ্ধ হন না। উষ্ণাতিশয় দেশবাসিরা নৃত্য, গীত, বাদ্য, ভাণ্ড প্রভৃতির আমোদেই আমোদিত হয়েন ; কিন্তু হিমপ্রধান দেশে মৃগয়া, মল্লযুদ্ধ, জলক্রীড়া, অস্ত্র প্রদর্শনাদিই আমোদ মধ্যে পরিগণিত,—প্রত্যুত, উষ্ণাতিশয় দেশবাসিদিগের আমোদ প্রমোদ শ্রুতি নয়নাদি বহিরিন্দ্রিয়ের অনুরঞ্জনা মাত্র, হিমাতিশয় দেশীয় লোকেরা ঔৎসুক্য, উৎসাহ, সাহস, বীর্য্য, ধৈর্য্যাদির চরিতার্থতা জনিত মানসিক সুখকেই আমোদ জ্ঞান করিয়া থাকেন।

কিন্তু উপরিউক্ত উক্তি পাঠে এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে যে উষ্ণাতিশয় দেশবাসিরা দৈহিকবলে প্রাধান্যলাভ করিবেন এমত সম্ভাবনা নাই, বরং তদ্বিপরীতে ইহাই বলা উচিত যে তাহা প্রাপণের পক্ষে কোন লৌকিক প্রতিবন্ধকতা নাই।—তাঁহাদিগের সন্তান প্রতিপালন প্রণালী পরিশোধিত হইলে সমূহ উপকার লাভের সম্ভাবনা,—ইহার এক প্রধান লক্ষ্যের স্থল এই ভারতবর্ষ ; এই দেশে এক সময়ে লোকদিগের বাহুবলের প্রাধান্য বিষয়ে যেসকল কাব্য পুরাণাদির বর্ণনা পাঠ করা যায়,—তত্তাবৎ সম্পূর্ণরূপে অলীক নহে।—তৎকালীন বলপ্রাচুর্য্যের হেতু অন্বেষণ করিয়া দেখিলেই সপ্রমাণ হইবেক যে তাঁহাদিগের সন্তানপালন প্রণালী এক্ষণকার হিন্দুদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে সংশুদ্ধ ছিল, অতএব দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ অনুমোদন করা যাইতেছে।

২। প্রাচীন সাময়িক হিন্দুদিগের মধ্যে ব্যায়াম চর্চ্চা

পুরাকালে উষ্ণাতিশয় দেশবাসিদিগের বাহুবল বিস্তরণের সম্যগ্রূপ স্পৃহা না থাকায় এক বিশিষ্ট কারণ এই যে সেসময়ে তাঁহাদিগের উপর হিমপ্রধান দেশবাসিদিগের পরাক্রম প্রচার ছিল না। স্নিগ্ধ দেশবাসিরা উষ্ণদেশাক্রমণ কল্পে

সঙ্কুচিত হইতেন, তাঁহারা আতপতাপ-শঙ্কায় উষ্ণদেশকে যমপুরী স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। পূর্ব্বতনকালে ইয়ুরোপীয়েরা পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্ত* অতিক্রম করিলে সূর্য্যকিরণে দগ্ধদেহ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয়, এরূপ অযৌক্তিক ভাণে বিশ্বাস রাখিতেন;—গ্রীক্ অর্থাৎ যবন মহানুপদ বিখ্যাত ভূপাল সেকান্দর শাহ শতদ্রুতীরে সমাগত হইলে তাঁহার সৈন্যদল বিকল হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন অভিলাষে উক্ত বীরচূড়ামণির অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এইক্ষণে আর সেকাল নাই, সেই স্নিগ্ধদেশীয় ঘোরতর বলবীর্য্য সাহস সম্পন্ন বজ্রদেহি বীরপুরুষেরা উক্ত প্রকার অযৌক্তিক ভাণ পরিহার পূর্ব্বক উষ্ণাতিশয় দেশাধিকারে অতিমাত্র লোলুপ উঠিয়াছেন,— ভোগাসক্তির প্রাবল্য এবং প্রজা সংখ্যার বাহুল্য বশতঃ তাঁহারা স্বল্পশস্য শালিনী জন্মভূমিতে বদ্ধ না থাকিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া নানা দেশ স্বকরতলে আনিতেছেন। ভারতবর্ষে সেকন্দর শাহ্, জাঙ্গিজ খাঁ এবং তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতি বীরদিগের আগমন,—কলম্বস কর্ত্তৃক নব ভূখণ্ড আবিষ্করণ,—বাস্কো-ডি-গামার নিরক্ষ অতিক্রমণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ঘটনা সকল সেই অধিকার বৃদ্ধি সংকল্পের সুসিদ্ধতা মাত্র। যেরূপ দাড়িম্ব বীজ নিকরের পুষ্টিবৃদ্ধি হইলে বীজকোষ বিদারণ পূর্ব্বক স্বতই তত্তাবৎ বিনির্গত হইয়া পড়ে, সেইরূপ স্নিগ্ধ দেশীয় লোকেদের পরিপুষ্ট বলবীর্য্য তাহাদিগের জন্মভূমি স্বরূপ নেমী মধ্যে বদ্ধ না থাকিয়া নানা দিগ্‌দিগন্তরে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল।

কোন কোন স্থলে কারণান্তর হেতুও এই অধিকার বৃদ্ধির লালসা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে;—যে সকল জাতি পূর্ব্বে সভ্য জাতিদিগের নিকট অসভ্যপদে বাচ্য থাকিয়া ঘৃণাস্পদ ছিল, কালক্রমে তাহারা সেই ঘৃণাস্ত্রের শাণিত ধারানুভব করিয়া একেবারে উগ্রচণ্ড ভাব ধারণ করিয়া উঠিল,—তখন সেই সুপ্তোত্থিত ব্যাঘ্রস্বরূপ দোর্দ্দণ্ড জাতির প্রচণ্ড কোপে পতিত হইয়া শৃগালবৃত্তি সভ্য নামাভিমানিদিগের নিস্তার পাইবার আর উপায় মাত্র থাকিল না। এই সকল কারণেই সুপ্রাচীন ভারতবর্ষীয় প্রজাপূর্ণ প্রদেশ-সমূহ এককালে স্বাধীনতা পরিচ্যুত হইয়াছে।

পরন্তু আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি হিন্দুরা স্বভাবতঃ সমরাসক্ত জাতি নহেন,—যেহেতু সংগ্রামে আনুরক্ত হইবার যে সকল হেতু আছে সেই সকল হেতুচক্রে তাঁহারা বদ্ধ ছিলেন না। রত্নগর্ভা শস্যপ্রসূ ভারতভূমির কল্যাণে তাঁহাদিগের পরদেশাধিকারের প্রয়োজন মাত্র ছিল না; তাঁহাদিগের মধ্যে যেসকল বিগ্রহ উপস্থিত হইত, তত্তাবৎকে একপ্রকার গৃহবিচ্ছেদ

* পৃথিবীর পূর্ব পশ্চিমে কল্পিত মধ্যরেখার নাম।

বলিলেই হয় ; মহাভারতে বর্ণিত মহাযুদ্ধের ব্যাপার জ্ঞাতিবিরোধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সংগ্রামানুরক্তির দ্বিতীয় হেতু পরজাতি কর্ত্তৃক পীড়াপ্রাপ্তি ; —প্রত্যুত, অতি পুরাকালে অন্য কোন জাতি সিন্ধুনদ পারে আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করণে সাহসী হয় নাই, সুতরাং তৎকালের হিন্দুদিগকেও বিশিষ্টরূপে সমরানুরক্ত হইতে হয় নাই। যেসময়ে মুসলমানেরা আর্য্যাবর্ত্তে প্রবিষ্ট হয়, সেসময়ে ভোগাসক্তি বশতঃ হিন্দুরা তেজোবিহীন হইয়াছিলেন সুতরাং সহজেই চিরসঞ্চিত স্বাধীনতা সুখে বঞ্চিত হয়েন। সংগ্রামানুরক্তির অপর কারণ স্বদেশ-হিতৈষিতা ; ইউরোপীয় লোকেরা দেশহিতৈষিতা পদের যে অর্থ করেন, প্রাচীন হিন্দুরা তদর্থের মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন না ; ইয়ুরোপীয়েরা যেরূপ রাজার প্রতি বিশিষ্ট বিশিষ্ট ক্ষমতা প্রদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ রাজশক্তির অনধীন আপনাদিগের নিমিত্তও অনেকানেক ক্ষমতা রক্ষা করেন, সেই স্বতন্ত্রতা রক্ষণার্থ একতার প্রয়োজন হয়, সুতরাং প্রজায় প্রজায় ভ্রাতৃ সম্বন্ধ নিবন্ধ থাকিবাতে জন্মভূমির প্রতি মাতৃভক্তিবৎ প্রগাঢ় প্রীতি সঞ্চারিত হইয়া উঠে, সেই প্রীতির এমনি ক্রম, যে তৎপালনের কালোপস্থিত হইলে স্বার্থ-পরতা প্রভৃতি ইতর বৃত্তি কোনরূপেই মনোমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু, প্রাচীনকালের হিন্দুদিগের স্বদেশ-হিতৈষিতা-ধর্ম্ম ভিন্ন প্রকার ছিল,—তাঁহাদিগের যে কিছু প্রীতি, তাহা, যে গ্রামে বা যে বাটীতে জন্মগ্রহণ করিতেন এবং যে ক্ষেত্র হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, তন্মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত ; তাঁহারা স্বর্গাপেক্ষা জন্মভূমির যে গরিমা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা কিছু নিখিল ভারতবর্ষ বা তদন্তঃপাতি দেশ-বিশেষের প্রতি লক্ষিত নহে,—স্বীয় স্বীয় পিতৃপরিত্যক্ত ভূমির প্রতিই তাহার প্রয়োগ প্রসিদ্ধি মাত্র। রাজকীয় বিষয়ে ভূপতির স্বেচ্ছাচারের দাসত্ব করাই তাঁহাদিগের একমাত্র সম্বন্ধ ছিল, এনিমিত্তে তাঁহাদিগের দেশে পূর্ব্বে যত যত যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইত, তাহাতে দেশীয় লোকেরা স্বদেশ হিতার্থে অথবা আপনাদিগের স্বাধীনতা সুখ রক্ষণার্থে প্রবৃত্ত না হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রভুর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন মানসে বা বিলুণ্ঠিত ধনাদির প্রত্যাশায় প্রবৃত্ত হইতেন। এইজন্যই ভারতবর্ষ-অধিকার-কালে মুসলমানদিগকে অধিকতর ক্লেশ পাইতে হয় নাই। বিপক্ষ-পক্ষের জয়লাভ হইলেই সাধারণ প্রজা মণ্ডলী তদ্বিরুদ্ধে গাত্রোত্থান না করিয়া অনায়াসে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিধান করিতেন। যেরূপ ভূমিকম্প বা ঘূর্ণাবায়ুর বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চালন করা ব্যর্থ বিবেচ্য হয়, তাহারা সংগ্রাম-বিজেতাদিগকেও তদ্রূপ অদম্য এবং দুর্নিবার্য্য বিবেচনা করিতেন, এবং মনুষ্যের সমুদায় পুরুষার্থ ভ্রষ্টকারী একাধিপত্যেরই সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠতা মান্য করিতেন। প্রত্যুত, পূর্ব্বতন কালের হিন্দুদিগের এবম্প্রকার ভাব প্রভাব তাঁহাদিগের আচরিত ধর্ম্ম হইতেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। আদৌ, তাঁহাদিগের উপাসনার লক্ষই অশমনীয় শক্তি ; সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র,

আকাশ, বায়ু, জল প্রভৃতি নৈসর্গিক পদার্থনিকরের এক এক প্রকার অতুল্য শক্তি প্রত্যক্ষ-গোচর হইবাতে সেই সকলই তাঁহাদিগের উপাস্য হইয়াছিল, অতএব রাজ্যাধিপতি বা যুদ্ধজেতার শক্তির নিকট তাঁহারা অশ্ববৎ অধীনতা স্বীকার করিবেন ইহাতে আশ্চর্য কি? তাঁহাদিগের আদিধর্ম্মপ্রবোজক মনুমহাত্মা রাজশক্তির গৌরব প্রতিপাদনার্থে স্তাবকতার কিঞ্চিন্মাত্র অবশেষ রাখিয়া যান নাই,—তিনি রাজশক্তিকে ইন্দ্র অর্থাৎ আকাশ, অনিল অর্থাৎ পবন, যম অর্থাৎ মৃত্যু, বরুণ অর্থাৎ জল, তথা চন্দ্র এবং ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবতার মাত্রানিকরে* সৃষ্ট বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

পরন্তু, পূর্ব্বতনকালে হিন্দুজাতি, প্রাচীন বা আধুনিক ইয়ুরোপীয়দিগের ন্যায় বিগ্রহ রসানুরক্ত না থাকিলেও তাঁহারা যে শৈশব কালাবধি সন্তানদিগকে সুবীর্য্যবন্ত ও সাহসসম্পন্ন করণার্থে সুশিক্ষা প্রদান করিতেন, এবং তাঁহারা তদ্বিষয়ে যে আধুনিক হিন্দুদিগের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন—তাহার ভূরিভূরি প্রমাণপুঞ্জ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদিও "ক্ষত্রিয়ানাং বলং তেজো ব্রাহ্মণাণাং ক্ষমা বলং" প্রভৃতি বাক্য হিন্দুদিগের মধ্যে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু তৎকালে ব্রাহ্মণ সন্তানেরা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক যখন বিদ্যাশিক্ষা করিতেন তখন তাঁহারা কার্য্যত যেরূপ ব্যায়ামচর্চার অধীন হইয়া বলবিশিষ্ট ও ক্লেশসহিষ্ণু তথা সাহসপরায়ণ হইতেন, এইক্ষণকার কলেজ প্রভৃতি প্রধান পৰবীস্থ বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রেরা তদ্রূপ নিয়মাধীনে বিদ্যাভ্যাস করিলে অনেক উপকার দর্শিতে পারে। ব্রাহ্মণ নন্দনেরা অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্নান ও গাত্র মার্জ্জনাদি দ্বারা পবিত্রদেহ হইতেন**, সর্ব্বদা আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন,—স্থূলবাস পরিধান এবং ফলমূল শস্যাদি আহরণপূর্ব্বক ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া সন্তোষচিত্তে কালহরণ

* ইন্দ্রানিলযমার্কাণ মগ্নেশ্চ বরুণস্যচ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতী। ৪।
যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাম্মাত্রাভ্যো নিম্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা। ৫।
তপত্যাদিত্যবচ্চৈষ চক্ষূংষি চ মনাংসি চ।
নচৈনম্ভুবি শক্নোতি কশ্চিদপ্যভি বীক্ষিতুম্। ৬।
সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ সমহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ। ৭।
ইতি মানবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তমাধ্যায়ে।

** ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থৌচানু চিন্তয়েৎ।
কায়ক্লেশাংশ্চ তন্মূলান্ বেদতত্ত্বার্থমেবচ। ৯২।
শয়ানঃ প্রৌঢ়পাদশ্চ কৃত্বাচৈবাবসক্থিকাম্।
নাধীয়ীতা মিষং জগ্ধ্বা সূতকান্নাদ্যমেবচ। ১১২।
ইত্যাদি। মানবে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থাধ্যায়ে

করিতেন, তাঁহাদিগের পবিত্র মানসাকাশ কুপ্রবৃত্তিরূপ মেঘে আচ্ছন্ন হইতে পারিত না। অপিচ ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধ-ব্যবসায়ি না হইলেও তাঁহারা রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত বীরাগ্রগণ্য রাজন্যবর্গের ব্যায়ামবিদ্যা ও ধনুর্বেদের শিক্ষাগুরু ছিলেন; বশিষ্ঠ রাম লক্ষ্মণের, এবং দ্রোণাচার্য্য কৌরব কুমারদিগের, অস্ত্র ও মল্ল মৃগয়াদি বিবিধ বিদ্যার শিক্ষক ছিলেন।

শিক্ষারম্ভে তাঁহারা মৃগয়া * মল্লযুদ্ধ, জলক্রীড়া † এবং অস্ত্রপ্রদর্শন প্রভৃতি

* বামশ্চাপধরোনিত্যং তূণীবাণান্বিত প্রভুঃ।
অশ্বারূঢ়ো বনংযাতি মৃগয়ার্থৈ সলক্ষ্মণঃ॥
হত্বাতুষ্টমৃগান্ বন্যান্ পিত্রে সর্ব্বংন্যবেদযৎ।
বন্ধুভিঃ সহিতোনিত্যং ভুক্ত্বা মুনিভিরন্বহং॥
ইতি অধ্যাত্মরামায়ণে বালকাণ্ডে তৃতীয় সর্গে।
অপিতু।
অথ দ্রোণাভ্যনুজ্ঞাতাঃ কদাচিৎ কুরুপাণ্ডবাঃ।
রথৈ র্বিনির্যযুঃ সর্ব্বে মৃগযা ম রমর্দ্দন॥
তত্রোপকরণং গৃহ্য নরঃ কশ্চিদ্যদৃচ্ছয়া।
রাজন্ননু জগামৈকঃ শ্বানমাদায় পাণ্ডবান্॥
ইতি মহাভারতে আদিপর্ব্বে সম্ভবপর্ব্বে।

† কস্যচিৎ ত্বথকালস্য সশিষ্যোহঙ্গিরসাংবরঃ।
জগাম গঙ্গামভিতো মজ্জিতুং ভরতর্ষভ॥
দশবালান্ জলে ক্রীড়ন্ ভুজাভ্যাং পরিগৃহ্যসঃ।
অন্তেস্ম সলিলে মগ্নো মৃতকল্পান্ বিমুক্তি॥

ততো জলবিহারার্থং কারয়ামাস ভারত।
চৈলকম্বলবেশ্মানি বিচিত্রাণি মহান্তিচ॥
তত্র সঞ্জনয়ামাস নানাগারাণ্যনেকশঃ॥
উদক ক্রীডনং নাম কারয়ামাস ভারত।

প্রমাণকোট্যাং তং দেশং স্থলং কিঞ্চিদুপেত্যহ॥ ১॥
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ চোষ্যং লেহ্য মথাপিচ।
উৎপাদিতং নরৈস্তত্র কুশলৈঃ সূদকর্ম্মণি॥

* * *

গঙ্গাকৈবানুযাস্যাম উদ্যানবনশোভিতাং।
সহিতা ভ্রাতরঃ সর্ব্বে জলক্রীড়া মবাপ্নুমঃ।

* * *

ততস্তে সহিতাঃ সর্ব্বে জলক্রীড়া মকুর্ব্বত।
পাণ্ডবা ধার্ত্তরাষ্ট্রাশ্চ তদা মুদিতমানসাঃ॥
ক্রীড়াবসানে তে সর্ব্বে শুচিবস্ত্রাঃ স্বলঙ্কৃতা।
দিবসান্তে পরিশ্রান্তা বিহৃত্যাচ কুরূদ্বহাঃ॥
ইতি মহাভারতে আদিপর্ব্বে সম্ভবপর্ব্বে।

ব্যায়ামে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিয়া বাহুবল বৃদ্ধি করিতেন। সেসমুদায়, তাঁহাদিগের বাল্যক্রীড়ার মধ্যে গণনীয় ছিল, এবং তদ্দ্বারা যে বিশিষ্টরূপ তেজের উৎপত্তি হইত তাহা বিলক্ষণরূপেই জানিতেন, যথা ;—'বালক্রীড়াসু সর্ব্বাসু বিশিষ্টা স্তেজসাঽভবন্" ।—ক্ষত্রিয় সন্তানেরা ষড়্‌বর্ষ বয়ক্রমেই এইসকল শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইতেন, যথা—"ব্রহ্মবর্চ্চস কামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে। রাজ্ঞো বলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনোঽষ্টমে"। ইতি মানবে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমাধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকঃ। রাজপুত্রেরা উক্ত প্রকার ব্যায়াম ব্যতীত রথে, গজে, অশ্বে, বা ভূমিতলে যেরূপ নিয়মে যুদ্ধ করিতে হয় তাহা এবং গদাযুদ্ধ, অসিচর্য্যা, তোমর প্রাস শক্তি প্রভৃতি অশেষ প্রকার অস্ত্র সঞ্চালন শিক্ষা করিতেন।[১] তাঁহাদিগের ব্যায়াম বিদ্যা শিক্ষাকালে দিগ্‌দিগন্তর হইতে রাজা ও রাজপুত্রগণ তদ্দর্শনার্থ সমাগত হইতেন।[২] তদনন্তর সুন্দররূপে শিক্ষিত হইলে প্রত্যেক রাজ কুমারের বলবীর্য্য সাহসাদির পরীক্ষা নিমিত্ত বৃক্ষ গুল্মাদি বর্জ্জিত একটা প্রকাশ্যস্থলে রঙ্গভূমি প্রস্তুত হইত। তন্মধ্যস্থিত বলিচক্রে ক্ষত্রিয় সন্তানেরা স্বীয় স্বীয় বিক্রম ও বিবিধ প্রকার রণপাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতেন ; সেই সময়ে চতুর্দ্দিগে সুশোভিত প্রেক্ষাগার সমূহে রাজন্যবর্গ ও দর্শকশ্রেণী উপবিষ্ট হইয়া দর্শনসুখে সুখি হইতেন[৩]। অপিচ তৎকালের কুলস্ত্রীগণ এক্ষণকার হিন্দুকামিনী দিগের ন্যায় কারারুদ্ধাবস্থায় বদ্ধ থাকিতেন না,—এ প্রকার উৎসাহপূর্ণ প্রদর্শন সময়ে তাঁহারা রথ অথবা মঞ্চোপরি পতির বামভাগে কিম্বা বয়স্যাদিগের সহিত উপবেশন পূর্ব্বক পরীক্ষাপ্রদায়িদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেন।* মহাভারতাদি গ্রন্থে উক্ত প্রকার বর্ণনপাঠ কালে বোধ হয় যেন ৩।৪ শত বৎসর পূর্ব্বে ইয়ুরোপীয় বীরপুরুষদিগের টিলট ও তুর্ণেমেণ্ট নামক

১ ততো দ্রোণোঽর্জ্জুনং ভূয়ো রথেষু চ গজেষু চ
রথেষু ভূমাবপি চ রণশিক্ষা মশিক্ষয়ৎ॥
গদাযুদ্ধেঽসিচর্য্যায়াং তোমরপ্রাসশক্তিষু
দ্রোণঃ সঙ্কীর্ণযুদ্ধে চ শিক্ষয়ামাস কৌরবান। ইত্যাদি।

২. ততস্তৎকৌশলং শ্রুত্বা ধনুর্ব্বেদজিঘৃক্ষবঃ
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ সমাজগ্মুঃ সহস্রশ॥ ইত্যাদি।

৩ সমা মবৃক্ষাং নিগুল্মাং মুদক্‌প্রস্রবণান্বিতাং।
তস্যাং ভূমৌ বলিং চক্রে তিথৌ নক্ষত্রপূজিতে॥
প্রেক্ষাগারং সুবিহিতং চক্রুস্তে তস্য শিল্পিনঃ।
রাজ্ঞঃ সর্ব্বায়ুধোপেতং স্ত্রীণাঞ্চৈব নরর্ষভ॥ ইত্যাদি

* গান্ধারী চ মহাভাগা কুন্তী চ জয়তাংবর।
স্ত্রিয়শ্চ রাজ্ঞঃ সর্ব্বাস্তাঃ সপ্রেষ্যাঃ সপরিচ্ছদাঃ।
হর্ষা দারুরুহুর্ম্মঞ্চান্মেরুং দেবস্ত্রিয়ো যথা ইত্যাদি। ইতি
মহাভারতে আদিপর্ব্বে সম্ভবপর্ব্বে।

অস্ত্র-প্রদর্শন বিবরণ নয়ন-গোচর করিতেছি। হায়! ভারতবর্ষের এইক্ষণে আর সেদিন কোথায়? এ দুরবস্থার সময়েএই প্রশ্ন করিলে তাহার প্রতিধ্বনিমাত্র শ্রুতি-কুহরে পুনঃ প্রবিষ্ট হয়!—সেসময়ে বাহুবলের এরূপ গৌরব ছিল যে অনুপমা রূপলাবণ্যবতী গুণবতী রাজনন্দিনীরা শৌর্য্যবীর্য্য গুণোপেত পুরুষদিগকেই মাল্যপ্রদান করিতেন, জানকী ও দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর বিবরণ পাঠে মনোমধ্যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দোদয় হইতে থাকে।

অনন্তর ক্ষত্রিয়সন্তানেরা দেশান্তরে বা তীর্থ দর্শনে প্রেরিত হইয়া বিশিষ্টরূপে শ্রম এবং ক্লেশসহিষ্ণু হইতেন, রামলক্ষ্মণের বিশ্বামিত্র সহ দেশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কি অপূর্ব্ব ভাবে চিত্ত প্রফুল্ল হইতে থাকে। এই-কালে রাজন্যপুত্রেরা দেশমধ্যে কোন প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইলে তাহাতে স্ব স্ব রণপাণ্ডিত্য এবং সাহস প্রদর্শনের বিলক্ষণ উপযোগিতা প্রাপ্ত হইতেন, তাহাতেও তাঁহাদিগের শারীরিক ও মানসিক তেজের প্রভূত পরাক্রম বৃদ্ধি পাইত।—হিন্দু অথবা আর্য্য * জাতির প্রাদুর্ভাব হইলে পর ভারতবর্ষের আদিনিবাসি ভীল কোল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা অত্যন্ত উৎপাত করিত। তাহারা সেসময়ে নরমাংসাশি ছিল, তজ্জন্যই তাহারা সেকালে রাক্ষসরূপে বর্ণিত হইয়াছে;—সেই সকল পিঙ্গলাক্ষ, দারুণাকৃতি, দন্তবিকট করাল বদন অসভ্যেরা পিশিতেস্সায় লোলুপ হইয়া নগরান্তরালে বা ঋষ্যাশ্রম সমূহে মহা-উৎপাত করিত, তাহারা যজ্ঞাদিতে ঘোরতর বিঘ্নোপস্থিত করিয়া তাহাদিগের মাতৃভূমির হরণকারি হিন্দুদিগের প্রতি প্রতিহিংসা ঋণ পরিশোধ করিত,—ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণে অক্ষম বিধায় ক্ষত্রিয়দিগের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন, এনিমিত্ত রাজাদিগের অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে রাক্ষস অর্থাৎ মানুষমাংসাশি অসভ্যদিগের উৎপাত হইতে তপোবন সমূহ রক্ষা করাও এক প্রধান কার্য্য ছিল।** তাঁহারা মহা মহা যুদ্ধ বিগ্রহ পূর্ব্বে স্বীয় স্বীয় পরাক্রমের পরীক্ষা প্রদান স্বরূপ যৌবন প্রারম্ভেই রাক্ষস দমনে নিযুক্ত হইতেন। বোধহয় পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমেই তাঁহারা স্বীয় ব্যবসায়ের ভার গ্রহণ করিতেন। বিশ্বামিত্র ঋষি দশরথের স্থানে রাক্ষস হননার্থ রামচন্দ্রকে প্রার্থনা করিলে দশরথ কহিয়াছিলেন;—

"উনষোড়শ বর্ষোহয়ং রামো রাজীবলোচনঃ।
ন যুদ্ধযোগ্যতা মস্য পশ্যামি রাক্ষসৈঃ সহ॥"

অর্থাৎ পঞ্চদশ বর্ষমাত্র বয়স্ক পদ্মনেত্র রাম অদ্যাপি রাক্ষসের সহিত যুদ্ধে ক্ষমতা রাখেন এমত দর্শন করি নাই।

উপরিউক্ত বিবিধ ব্যায়াম শিক্ষার পদ্ধতি ভারতবর্ষের মধ্য-প্রদেশেই প্রচলিত

---

* Arian.

** "কে আবাং পরিত্রাতুং দুষ্মন্তম্ আক্রন্দ, রাজ রক্ষিতানি তপোবনানি নাম!"—শকুন্তলা

ছিল,—মনু কহেন বিনসনের পূর্ব্ব, প্রয়াগের পশ্চিম, এবং হিমাচল ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্ত্তী দেশের নাম মধ্যদেশ। অপর সিন্ধুকুলবর্ত্তী অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, উৎকল প্রভৃতি দেশীয় মনুষ্যেরা আবহমান কাল পর্য্যন্ত যে দুর্ব্বলদেহি, তাহাও এক মনুবচনের আভাসে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, মনু রাজাদিগের যোদ্ধৃ নির্ব্বাচন কল্পে কহেন ;—

কুরুক্ষেত্রাংশ্চ মৎস্যাংশ্চ পঞ্চালাঞ্ছুরসেনজানু,।
দীর্ঘাল্লঘংশ্চৈব নরান গ্রানীকেষু্যোধয়েৎ ॥"

ইতি মানবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তমাধ্যায়ে। ১৯২ শ্লোকঃ।

অর্থাৎ যুদ্ধস্থলের অগ্রভাগে কুরুক্ষেত্র[১], মৎস্য[২], পঞ্চাল[৩] শূরসেন[৪] ও অন্যান্য দেশীয় দীর্ঘ অথচ লঘুদেহধারি মনুষ্যদিগকে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।

অপিচ তাঁহারা অপরাপর বিবিধ প্রকার যুদ্ধ কৌশল মধ্যে নানামত ব্যূহ-রচনা শিক্ষা করিতেন, মনু কহেন ;—

"দণ্ড ব্যূহেন তন্মার্গং যায়াত্তু শকটেন বা।
বরাহ মকরাভ্যাং বা সূচ্যাবা গরুড়েন বা ॥"

অর্থাৎ যুদ্ধযাত্রা কালে দণ্ড[৫], শকট[৬], বরাহ[৭], মকর[৮], এবং গরুড়াকারে[৯] ব্যূহ রচনা করিয়া গমন করিবেন।

কিন্তু দৈহিক বলের অসদ্ভাবে উপরিউক্ত পুরুষার্থ সমূহ লাভের সম্ভাবনা কি? হে অনৈক্যপরায়ণ, ভীরুস্বভাব, পরাপমানগ্রস্ত, উদ্যোগবিহীন স্বদেশীয় লোকেরা! তোমরা আর কতদিন ঐশিক এবং মানুষিক বিধির বিপর্য্যয়ে দৈহিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্যে কালহরণ করিবে? তোমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলা কি কিছুই তোমাদিগের তিমিরাবৃত অন্তঃকরণে পতিত হয় না? হা! তোমাদিগের অপেক্ষা তোমাদের জন্মভূমির পশু পক্ষ্যাদি মধ্যে সমধিক সন্তান পালনের সুনিয়ম পরিদৃষ্ট হয়। তোমরা মানসিক বল বৃদ্ধির নিমিত্ত তত্ত্ব বিজ্ঞানাদি শাস্ত্র উপদেশের অনুসন্ধান করহ,—কিন্তু ইহা কি অবগত নহ? যে, যেরূপ প্রাবৃট্‌কালীন সুপঙ্কিল ও বাতাতি-

১. আধুনিক দিল্লী প্রদেশ।
২. আধুনিক বিরার প্রদেশ।
৩. আধুনিক অযোধ্যা ও বেরেলী প্রদেশ।
৪. আধুনিক আগরা প্রদেশ।
৫. অর্থাৎ স্তম্ভাকারে, ইংরাজিতে যাহাকে কলম কহে।
৬. অর্থাৎ ত্রিকোণাকারে।
৭. অর্থাৎ যুগ্ম ধনুর উভয়াগ্রভাগ স্পৃষ্ট হইলে যেরূপ।
৮. অর্থাৎ ডমরুর ন্যায়।
৯. অর্থাৎ দুইপার্শ্বে দুই আকার হয়, তদ্রূপে পক্ষ এবং মধ্যভাগে চঞ্চুয়াকারে সেনা রচনা করিবেক। ব্যূহ সাজাইতে হইবেক।

পাতে চপলীভূত জলাশয়গর্ভে নিশাকরের নির্ম্মল ছায়া পতিত হইলে প্রতিভাত হয় না, সেইরূপ রুগ্ন, ভগ্ন, দুর্ব্বল দেহীদিগের অস্থির চিত্তে জ্ঞানচন্দ্রের পরিপূর্ণ পরিষ্কৃত প্রতিবিম্ব-বিভাসিত হইতে পারে না।

আমরা উপরিভাগে পূর্ব্বতন ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে ব্যায়াম চর্চার বিবরণ শেষ করিয়া এইক্ষণে প্রাচীন ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে তদ্বিষয়ের কিরূপ প্রাদুর্ভাব ছিল তাহা পুরাবৃত্তের আশ্রয় লইয়া কিঞ্চিৎলিখিতেছি, আমাদিগের এতাবৎ বিবরণ করণের মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে পৃথিবীতে সভ্যতা ভব্যতা প্রভৃতি হিতকর নানা বিষয়ে উন্নতি এবং অবনতি বাহুবলের ন্যূনাতিশয্যেই বহুলাংশে নির্ভরিত ছিল।

৩। প্রাচীন ইয়ুরোপীয় জাতিদিগের ব্যায়াম চর্চার বিবরণ।

ইয়ুরোপীয় জাতিদিগের কোন বিষয় বিবরণ করিতে হইলে গ্রীক অর্থাৎ যবন* জাতিরই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য, যেহেতু তাঁহারাই ইয়ুরোপের আদি সভ্যজাতি। তাঁহারা সভ্যতা ভব্যতা কল্পে প্রাচীন হিন্দুদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন না, বরং শিল্পাদি বিদ্যায় ভারতবর্ষীয়দিগের অপেক্ষা সমীচীন ব্যুৎপত্তি বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যে তদ্বিষয়ে বিশেষ প্রাধান্য রাখিতেন তাহা মহাভারতের লিখন প্রমাণেও জানা যাইতেছে,—পাণ্ডবদিগকে নিহত করণ মানসে বারণাবতে পুরোচন নামক যবন শিল্পিদ্বারাই দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন যতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পরন্তু, কোন প্রাচীন গ্রীকপণ্ডিত কহেন "অস্মদ্দেশের দেবতারা অমর্ত্ত্য-মনুষ্য এবং মনুষ্যেরা মর্ত্ত্য-দেবতা হয়েন" ফলতঃ তাঁহাদিগের কার্য্য সকল দেবতুল্যই ছিল বটে। গ্রীকজাতির মধ্যে স্পার্টাদেশীয় লোকেরা সুপ্রাচীন অথচ সর্ব্বাপেক্ষা ব্যায়াম চর্চায় অতিমাত্র সুনিপুণ ছিলেন,—অতএব আমরা তাঁহাদিগের বিষয়েই সর্ব্বাগ্রে কিয়দুক্তি করিতেছি। স্পার্টা দেশীয় প্রাচীন ধর্ম্মপ্রযোজক লাইকর্গস্ মহাত্মাকৃত ব্যবস্থাশাস্ত্রের মর্ম্মই তদ্দেশীয় লোকদিগের শরীর ও মন বীর রসাসক্ত করণ মাত্র। এ নিমিত্ত যেসকল সন্তান রুগ্ন বা অঙ্গহীন হইয়া জন্মিত, তাহাদিগের ভূমিষ্ঠ হওন পরেই তাহাদিগকে বিনষ্ট করণের বিধি ছিল; যাহারা বলিষ্ঠ ও পুষ্টদেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিত তাহারা অল্পবয়স-অবস্থাতেই রাজকীয় বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইত, তথায় এরূপ গুরুতর ব্যায়াম শিক্ষার নিয়ম ছিল যে অতিদৃঢ় বালশরীর ব্যতীত তদ্রূপ শারীরিক শিক্ষা সহনীয় নহে। উক্ত প্রকার শিক্ষার মূলাভিপ্রেত বল, বীর্য্য, সাহস, ধৈর্য্য প্রভৃতি পুরুষার্থ লাভ মাত্র, এই ঘোরতর ব্যায়াম শিক্ষায় কি বালক কি বালিকা সকলেই নিযুক্ত হইত।

* প্রিন্সেপ সাহেবের প্রসাদাৎ প্রসিদ্ধ অশোক রাজার কীর্ত্তি বিজ্ঞপ্ত প্রস্তর ফলকের পদাবলীর অর্থ সঙ্গতি হওনাবধি যবন শব্দ যে প্রাচীন গ্রীকদিগের প্রতি লক্ষিত হইত, তদ্বিষয়ে আর সংশয় মাত্র নাই।

তাহাদিগের পর্ব্বাহোৎসবে মল্লযুদ্ধাদিই আমোদ প্রমোদ রূপে নির্ণীত ছিল,—উল্লম্ফন, ধাবন, ভল্ল, শূল, চক্র প্রভৃতি নিক্ষেপণ, বাহুযুদ্ধ এবং মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ ব্যসনে যুবকেরা আপনাদিগের বল বিক্রমাদি প্রদর্শন করিত। তদ্ব্যতীত অশ্ব ও রথ সঞ্চালন প্রভৃতি বহুবিধ ব্যায়াম ছিল—ফলতঃ উক্তপ্রকার ব্যসনে এইক্ষণে যেরূপ ঘোটকের শক্তি এবং গতির দ্রুততা বিচার করণ পূর্ব্বক জয় পরাজয় নির্দ্দেশ হয়, স্পার্টান মধ্যস্থেরা তদ্বিপরীতে তুরঙ্গারোহি অথবা রথিদিগের কৌশল ও বল বিক্রমের ন্যূনাতিশয্য বিবেচনা করিয়াই পুরস্কার বিধান করিতেন।

পরন্তু গৃহসজ্জা ও বেশভূষা বিষয়ে উক্ত জাতি এরূপ সামান্যপদ্ধতির অনুবর্ত্তী ছিলেন, যে যদিও কোন কোন বিষয়ে উক্ত প্রকার অনাড়ম্বর শোভার নিমিত্ত হউক কিন্তু সমধিকস্থলে তদ্দ্বারা তাহাদিগের বিমূঢ় জাড্যবৎ ব্যবহার প্রকাশ পাইত। স্ত্রীলোকের পরম ভূষণস্বরূপ হ্রী স্নেহাদি মৃদুতাচরণ উক্ত দেশ হইতে এককালে প্রস্থান করিয়াছিল,—লাইকর্গস নারীদিগকে বীরপ্রসূ করণার্থ সমুদায় ললিতব্যবহারের স্রোতরুদ্ধ করিয়াছিলেন। ফলত ঐ সকল ব্যবস্থা অসভ্য অবস্থাপন্ন প্রাচীন জাতি বিশেষের মধ্যে কতিপয় শারীরিক ও মানসিক ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্তই উপযোগিনী ছিল, আধুনিক সভ্যজাতিদিগের নিকট তত্তাবতের অধিকাংশই ঘৃণার্হ সন্দেহ কি? কিন্তু দেশকালপাত্রের অবস্থা বিবেচনা করিলে পুরাকালে প্রাধান্য লাভের নিমিত্ত ঐসকল ব্যবস্থা বিশেষ হিতকর হইয়াছিল। আর স্পার্টানদিগের চরিত্র পাঠে ইহাও দ্রষ্টব্য, যে মানসিকবলে তাহারা প্রাধান্য দেখাইতে অশক্ত হইলেও শারীরিক বলে প্রধান প্রধান গ্রীকজাতির মধ্যে প্রায় অগ্রগণ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

গ্রীকদিগের প্রাদুর্ভাব পশ্চাৎ রোমাণজাতির গরিমাবৃদ্ধি হয়, অতএব তজ্জাতির মধ্যে ব্যায়াম চর্চার যেরূপ প্রচার ছিল, তদাভাস কিঞ্চিৎ প্রকাশ করা যাইতেছে।

রোমাণ ভদ্রকুলজ যুবাদিগের ব্যায়াম শিক্ষার্থ কাম্পস্ মার্শ্যস্ নামক এক সুবিস্তীর্ণ রঙ্গভূমি ছিল,—তথায় উক্তপ্রকার শিক্ষা ব্যতীত সৈন্য প্রদর্শন প্রভৃতি সাধারণ কার্য্যকদম্ব সম্পাদিত হইত। অপর, উক্ত রাজ্যের অন্তঃপাতি অনেক স্থানে মল্লযুদ্ধাদির শিক্ষার্থ বহুতর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে লানিষ্টা নামধারী এক এক জন ব্যায়াম বিদ্যার উপদেশক কর্ত্তৃত্ব করিতেন। ঐ সকল মল্লশিক্ষার্থিদিগের সংখ্যা সময়ে সময়ে এরূপ বর্দ্ধিত হইত যে তাহাতে রাজ্যপ্রণালী অবরুদ্ধ হওনের উপক্রম হইয়া উঠিত, স্পার্টেকস্ নামক একজন মল্ল, বিদ্যালয় হইতে পলায়ন পূর্ব্বক সপ্ততিসহস্র সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক রাজপ্রতিকূলাচারী হইয়াছিল। জুলিয়স্ কৈসর তদ্বিদ্যা শিক্ষা-

কালে ৬৪০ জন মল্লের সহচর ছিলেন। উক্ত মল্লদিগের শিক্ষার পরীক্ষা নিমিত্ত তার্কুনিয়স্ প্রিস্কস নামক নৃপতি সর্কস্ মাক্সিমস্ নামক চক্রাকার এক প্রেক্ষাগার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উক্ত বৃহদট্টালিকা ক্রমে ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন রাজার সময়ে বৃদ্ধিযুক্ত হয়, প্লিনি নামক পণ্ডিতের সময়ে তন্মধ্যে দুইলক্ষ দৃদিক্ষু সমাবেশিত হইত। উক্ত প্রেক্ষাগার অপেক্ষা অতি প্রকাণ্ড অন্য এক চক্রশালা বেস্পশিয়ান নামক সম্রাট্ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

উপরিউক্ত প্রেক্ষাগার সমূহের মধ্যবর্ত্তী বলিচক্রে বাহুযুদ্ধ, অস্ত্রযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, হিংস্র জন্তুর সহিত মনুষ্যের যুদ্ধ, রথ সঞ্চালন প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি নানাপ্রকার ব্যসন প্রদর্শন হইত। মল্লদিগের মধ্যে কেহ গুরুতররূপে আহত হইলে সে বলিচক্রের অন্তঃসীমায় পলায়ন পূর্ব্বক দর্শকদিগের কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা করিত, তাহাতে দর্শকেরা যদ্যপি তাঁহার বলবীর্য্য ও সাহসাদির কোনরূপ ত্রুটি দৃষ্টি না করিতেন, তবেই তাঁহারা তাহাকে অভয় প্রদান বিজ্ঞাপন করণার্থ নিম্নদিগে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-প্রসারণ করিতেন, নতুবা তাহার ভীরুতা ও নৈপুণ্য-বিহীনতা প্রকাশ পাইলে তাহা প্রসারণ করিতেন না তদ্দর্শন মাত্রে ঐ দুর্ভাগার প্রতিযোগী আসিয়া তাহাকে নিহত করিত।

রোমাণেরা এবম্প্রকার নিদারুণ রীত্যবলম্বন পূর্ব্বক বাহুবল সাধন করিতেন, বস্তুত এ প্রকার রীতি সভ্যতা এবং মনুষ্যধর্ম্মের বিগর্হিত হইলেও যদবধি সেই সকল রীতির প্রবলতাসূত্রে বাহুবলের বহুলতা ছিল, তদবধিই তাহাদিগের পরাক্রম এবং স্বাধীনতা প্রাদুর্ভূত থাকে। পরে উক্তাতিশয় দেশ-সমূহে অধিকার বৃদ্ধি সহ তদ্দেশীয়দিগের রীত্যনুকরণ দ্বারা বিলাসবিহ্বলতায় ক্ষীণকল্প হইতে লাগিলেন, সুতরাং সেই সময়ে বিবিধ অসভ্য জাতি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাহাদিগের সাম্রাজ্য ছারখার করিয়া ইয়ুরোপীয় প্রাচীন সভ্যতা ভব্যতা বিদ্যা বিজ্ঞানাদি একেবারে বিধ্বংস করিল। ভোগাসক্তি সমুদায় পুরুষার্থের ক্ষয়কারিণী, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে রতির নিকট মদনের আস্পর্দ্ধাপূর্ণ উক্তি অতি যথার্থ কহিতে হইবেক। পৃথিবীর নানা দেশের পুরাবৃত্ত পাঠে ইহাই সপ্রমাণ হয় যেজাতির মধ্যে ভোগাসক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে সেই জাতিই অধঃপাতে গিয়াছেন; নাদেরশাহ দুরাণী যেদিবস দিল্লী নগরাধিকার পূর্ব্বক মোগলাধি-পের ন্যায় সম্ভোগরসে যামিনীযাপন করেন, সেই দিবসের পর-প্রভাতে অধিক বেলা বর্ত্তিলে নিদ্রাভঙ্গ হইবাতে প্রথমতঃ অনুশোচনা করত পশ্চাৎ তন্নিদান স্থির করিয়া হাস্যপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন "অহো! এইজন্যই দিল্লী-শ্বর তেজোহীন হইয়াছেন, বীরপুরুষদিগের কর্ত্তব্য নহে তাঁহারা এরূপ বিহ্বলতাকর ভোগানুরাগের অনুরাগি হন।"

অতঃপর আমরা প্রাচীন ইয়ুরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে স্কিদীয়* অর্থাৎ

* গ্রীক গ্রন্থকারেরা ইহাদিগকে সকী (Saci) নামে খ্যাত করেন।

শক জাতির বিবরণ বিবৃত করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম,—যেহেতু ঐ জাতির বাসস্থান আশিয়া খণ্ডের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইলেও বস্তুত সেই জাতি আধুনিক ইয়ুরোপ খণ্ডের বহুতর বলবীর্য্যবন্ত জাতির বীজাধার স্বরূপ ছিলেন।

হিমবৎ পর্ব্বতের বায়ুকোণ হইতে রুশিয়ার অন্তঃপাতি য়ুরাল পর্ব্বতের তটবর্ত্তী দেশ পর্য্যন্ত অতি প্রাচীন কালে যে সকল জাতি বসতি করিতেন, তাঁহারা ভোগাসক্তি বিহীনতা বশত দৈহিক বলবীর্য্যে ধরাতলস্থ প্রায় সকল জাতিকে স্বকরতলে আনিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ, সুরিয়া* কালদিয়া, পারস্য, রোম প্রভৃতি প্রাচীনতম সাম্রাজ্য সমূহ উক্ত দেশীয় অসভ্যদিগের দ্বারাই বিনাশ প্রাপ্ত হয়! বস্তুত ভারতবর্ষীয় পৌরাণিকদিগের দ্বারা যাহারা শক, পারদ ও হূন নামে প্রসিদ্ধ, তাহারাই ইয়ুরোপে স্কিদীয়, পারসীয় ও হন্ নামে খ্যাত ছিল। উক্ত শকজাতি হইতে গথিক জাতির উৎপত্তি, তাহারাই রোম-রাজ্যের উচ্ছেদকর্ত্তা। তাহাদিগের সগ্‌নামক জনৈক নৃপতি ইয়ুরোপের উত্তরখণ্ড অর্থাৎ স্কান্দিনাবিয়াদেশে যাইয়া এক পরাক্রান্ত রাজ্যস্থাপন করেন। উক্ত সগ্‌রাজা বিক্রমাদিত্যের সাময়িক শক রাজা কিনা তাহাও পুরাবৃত্তবেত্তা-দিগের অনুসন্ধেয় বটে। সে যাহা হউক, এইক্ষণে ইয়ুরোপে যেসকল জাতি বাহুবলজন্য বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই উক্ত জাতির বংশধর হয়েন। যদিও প্রাচীন শক ভাষা বিলুপ্ত হইয়াছে, তথাপি সাক্‌সন প্রভৃতি ভাষাতে তাহার অনেক শব্দ পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয় শকভাষা সংস্কৃত ভাষারই এক শাখা হইবেক। অপর এই শক শব্দ স্কিদীয়, সাক্‌সন ও স্কান্দিনাবিয়া প্রভৃতি বহুতর শব্দের মূল তাহা সহজেই প্রতীত হইতে পারে। শক জাতির যুদ্ধই ব্যবসায়, শারীরিক বলপ্রাচুর্য্যই পুরুষার্থ, এবং বিগ্রহ-রসই একমাত্র আমোদ জননের কারণ ছিল। তাহাদিগের প্রধান দেবতার নাম বোদিন,**—এই দেবতা আশঙ্কা এবং বিক্রমের অধিষ্ঠাতা; করুণা অথবা স্নেহাদি মৃদুতাচরণ এই দেবতার গুণাবলী মধ্যে গণনীয় নহে। শকদিগের য়েদা*** (Edda) নামক ধর্ম্মগ্রন্থে তিনি 'ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিমান্" "সংগ্রামের জনক" "হননার্হদিগের বিধাতা" ইত্যাদি বহুল ভয়াল বিশেষণে আহূত হইয়াছেন।

তাহাদিগের স্বর্গলোকের নাম বলহালা (Valhalla) এবং সমরক্ষেত্রে শূরত্বপ্রকাশ পূর্ব্বক প্রাণোৎসর্গ ব্যতীত সেই দিব্যলোকে গমনের দ্বিতীয় পথ নাই, তথায় বলকরী (Valkirii) নাম্নী দেবকন্যাগণ ঐ বীরধর্ম্মি পুরুষদিগের

* Assyria.

** এই শব্দের সহিত বুধ শব্দের একতা আছে। ইয়ুরোপ প্রচলিত বুধবারের নামও ঐ বোদিন হইতে সমুৎপন্ন।

*** এই শব্দের সহিত বেদ শব্দের একতা আছে।

ভোজন পানাদি পরিবেশন করেন। এইস্থলে উক্তোভয় শব্দ যে সংস্কৃত "বল" হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এমত সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। অপিচ হালা শব্দ সংস্কৃত শালা শব্দের সহিত বিলক্ষণ ঐক্য রাখে, অতএব বলহালা যে বলবিক্রম বীরত্বের চরমস্থান, তৎসম্বন্ধে পক্ষে সংশয় মাত্র নাই। উক্ত স্বর্গের সুখসম্ভোগ মধ্যে বিলাস-বিহ্বলতার লেশ মাত্র নাই। উক্তলোক প্রাপ্ত বীরগণ প্রত্যহ সমর সজ্জা ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া প্রত্যহ পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে সকলেই নিহত হন। পরে দিবাবসানে ভোজনের সময়াগমে ঐ সকল ছিন্নভিন্ন দেহ পুনর্ব্বার সংযোজিত হইলে পর বীরগণ পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব ঘোটকারোহণ পূর্ব্বক ভোজমন্দিরে উপনীত হন। তথায় বলকরী নামিকা নিরুপমা রূপসী দেবকন্যারা তাঁহাদিগকে বরাহ মাংস ও যবসারে প্রস্তুত মদিরায় পরিতৃপ্ত করেন। বীরগণ স্ব স্ব শত্রুর কপালফলকরূপ চষকে সুরাপান করত প্রমত্ত হইতে থাকেন। কিন্তু এই অসাধারণ দিব্যলোকে প্রেমামোদের কোন সম্পর্ক নাই,—যেসকল বীর স্বহস্তে সমধিক শত্রুমুণ্ড ছেদন করিয়াছেন, অমরবালাগণ তাঁহাদিগকে ভোজ্য পান প্রদান করাই সমধিক অনুরাগ প্রদর্শন করেন।

উল্লেখিত প্রকার ধর্ম্মে আস্থা থাকাতে শকজাতীয়েরা স্বভাবত উগ্রচণ্ড ভাবালম্বি ছিল; তাহাদিগের আচার, ব্যবহার, রীতি, চরিত্র, প্রভৃতি সমুদায় বিষয়ে রৌদ্ররসেরই প্রাধান্য ছিল, তাহারা সমরোল্লাসকেই পরম সুখজ্ঞান করিত;—বিপদাশঙ্কা অথবা শারীরিক ক্লেশকে তাহারা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিত; তাহারা দুর্দ্ধর্ষভাবে ঘোরতর আপদ কান্তারে প্রবেশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত এমত নহে,প্রত্যুত তাহারা মৃত্যুকে আত্ম সমীপে আহবান করিয়া আনিত, তাহাদিগের ভয়ানক বলবীর্য্য বৃত্তান্ত পাঠকালে হৃৎকম্পিত হইতে থাকে।

এইক্ষণে, সেই সকল অসভ্য পরাক্রান্ত জাতির সুসভ্য বংশধরেরা ধরাধামে সর্ব্ববিধায়ে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা অধুনা পৃথিবীর হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন,—মানসিক বা দৈহিক বলে ইংলণ্ডীয় ফ্রান্সীয় এবং জার্ম্মানীয় প্রভৃতি লোকেরা এরূপ প্রাধান্য রাখেন যে তাঁহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা প্রদর্শনে অন্য কোন জাতি পারগ নহেন। ইয়ুরোপে এবং আমেরিকাতে ঐ সকল জাতি এইক্ষণে বিদ্যাধ্যাপন বিষয়ে ব্যায়ামচর্চার অতিমাত্র আবশ্যকতা জানিয়া শিক্ষিতদিগের মানসিক শক্তির সহিত শারীরিক শক্তি-বৃদ্ধির নিমিত্ত অশেষবিধ উপায়ের সৃষ্টি করিতেছেন; আমাদিগের দেশে সেই সকল উপায় অবলম্বিত না হইলে বিদ্যাধ্যাপন প্রণালী কোনরূপেই সংশুদ্ধ বা সম্পূর্ণ পদে বাচ্য হইতে পারিবেক না,—বস্তুতঃ তদ্রূপ শিক্ষা বিরহে এতদ্দেশের প্রকৃত মঙ্গলসাধন হইবেক না,—বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা এতদ্দেশীয় বালকদিগের মনে কেবল কল্পনা এবং বিভাবনা পরিপূর্ণ হওনেরই

সম্ভাবনা, তাহাদিগের দ্বারা ভবিষ্যতে স্বদেশের ঔৎকর্ষ সম্পাদিত হইবার প্রত্যাশা নাই ;—যেরূপ অতি তেজস্বিনী সজলভূমিতে ঔষধি ও শস্য বৃক্ষাদির পত্রপ্রাচুর্য্যমাত্রই হয়, ফলবাহুল্য লাভ হয় না,—সেইরূপ দুর্ব্বল শরীর তেজস্বি বুদ্ধিজীবিদিগের দ্বারা মনুষ্যত্বের সাফল্য হওয়া দুর্ঘট। এতদ্বিষয় শেষ পরিচ্ছেদে বাহুল্যরূপে অনুমোদিত হইতেছে ;—

৪। ব্যায়াম চর্চার সদুপায় ও বাঙ্গালিদিগের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ অভাব হেতু অশেষ দোষোদ্ভাব তথা রাজকীয় বিদ্যালয় প্রভৃতিতে তাহা প্রচালিত করণের আবশ্যকতা।*

দৈহিক বলবীর্য্য প্রভৃতির প্রাচুর্য্য না থাকিলে কোনো জাতি স্বাধীনতার সুখাস্বাদ করিতে পারেন না, ধরাতলে গণনীয় হইতে পারে না, তাঁহাদিগের দ্বারা শিল্প বিজ্ঞানাদির ঔৎকর্ষ হওয়া সম্ভবপর নহে। এতাবৎ সপ্রমাণ করণার্থ আমরা কয়েক পরিচ্ছেদে প্রাচীন প্রাচীন পরাক্রান্ত জাতিদিগের মধ্যে দৈহিক বলবৃদ্ধির নিমিত্ত বিশিষ্টরূপ শিক্ষাপদ্ধতি থাকার উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাঁহারা ভীরুস্বভাবি দুর্ব্বলদিগকে কাপুরুষজ্ঞান করিতেন। এইক্ষণে উপস্থিত পরিচ্ছেদে দৈহিক বলপ্রাচুর্য্যের আরো কতিপয় প্রত্যক্ষ উপকার বর্ণন-পূর্ব্বক প্রস্তাব সমাপন করিতেছি।

এই বিষম বিষয়ারণ্যে মানসিক স্বচ্ছন্দতাই পরমসুখ, ইহা সর্ব্বদেশীয় জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের দেহের সহিত মানসের এরূপ সম্বন্ধ, যে একের অস্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বে অন্যের স্বাচ্ছন্দ্য কদাপি সম্ভূত হইতে পারে না ;—যেরূপ ঘটিকাযন্ত্র বহির্ভাগে আঘাতপ্রাপ্ত হইলে তাহার অভ্যন্তরস্থ কল পর্য্যন্ত বিকল হইয়া যায়,—সেইরূপ মানুষের শরীর যদ্যপি অসুস্থতা বা দুর্ব্বলতা কর্ত্তৃক আহত হয় তবে মানসরূপ যন্ত্রের স্বচ্ছন্দতা বা সুশৃংখলা থাকার সম্ভাবনা নাই। স্বাস্থ্যবিরহে শরীর ধারণ ব্যর্থ ;—মনুষ্য তদ্বিরহে কোন সুখে সুখী হইতে পারেন না, সুস্থতা দেবীকে সম্বোধন পূর্ব্বক ইংলণ্ডীয় কোন প্রসিদ্ধ কবি কহেন ঃ—

"Without thy cheerful active energy,
No rapture swells the breast, no Poet sings"

ARMSTRONG.

অস্যার্থ।

তোমার আনন্দময়, নিরলস নিরাময়,
প্রাদুর্ভাব বিরহে সর্ব্বথা।

---

* এই পরিচ্ছেদ ডক্তর কালড্ওয়েল প্রভৃতি বিজ্ঞ বিজ্ঞ গ্রন্থকারের উক্তি সাহায্যে লিখিত হইল।

কোনো সুখোল্লাসে চিত, নাহি হয় প্রফুল্লিত,
কবি কণ্ঠে নাহি সরে কথা ॥

অতএব সুস্থতাই যদ্যপি ইহ জগতমণ্ডলে প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ মানসিক সুখের একমাত্র জনয়িত্রী হইলেন, তবে সেই দুরারাধ্যা দেবীকে দেহমণ্ডপে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া তাঁহার উপাসনা করা মনুষ্য জাতির কর্ত্তব্য হইয়াছে, —যেহেতু তদভাবে সর্ব্ব পুরুষার্থের নিদান দৈহিক বা মানসিক বল প্রাপণের উপায়ান্তর নাই।

অধুনা ইয়ুরোপীয় এবং আমেরিকান অনেকানেক জ্ঞানি কর্ত্তৃক ইহাই নির্ণীত হইয়াছে, —যে মনুষ্যের মস্তক মধ্যেই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি সমূহ স্বতন্ত্র সতন্ত্র খণ্ড প্রস্থাপিত আছে, —সুতরাং মস্তককে সর্ব্বদা সুস্থ না রাখিলে সেই সকল বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। এইক্ষণে, সেই সুস্থতালাভের প্রধান উপায় দেহ মধ্যে বিশুদ্ধ রক্তপ্রবাহের প্রাচুর্য্য —কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রসূতির গর্ভাধান অবধি সন্তানের যৌবন পরিপাক পর্য্যন্ত বিহিত তত্ত্বাবধারণ না থাকিলে পরিচ্ছিন্ন রক্ত প্রাচুর্য্য লাভ হওয়া সুদূরপরাহত। অতএব উক্ত জ্ঞানিগণ সন্তান জনয়িতা দম্পতির পরিণয়পাশে বদ্ধ হওনাবধি সন্তান গর্ভস্থ, ভূমিষ্ঠ, প্রতিপালিত, ও শিক্ষিত করণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যেসকল সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে দৈহিক সুস্থতা ও শক্ততা সহকারে মানসিক সুস্থতা ও তেজস্বিতা লাভ হয়। আমাদিগের দুর্ভাগ্যদেশে তদ্রূপ সুনিয়মাবলীর সম্পূর্ণ বিপর্য্যয়ে কার্য্যকৃত হইবাতেই ধরাতলে বাঙ্গালিজাতি সর্ব্ববিষয়ে প্রায় অধমকল্প হইয়াছেন। অতএব সেই সকল দোষোদ্ঘাটন পূর্ব্বক যাহাতে সুশিক্ষা প্রণালী প্রচলিত হয়, তৎপক্ষে যত্ন করা দেশহিতৈষি মনুষ্য মাত্রের অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে।

যেরূপ সুবীজ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক কৃষিগণ সুশস্য উৎপত্তির আয়োজন করে, —ও বলিষ্ঠ বলীবর্দ্দ প্রভৃতির ঔরষ যোগে উত্তমোত্তম গোমহিষাদি লাভ করে, —সেইরূপ সুবলিষ্ঠ প্রবৃদ্ধ-যৌবন-প্রাপ্ত পুরুষদিগের সহিত সুস্থদেহ সুন্দরীদিগের পরিণয়ে উত্তম সন্তানরত্ন উৎপন্ন হয়। আমাদিগের দেশে তদ্বিপরীতে জরাগ্রস্ত, পলিতকেশ, স্থবির ও শ্বাসকাশ, কুষ্ঠ, উদরী প্রভৃতি ভয়ানক রোগগ্রস্ত ধনবানেরা এদেশের উত্তমা বালাবলীর পাণীগ্রহণ করত বলবীর্য্য-বিহীন ক্ষীণ-বুদ্ধি পুত্রকন্যাদিগের সংখ্যাবৃদ্ধিকরণ পূর্ব্বক বাঙ্গালিজাতির হীনতার এক মূলীভূত কারণ হইতেছেন। অপিচ, এদেশে অতি তরুণ বয়সে বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে স্বল্প দৌর্ভাগ্যের কারণ হয় নাই; নিতান্ত নবযৌবনে যাঁহারা সন্তান সন্ততির জনক জননী হইয়া বসেন, তাঁহারা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল এবং অপক্কদেহি, সুতরাং সেই দৌর্ব্বল্য এবং অপক্কতা তাঁহাদিগের বংশপরম্পরা অবরোহিত হইতে থাকে। বয়োবৃদ্ধি

সহকারে শরীরের তেজ ও বল পরিপাক হয়, সুতরাং প্রবৃদ্ধ যৌবন এবং প্রৌঢ় অবস্থায় যাঁহারা সন্তানবান হন তাহাদিগের সন্তানগণ প্রায় বলিষ্ঠ এবং পুষ্টদেহ হইয়া থাকে; প্রাচীন স্পার্টা এবং আধুনিক ইয়ুরোপ খণ্ডে উক্ত দোষোদ্ঘাটনার্থই বাল্যবিবাহের কুপ্রথা রহিত হইয়াছে।—এইক্ষণে, বাঙ্গলা দেশে এই রুচির নিয়ম কোন্ কালে প্রচলিত বা প্রস্থাপিত হইবেক? কোন্ কালেইবা জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ পাতকীদিগের করে সুকুমারী কুমারীদিগকে বিসর্জ্জন করণে ধনলোভি দুষ্টাশয় জনক জননীরা ক্ষান্ত হইবেক? দেশের দারুণ দুর্দ্দশা দেখিয়া এমত ইচ্ছা হয় রাজপুরুষেরা এই মহানিষ্টকর কুপ্রথা সকল বিধি নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক নিবারণ করত বাঙ্গালিজাতির ভাবীমঙ্গল সংকল্পের দিবস সন্নিকট করুন।

ব্যায়াম বিদ্যার উপকারিতা বর্ণন-কুশল কোন মহাশয় কহেন, যুদ্ধ বিগ্রহাদি প্রাদুর্ভাব কালে যে সকল সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সেই সকল সন্তান স্বভাবতঃ সাহস সম্পন্ন হয়, ইহার কারণ সেই সময়ে তাহাদিগের জনকেরা স্বদেশ হিতার্থে বা আত্মরক্ষার নিমিত্ত অথবা কারণান্তর বশতঃ শত্রুবিমর্দ্দন কালে ঘোরতর জিগীষা পরবশ হয়, সুতরাং সেই বিগ্রহ রসে তাহাদিগের শরীর ও মন পরিপ্লুত থাকাতে পুত্রগণও সেই ভাব লাভ করে। এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত-স্থলে তিনি ইয়ুরোপে সংঘটিত বহুবিধ ঘটনার উল্লেখ করেন। অপিচ, আরব ও তাতর দেশীয়দের সন্তানেরা বালক কালাবধি চৌর্য্যাদি কুক্রিয়ায় অনুরত হয়, ইহা যে কেবল তাহাদিগের জনক জননীদিগের কেবল দৃষ্টান্ত এবং শিক্ষা অনুসারেই হইয়া থাকে এমত বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে, প্রত্যুত, তাহারা গর্ব্ভ মধ্যে অবস্থান কালাবধি সেই দুষ্প্রবৃত্তিপ্রধান পিতৃ মাতৃর তেজে পরিণত হয়। অতএব যেসকল পিতামাতা অতি দূষণাবহ শারীরিক বা মানসিক রোগে আক্রান্ত, তাঁহাদের সন্তানদিগের শরীর ও মানস মধ্যে সেই সকল দোষ পুরুষানুক্রমে প্রাদুর্ভূত হইবেক ইহাতে আশ্চর্য্য কি? কুষ্ঠীর পুত্র কুষ্ঠী এবং ক্ষিপ্তের পুত্র প্রায় ক্ষিপ্তই হইয়া থাকে, অতএব এমত সকল ব্যক্তির সুসন্তান প্রত্যাশা বৃথা, এমত সকল দুর্ভাগ্যদের বিবাহপাশে বদ্ধ হওয়াই অন্যায়। কিন্তু আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষগোচর করিতেছি, ধনবান লোকেরা সর্ব্বদাই একপ্রকার দোষাশ্রিত দেহ ও মন বিশিষ্ট সন্তানদিগকে পরিণয় শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন।

ধরাতলে তুরুষ্ক এবং পারস্য দেশীয় প্রধান লোকেরা সর্ব্বজাতির অপেক্ষা সুপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত, তদ্ধেতু এই যে তদ্দেশীয় উচ্চপদবীস্থ জনগণ জর্জ্জিয়া এবং সর্কেশিয়া দেশজাত সুপ্রসিদ্ধ রূপসীদিগকে অর্থদ্বারা ক্রয় করিয়া বিবাহ করে, কিন্তু যদ্যপি ইয়ুরোপ খণ্ডের প্রধানুসারে ঐ ললনাগণের স্বাধীনতা সুখ থাকিত, তবে উক্ত দেশীয় প্রধান বংশীয়েরা যেরূপ রূপবান বলিয়া

বিখ্যাত, সেইরূপ বলবান ও বুদ্ধিমান রূপে অগ্রগণ্য হইত সন্দেহ নাই। অতএব এস্থলে ইহাও বিজ্ঞাপ্য, যে বাঙ্গালাদেশে সুশ্রীশালিনী কামিনীমাত্র পরিগ্রহ করিলেই যে কোন ব্যক্তির সুসন্তান লাভ হইবেক এমত প্রত্যশা করা উচিত নহে। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের কারাবরোধ বিমোচন না হইলে এবং তাহারা সীতা, সাবিত্রী, রুক্মিণী এবং দ্রৌপদী প্রভৃতির ন্যায় সমাদৃত ও সুশিক্ষিত না হইলে তাহাদিগের গর্ভে সাহসসম্পন্ন বলবান সন্তানগণের আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব। দেখুন, আমাদিগের নগর নিবাসিনী ভদ্রকামিনী মণ্ডলী নিৰ্ম্মল বায়ু-প্রবাহিত স্থানে অঙ্গ সঞ্চালন করিতে পান না, শারীরিক শ্রমমাত্র করেন না, তাসক্রীড়া বা আদিরস প্রধান কাব্যপাঠ প্রভৃতি ইতর ব্যসনে কালাতিপাত করেন, সুতরাং তাঁহাদিগের সন্তানেরা প্রায় ক্ষীণজীবি এবং ভোগানুরাগি হইয়া থাকে; পল্লীগ্রামে ভদ্রপত্নীরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা বহুলাংশে শ্রমানুরাগিণী এবং স্বচ্ছন্দপ্রবাহিত সমীরণ সেবন ও প্রকাশ্য জলাশয়ে যাইয়া স্নানাদিক্রিয়া পরায়ণ বিধায় তাহাদিগের তনয়েরা নগরীয় বালকদিগের অপেক্ষা সমধিক শ্রমসহিষ্ণু ও প্রখর ক্ষুৎশক্তি বিশিষ্ট দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের বাল্যকালাবধি সুশিক্ষা হইলে অনেকে পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে সন্দেহ কি? অপরন্তু, সংসার মধ্যে ইহাও সৰ্ব্বদা দৃষ্টিগোচর হয়, অতি পবিত্রবংশে অবতীর্ণ সুনীতি দর্শি পরিবারে প্রতিপালিত ও বাল্যকালাবধি ধৰ্ম্মশিক্ষায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণ মিথ্যাবাদিত্ব, বিশ্বাসঘাতিত্ব, চৌর্য্য ও হত্যা প্রভৃতি প্রকট মহাপাতক পুঞ্জে ঘোরতর আবিষ্টচিত্ত হইয়া থাকে, ইহার কারণ কেবল জননী বা জনকের ধৰ্ম্মপ্রবৃত্তি প্রভৃতি সমুদায় গুণের আধার যে শিরোদেশ, তাহার কোন কোন স্থানের কদর্য্য বা অসম্পূর্ণ গঠন মাত্র। কুপ্রবৃত্তি কালসর্প হৃদ্‌কন্দরে লুক্কায়িত অথচ রূপলাবণ্যে বাহির্ভাগ প্রভান্বিত দেখিয়া বিমুগ্ধচিত্তে বিবাহ করিলেই এই প্রকার কুসন্তান জন্মিয়া থাকে, অতএব বরকন্যাগণের পরিণয় শৃঙ্খলে বন্ধ হওনের পূর্ব্বে পরস্পরের চরিত্র পরীক্ষা করা অতিশয় ভদ্রনীতি সন্দেহ কি? এতদ্দেশে এই সুপ্রথা প্রচলনের গৌণকাল আছে, স্ত্রী শিক্ষা বাহুল্যরূপে প্রচলিত হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত সুনীতি স্থাপন হইবার সম্ভাবনা। এদেশে ক্ষীণাঙ্গ সন্তান জন্মিবার আর এক কারণ, নিৰ্দ্দিষ্ট জাতি বা বংশ মধ্যে পরিণয়বন্ধ থাকায় কুপ্রথা। এই কুপ্রথার নিদান কেবল বংশমর্য্যাদার বৃথাভিমান মাত্র। এই অভিমান বশতঃ ইয়রোপের কোন কোন রাজকুলের এক কালে বিধ্বংস ঘটিয়া গিয়াছে,—এই কুপ্রবৃত্তির বশতাপন্ন হইয়া রাজপুতানা দেশীয় ঠাকুর বংশীয়েরা বালিকা হত্যারূপ নিদারুণ পশ্বাচারে অদ্যাপি প্রবৃত্ত রহিয়াছে,—এবং এই কুসংস্কারের দাসত্ব হেতুই বাঙ্গালাদেশের কুলীনেরা ক্রমশঃ অধঃপাতে যাইতেছেন। বিবেচনা করুন, গৃহপালিত কপোত কুক্কুটাদি বিহঙ্গেরা বহুকাল যাবৎ এক কুলায়জাত সহচরী

সহকারে দাম্পত্য স্বীকার করিয়া কেবল বিকলাঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাবকই জন্মাইয়া থাকে,—মনুষ্য দম্পতির পক্ষেও এই স্বাভাবিক নিয়ম অতিমাত্র অপকর্ষের কারণ সন্দেহ কি? যদিও এদেশে স্ববর্ণা বা স্বগোত্রা কন্যাগ্রহণের নিয়ম নাই, কিন্তু ভঙ্গকুলীনদিগের মধ্যে অধুনা মাতামহের মাতৃকুল বা পিতার মাতৃকুল প্রভৃতি সন্নিকট বংশ হইতে কন্যাগ্রহণের ব্যবহার বাহুল্যরূপে চলিয়াছে। বিশেষতঃ দেবীবর কৃত মেলবন্ধ হইবার পর নির্দ্দিষ্ট কুলীন-কুলের মধ্যে আদান প্রদান রীতি বন্ধ থাকিবাতে অশেষ দোষোৎপত্তির কারণ হইয়াছে, ইহাতে অপাত্রে সুপাত্রী বিসর্জ্জন হইতেছে। এই কুকাণ্ডের প্রচণ্ড প্রভাব এস্থলে বর্ণন করা বাহুল্য মাত্র।

এতদ্দেশে ক্ষীণদেহ সন্তানবৃদ্ধির আর এক কারণ, নিতান্ত নির্ধনদিগের দারপরিগ্রহ। পিতা মাতা স্বয়ং কান্তিপুষ্টিকর ভোজ্য পানাদিতে বঞ্চিত, তাহাদিগের কোনরূপে উদরান্নের সংস্থান হয়,—এমত স্থলে সন্তানদিগেব বলাধান হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভবপর হইতে পারে না। এদেশে পরমেশ্বরের কৃপায় অন্নের অসম্ভাব নাই, কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করিলেই দিনযাপন হইতে পারে, অতএব সুদীন মূর্খ লোকেরা তজ্জন্য নিশ্চিন্ত বিধায় সহসা বিবাহপাশে বদ্ধ হইয়া কেবল আপনাদিগেরই ক্লেষাকর্ষণ করে এমত নহে, কিন্তু পরমেশ্বর প্রণীত সুধাময় দাম্পত্য প্রণয়ে বিষোৎপাদন করিয়া বহুতর নিরপরাধি শিশু সন্তানের মহা ক্লেশের কারণ হয়, অতএব এদেশে উপার্জ্জন ক্ষম অথবা বিভবশালি ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিবাহবন্ধ হইলেই বলীষ্ঠ সন্তান উৎপাদনের এক উদ্দেশ্য সফল হয়।

অপর সন্তান গর্ভস্থ হওনাবধি তাহার জ্ঞানোদ্রেককাল পর্য্যন্ত এতদ্দেশে যে প্রকার তৎপ্রতিপালনের নিয়ম আছে তাহা অতীব দুষণাবহ, তাহাতে শিশু-দিগের অকালে কালপ্রাপ্তি হওনের অথবা ভগ্নশরীর লইয়া দুঃখে কাল যাপন করণেরই সম্পূর্ণ আয়োজন দৃষ্ট হয়। অন্তর্ব্বত্নীগণের পক্ষে (সহজাবস্থা অপেক্ষা) অধিকতর ব্যায়ামপরায়ণ হওয়া উচিত,—অবিরত ভূমিশয্যা ও ঘোরতর নিদ্রায় কালহরণ করা কদাচ সুপথ্য নহে। এদেশের সসত্ত্বা কুল মহিলাগণ অধিকতর অম্বলাদি কুপথ্য সেবা দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানদিগের পুষ্টি বর্দ্ধনের পক্ষে সমক্ ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকেন, লঘুপাক অথচ পুষ্টিবৃদ্ধিকর স্বাস্থ্য-দায়ক খাদ্য সমূহ গর্ভিণীদিগের পক্ষে অতি হিতকর, তাহা ক্ষুধার ধার অনুসারে প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করাই বিহিত। আর অন্তরাপত্য অবস্থায় কামিনীকুল সুস্থির ও সানন্দচিত্তে কালহরণ করিতে পারেন এমত উপায় সর্ব্বদা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। তাহাদিগের মনে উৎকট ভয় শোক, ক্রোধাদি উদয় না হয় এমত দৃষ্টি রাখাও উচিত, যেহেতু সেই সকল রসের আধিক্যে সন্তানগণের অকাল মৃত্যু বা উন্মাদ প্রভৃতি ভয়ানক রোগাদি জননের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

এইরূপ শিশুদের খাদ্য, পরিচ্ছদ, গাত্রমার্জন, বায়ুসেবন, হিমরৌদ্রাদি হইতে পরিরক্ষণ, ব্যায়াম, ও নিদ্রা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে যেরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য তাহা এদেশে কিছুই নাই, সুতরাং তাহাতে বিস্তর অনিষ্ট উৎপত্তি হইতেছে। এদেশের গৃহিণীরা সন্তানদিগকে ইসপ বর্ণিত হংসীবৎ শীঘ্র শীঘ্র পুষ্টদেহ করণার্থ এরূপ অনিয়মিত রূপে গাভীদুগ্ধ দ্বারা পোষণ করেন, যে তাহাতে সন্তানদিগের অশেষপ্রকার রোগের উৎপত্তি হয়,—এতদ্দেশীয় দুগ্ধ-পোষ্য শিশুদিগের মধ্যে অত্যল্প সংখ্যক শিশু উদরাময়ের ভয়ালগ্রাস হইতে বিমুক্ত আছে। সন্তানদিগের পক্ষে ঘৃতাক্ত বা তৈলাক্ত দ্রব্য বা মিষ্ঠান্ন অথবা অপক্ক ফলাদি বিষভোজন রূপে গণনীয়,—কিন্তু বিদ্যাবিহীন গৃহিণীগণ দাম্বালদিগকে উক্ত প্রকার অহিত ভোজনদানে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন না, তদ্বিষয়ে নিষেধ করিলে কহেন "একরত্তি" দিয়াছি, ফলে সেই একরত্তিতে যে কত অনিষ্ট উৎপন্ন হয় তাহা বর্ণন করা বাহুল্য। পরন্তু সন্তানদিগকে পরিষ্কৃত রাখার অপরিসীম উপকার এতদ্দেশীয় জনক জননীদিগের কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম হইবেক না, হা! ব্যক্ত করিতে লজ্জা বোধ হয়, এদেশের পিতা মাতারা কহিয়া থাকেন, ধূলা কাদা না মাখিলে শিশুগণ বৃদ্ধিযুক্ত হয় না। পক্ষান্তরে ইহাও দেখা গিয়াছে, কোন কোন মহাশয় অনাবৃত নির্ম্মল বাতাসে শিশুদিগকে ধাবমান বা ব্যায়াম-যুক্ত ক্রীড়া কৌতুকান্বিত দেখিলে ক্রুদ্ধ হইয়া আরক্ত লোচনে কর্কস বচনে তাড়না করেন,—কিন্তু তাহারা অবগত নহেন যে তাহাতে তাহাদিগের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। করুণাময় বিশ্বপিতা শিশুদিগের কোমল চিত্তক্ষেত্রে উক্তপ্রকার ক্রীড়ারসের স্পৃহারূপ বীজ বপন করিয়া তাহাদিগের ভাবী বহুধা সুখের আয়োজন করিয়া দিয়াছেন।

সন্তান পালন সম্বন্ধে এদেশে এবম্প্রকার মহানিষ্টকর যে সকল কুনিয়ম আছে, তত্তাবতের উল্লেখ ও তন্নিবারণের উপায় প্রভৃতি বিবৃত করিলে এই প্রবন্ধ দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবেক, বিশেষতঃ তদ্বাহুল্য বর্ণন করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং তদ্বিষয়ে এতাবন্মাত্র উক্তি করিয়া এই পরিচ্ছেদের অপরাংশ লেখা যাইতেছে।

হা! আমাদিগের মেদমাংস পিণ্ড ধনিদিগের কবে এমত পরিজ্ঞান লাভ হইবেক যে শরীর সঞ্চালন ও প্রসারণ ব্যতীত দুর্ব্বল শিরাসমূহ তেজস্বি ও দৃঢ়ীভূত হইতে পারে না?—প্রত্যুত, কুপিত পিত্তাদি ক্রূর রসের আধিক্য হইয়া উঠে, সুতরাং রক্তের অপরিচ্ছন্নতা বশতঃ নানা রোগের আতিশয্য হয়। ব্যায়াম দ্বারা সেই সকল কুরস দমন-প্রাপ্ত হইয়া কুভাব বর্জন ও সুভাব ধারণ পূর্ব্বক শরীর পোষণ করিতে থাকে, তাহাতে রোগরূপ বিবিধ হিংস্রজন্তু দেহ কান্তার হইতে দূরে পলায়িত হয়, এবং বিলাস বিহ্বলতা রাক্ষসী স্বীয় পতি আলস্যের সহিত এই কমনীয় মনুষ্যদেহে স্থান প্রাপ্ত হয় না। ব্যায়ামশীল লোকেরা

যেরূপ তৃপ্তি ও রুচি সহকারে ভোজন পান ও নিদ্রার সুখানুভব করেন, আলস্যের দাস সম্ভোগাসক্ত মনুষ্যেরা কখনই সেই সুখানুভব করিতে পারে না, ভোজনপানাদির আতিশয্যে শরীরের মেদবৃদ্ধি অথবা রোগবৃদ্ধিই হইয়া থাকে, —তাহাতে ক্ষুৎপিপাসার তীক্ষ্ণধার বিনষ্ট হয়। প্রত্যুত, অগ্নি প্রজ্বলনাভিমুখে সমধিক ইন্ধন দিলে তাহা অবশ্যই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইবেক। বিবেচনা করুন,—কিঞ্চিৎ অপরিমিত পান ভোজনান্তে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হইলে পদব্রজে অথবা অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ দ্বারা শ্রমোদয় হওন মাত্রেই সেই ক্লেশ একেবারে বিগত হইয়া পুনর্বার ক্ষুৎপিপাসার উদ্রেক হয়,—অতএব এতদপেক্ষা ব্যায়ামের আর প্রত্যক্ষ উপকার কি বর্ণন করা যাইতে পারে? সমধিক ভোজন পান করিলে ভোজ্য পেয়াদিতে স্থিত হাইড্রোজেন ও কার্ব্বন দ্বারা শরীর পরিপূত হয়, ব্যায়াম দ্বারা লোমকূপ পথে স্বেদাকারে সেই অতিরিক্ত গ্যাসদ্বয়ের নির্গমন না হইলেই দেহগেহ বিবিধ রোগের ভদ্রাসন হইয়া উঠে। দেখুন, কৃষকেরা এই ব্যায়াম গুণে কিরূপ অরোগি ও দীর্ঘজীবি হয়, তাহারা প্রায় উদরাময় ও যকৃৎ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয় না, তাহাদিগের দেহে গুরুতর শ্রমজন্য বা ঘোরতর বৃষ্টিপাতে অথবা প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের অসহনীয় রশ্মি প্রভাবে জ্বরাদি রোগের সঞ্চার হয় না, ফলতঃ যে পরিমাণে তাহারা হিম, শিশির, কুজ্‌ঝটিকা, বৃষ্টি, পঙ্ক, রৌদ্র, গ্রীষ্ম, ঝটিকা প্রভৃতি সহ্য করিতে পারে এমত অন্যকোন ব্যবসায়িদিগের সহ্য নহে। কৃষকেরা বাল্যকালাবধি ব্যায়াম বলে বজ্রদেহ হইয়া ঐসকল নৈসর্গিক বিড়ম্বনাকে শঙ্কামাত্র করে না।

এতদ্দেশীয় ভদ্রলোকদিগের উল্লেখিত শিবকর পরিবর্ত্তনের অধুনা একমাত্র উপায় রাজপুরুষদিগের হস্তগত রহিয়াছে,—হিন্দুজাতির বর্ত্তমান সামাজিক বিধানে বিবাহ, গর্ভাধান, শিশুপালনাদি নানা বিষয়ে যেকিছু পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন তাহা কালসাপেক্ষ,—বদ্ধমূল মহা মহীরুহ সহসা উৎপাটন করা সাধ্যাতীত কার্য্য। সুতরাং রাজকীয় বিদ্যালয় প্রভৃতিতে ব্যায়ামশিক্ষার পদ্ধতি প্রচলিত হইলে কথঞ্চিৎ উপকার দর্শিতে পারে, আমাদিগের বর্ত্তমান শিক্ষিতেরা ব্যায়ামচর্চার অমৃতময় ফলানুভব করিয়া তাঁহাদিগের সন্তানগণকে অতি শৈশব কালাবধি সুশিক্ষার সাহায্যে সুন্দর সবল ও সুস্থ শরীর করিতে পারেন। আমাদিগের অভিপ্রায় এই যে ভদ্রকুলজদিগকে সুশিক্ষিত করণার্থ সম্যগনুষ্ঠান অভিনবরূপে বিচরন করাই কর্ত্তব্য,—অপ্রাপ্তব্যবহার পিতৃহীন ভূম্যাধিকারিগণ যে নিয়মে অধুনা ওয়ার্ড শিক্ষাশ্রমে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন, এদেশীয় ভদ্রসন্তানমাত্রকে তন্নিয়মাধীনে শিক্ষা দেয়া কর্ত্তব্য। বালকেরা বাটী হইতে যত অন্তরে থাকেন ততই উত্তম। বিদ্যাবিমুঢ় কুচরিত্র বহুজনপূর্ণ হিন্দুপরিবারে

সুকুমারমতি বালকদিগের সুনীতি শিক্ষা হওয়া দুরূহ, বিশেষতঃ তাহাদিগের শরীরভঙ্গ করণের কুদৃষ্টান্ত এবং অনিষ্টকর রীতির অভাব নাই, বিষবৃক্ষারণ্যে রসালতরুর বৃদ্ধি প্রত্যাশা করা ব্যর্থ, অতএব রাজপুরুষেরা এতদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে আর উপায়ান্তর নাই;—এস্থলে এমত আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে এতদ্দেশীয় ভদ্রলোকেরা এবম্প্রকার নিয়মাধীনে সন্তান সমর্পণ করিবেন না, কিন্তু আমরা বলি এরূপ আপত্তির সময় বিগত হইয়াছে,—অনেক ব্যক্তি এক্ষণে আহ্লাদপূর্ব্বক স্ব স্ব বালককে ইয়ুরোপীয় নিয়মে সুশিক্ষিত করণার্থ ব্যগ্রচিত্ত হইয়াছেন,—তাহাদিগের সদৃষ্টান্ত বসন্তকালের পদ্মবনবৎ অতিশীঘ্র দেশব্যাপ্ত হইবেক সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ উক্তপ্রকার শিক্ষা প্রণালীর দোষই বা কি? ইহাতে জাতি, ধর্ম্ম, প্রভৃতি কোন বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ হইবার সম্ভাবনা নাই। অভিভাবকেরা স্ব স্ব বালকদিগের নিমিত্ত পাচক ও ভৃত্যাদি নিযুক্ত রাখিতে পারিবেন, বালকেরা পর্ব্বাহোপলক্ষে গৃহে যাইয়া জনকজননী ও আত্মীয় স্বজনের সহিত কিয়ৎকাল পুনর্মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব আনন্দানুভব করত পুনর্ব্বার পর্ব্বাহাবসানে পাঠমন্দিরে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পরিশ্রমে অধ্যয়ন পরায়ণ হইতে পারেন; যেরূপ গুরুতর শ্রান্তির পর কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম সুখভোগ হইলে পুনর্ব্বার দৈহিক ও মানসিক শক্তিসমূহ উত্তেজিত হয়, প্রস্তাবিত বিশ্রামকালও বিদ্যার্থিদিগের পক্ষে তদ্রূপ উপকারী। আমাদিগের মতে উক্ত প্রকার রাজকীয় বিদ্যালয় সমূহ রাজধানী বা নগরমধ্যে স্থাপিত না হইয়া পরেশনাথ পর্ব্বত বা বীরভূম অঞ্চলীয় শৈল বিশেষে প্রতিষ্ঠিত হইলে ভাল হয়,—ইহাতে অশেষবিধ উপকার আছে;—আদৌ, ছাত্রেরা নগরীয় কুপ্রবৃত্তি এবং কুসংস্কার কণ্টকবনের দুস্তরণীয় আকর্ষণ হইতে রক্ষা পাইবেক। দ্বিতীয়তঃ উক্ত প্রদেশীয় শৈত্য মান্দ্য মধুর গুণযুক্ত সমীর নীর প্রবাহে শরীর অতি সুস্থ এবং স্বচ্ছন্দ থাকিবেক,—তৃতীয়তঃ তৎপ্রদেশে মৃগয়া মল্লাদি ব্যায়ামের বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে,—এতদ্ব্যতীত আরো কতিপয় উপকার আছে তাহা বর্ণনা করিলে প্রস্তাব বাহুল্য হইবেক। বিশেষতঃ উক্ত প্রদেশ সমীপ হইয়া রেলওয়ে গিয়াছে, সুতরাং শিক্ষিতেরা ছুটী উপলক্ষে অত্যল্পকালমধ্যে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইবেন।

পরন্তু, এই অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকের সুশিক্ষাভিলাষি অনেক ইয়ুরোপীয় মহাশয় ব্যক্তির চিত্তাকর্ষণ হইয়াছে, শ্রীযুত হজসন প্রাট সাহেব যৎকালে বাঙ্গলা দেশের দক্ষিণ বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর ছিলেন, সেই সময়ে তিনি এতদ্বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন। তিনি একদা স্বীয় রিপোর্টমধ্যে লেখেন "একি সামান্য আহ্লাদের বিষয় হইবেক

যে আমাদিগের জমীদার পুত্রেরা যুতাহার পূর্ব্বক ভুঁড়িমোটা না করিয়া তুরঙ্গরোহণে স্ব স্ব অধিকার পরিদর্শনকরণ কালে ডাকাইৎ ও কাদা খোঁচা শিকার করিয়া বেড়াইবেক।” অতএব বাঙ্গালি যুবকদিগের প্রকৃত শিক্ষার সময় সমুপাগত হইয়াছে,—এইক্ষণে এতদ্দেশীয় লোকেরা উদ্যোগ পরায়ণ হইয়া রাজপুরুষদিগকে এতদ্বিষয়ে উত্তেজিত করিলেই কার্য্য সফল হইবেক।

ভদ্রপদবীস্থ যুবাদিগের জন্য ধাবন, পদচারণ, অশ্বারোহণ, মৃগয়া, মল্লক্রীড়া, জলক্রীড়া, গুটিকাচালন,* শরশিক্ষা, মুষ্টিযুদ্ধ,¶ উদ্যান রচনাদি, অশেষ প্রকার ব্যায়াম শিক্ষার নিয়ম আছে। পরন্তু সর্ব্বপ্রকার ব্যায়াম সকল ব্যক্তির প্রিয় নহে; কেহ মৃগয়ানুরক্ত, কেহ শরশিক্ষা ভক্ত,—কেহ ভ্রমণপ্রিয়, কেহ বা মল্লক্রীড়াসক্ত। এবম্প্রকার প্রভেদ, শরীর এবং মনের ভাব অনুসারেই হইয়া থাকে, অতএব যে যুবা যে প্রকার ব্যায়াম ভাল বাসেন, সুবিজ্ঞ শিক্ষকদিগের উচিত, তাঁহাকে সেইপ্রকার ব্যায়ামে নিযুক্ত করেন, যেহেতু যাহাতে যাহার স্পৃহা না থাকে, তাহাতে তাহাকে নিযুক্ত করিলে অচিরাৎ ক্লান্তি আসিয়া তাহার শরীর আক্রমণ করে, সুতরাং তাহার ধাতুপুষ্টি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

অপিচ, প্রথম শিক্ষার্থিদিগকে এককালেই গুরুতর পরিশ্রমপূর্ণ ব্যায়াম-শিক্ষা দেয়া কর্ত্তব্য নহে;—অশ্বারোহণ প্রতিযোগিতায় সুবিজ্ঞ তুরঙ্গারোহী প্রথমতঃ প্রস্থানকালে খরতরবেগ প্রার্থনা করেন না, ক্রমে লক্ষ্যস্থানের যত নিকটস্থ হইতে থাকেন, ততই তাঁহার উত্তেজনা বৃদ্ধি হইতে থাকে। নিশ্চেষ্ট অবস্থা হইতে এককালে ঘোরতর ব্যায়ামপরায়ণ হইলে রক্তের বেগ অত্যন্ত বর্দ্ধিক্নু হইয়া হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসধারাকে আহত করিতে পারে, তাহাতে যক্ষ্মা ও শ্বাসকাশ তথা রক্তপিত্তাদি প্রাণসংহারক রোগ সমূহের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব।

ব্যায়াম শিক্ষার নিমিত্ত প্রভাতকাল অতি শ্রেয়কল্প, প্রাতরুত্থান, প্রাতঃ-সমীর সেবন, প্রাতভ্রর্মণ, এবং প্রাতে তুরঙ্গারোহণ পূর্ব্বক মৃগয়াবৃত্তি চিরকালই সর্ব্বদেশে প্রশংসাস্পদ আছে।

মহাকবি কালিদাস শকুন্তলা নাটকে সেনাপতির মুখে মৃগয়ার প্রকৃতগুণ ব্যাখ্যা কল্পে কি অনুপম কবিত্বই প্রকাশ করিয়াছেন। যথাঃ—

মেদশ্ছেদ কৃশোদরং লঘুভবত্যুৎথান যোগ্যং বপুঃ।
সত্ত্বানামপি লক্ষতে বিকৃতিমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ॥

*Tennis and Cricket.
¶Fencing.

উৎকর্ষ স চ ধন্বিনাং যদ্ ইষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষে চলে।
মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি মৃগয়াম্ ঈদৃগ্বিনোদঃ কুতঃ।'

শ্রমভরে নিরন্তর, মেদহীন কলেবর,
কৃশোদর ধনুর্দ্ধর, সাহস সম্পন্ন অতিশয়।
পশুচয় ক্রোধে ভরে, বিকল হইলে পরে,
সে রঙ্গ সম্ভোগ করে মৃগয়া কুশল যারা হয়॥
যেইক্ষণে ধানুকীর, ছুটে খরতর তীর,
লক্ষোপরে পড়ে স্থির, কত সুখোদয় সে সময়।
মৃগয়া পরম সুখ, যে কহে ব্যসন দুঃখ,
মিথ্যাবাদী সে দুর্ম্মুখ, হেন সুখ আর নাকি হয়॥

অপর উষ্ণাতিশয় দেশে জলক্রীড়া অতি উপাদেয় ব্যায়াম মধ্যে গণনীয়। এতদ্দেশীয় প্রাচীন পুরুষেরা ইহাতে কিরূপ আসক্ত ছিলেন তদ্বিশেষ আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণন করিয়াছি। হিমাতিশয় দেশে তাহার তাদৃশ প্রয়োজনাভাব, তত্রত্য মনুষ্যের রক্তের প্রকৃতি স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ, বহ্নিসেবন ও সুরা পানাদি দ্বারা তাহার উষ্ণতা উৎপাদন হইয়া থাকে; তথায় লোমকূপ সকল পরিষ্কৃত রক্ষণার্থ গাত্র মার্জ্জনাই যথেষ্ট, কিন্তু উষ্ণাতিশয় দেশে মনুষ্যের রক্ত অতি বেগবান এবং প্রতপ্ত, সুতরাং ত্বকের পারুষ্য বশতঃ লোমকূপ দ্বারা শরীরস্থ ক্লেদসমূহ বিনির্গত হয় না, এজন্য স্নানাবগাহন দ্বারা ত্বকের কোমলত্ব সম্পাদন অতি প্রয়োজনীয়, এতদ্দেশে সুস্থশরীরে নিদাঘ-সময়ে ২।৩ বার অবগাহন সহ্য হয়,—অতএব ভারতবর্ষে যে সকল ইয়ুরোপীয় আগত হইয়া দেশীয়দিগের প্রথাবলম্বন না করিয়া বিলাতের ন্যায় স্নানবিরহে কালপাত করেন, তাঁহারা প্রায় ঘোরতর জ্বর-রোগগ্রস্ত হইয়া অকালে কাল প্রাপ্ত হয়েন,—কোন ইংলণ্ডীয় কবি যথার্থই কহিয়াছেন ঃ—

Let those who from the frozen Arctos reach
Parched Mauritainia or the sultry West,
Or the wide flood that laves rich Indostan,
Plunge thrice a day and in the tapid wave
Untwist their stubborn pores, that full and free
Th' evaporation thro' the soften'd skin
May bear proportion to the swelling blood,
So may they scape the fever's rapid flame,
So feel untained the hot breath of hell.

Pleasures of Health

পরিহরি জন্মভূমি হিমাদ্রি উত্তর।
দক্ষিণে, পশ্চিমে, যাঁরা যান দেশান্তর ॥
দিনকর করে দগ্ধ মরক্কোর দেশ।
অথবা মার্কিন যথা ঘোর গ্রীষ্ম ক্লেশ ॥
কিম্বা যথা পয়স্বিনী প্রসর পয়ান।
নানা ধন পূর্ণ হিন্দুদের জন্মস্থান ॥
তাঁহারা করুন স্নান দিনে তিনবার।
খুলুন চর্ম্মের গ্রন্থি দিয়ে জলধার ॥
মৃদুত্বকে উষ্ণভাব নির্গত হইবে।
প্রখর রক্তের বেগ সুখেতে বহিবে ॥
না আসিবে জ্বর-জ্বালা কভু সন্নিধান।
নরকাগ্নি শিখা থেকে পাইবেন ত্রাণ ॥

এইপ্রকার বিভিন্ন ব্যায়ামের উপকার ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণন করা বাহুল্য মাত্র,—বস্তুতঃ তত্তাবৎ যথা পরিমাণে অবলম্বিত হইলে মনুষ্য শরীরের পক্ষে নিরতিশয় সুখের কারণ হয়। এইক্ষণে প্রস্তাব সাঙ্গ সময়ে ইহাও বিজ্ঞাপ্য যে শরীর-সাধনী বিদ্যাশিক্ষার আর একটা বিশেষ গুণ এই যে তাহা যথা নিয়মে আচরিত হইলে শিরোদেশস্থ বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির স্থান সমূহ এবং শারীরিক সমুদায় প্রত্যঙ্গ যথাবিহিত রূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে,—মনে করুন, পল্লববিহীন স্থাণু এবং বহুপত্র ক্ষীণস্কন্ধ তরু কিরূপ অশোভার নিমিত্ত হয়,—কেবল অশোভার নিমিত্ত হয় এমত নহে, তাহাতে উক্ত প্রকার উদ্ভিৎ শরীরের সাস্থ্যবিরহতা এবং অসারতা সপ্রমাণ হইয়া থাকে। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অর্থাৎ সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকৃত পরিমাণে সংযোজিত হইলেই ভাল হয়,—তদ্রূপ সন্নিবেশিত সুন্দর দেহলাভ সাধারণ সৌভাগ্যের বিষয় নহে, এতদ্রূপ কলেবর লইয়া এদেশে অতি অল্পলোক জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, কোন কোন অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের গঠন প্রণালী ও শক্তি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আছে, তদনুগত অন্য অঙ্গ বা ইন্দ্রিয় যদি ক্ষীণ এবং ক্ষুদ্র হয় তবে অনেক রোগাকর্ষণ হওনের সম্ভাবনা থাকে, সেই অসৌভাগ্য নিবারণের উপায়, শরীর-সাধনী বিদ্যা-সঙ্গত ব্যায়ামচর্চা ব্যতীত আর কুত্রাপি প্রাপ্তব্য নহে। ইহা সর্ব্বদা স্মর্ত্তব্য যে, যেসকল অঙ্গের দৌর্ব্বল্য এবং খর্ব্বতা আছে তাহা উপযুক্তমত কার্য্য প্রয়োগাদিতে বিনিযুক্ত হইলেই বলিষ্ঠ এবং কর্ম্মিষ্ঠ হইতে থাকিবেক।

যদি কোন শিশুর বক্ষঃস্থল অপ্রশস্ত এবং তাহার শ্বাসাধার সংকুচিত ও ক্ষীণতর হয় তবে এই বিদ্যা শিক্ষার পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য আচরিত হইলেই উক্ত সংকীর্ণতা সংকোচ এবং ক্ষীণতা বিগত হইয়া তাহার বক্ষঃস্থল

ও শ্বাসাধার এরূপ বৃদ্ধি পাইবেক যে তাহাতে বহুতর রোগের আশঙ্কা নিবারিত হইবেক। এতদ্দেশীয় জালিয়া মালা ও বাঙ্গালিয়া ডিঙ্গীর মাল্লাদিগের ব্যবসায় গুণে তাহাদিগের বক্ষঃস্থলের সংকোচ বা সংকীর্ণতা প্রায় দৃষ্ট হয় না, তাহাদিগের বাহু, স্কন্ধ এবং হৃদয়-দেশ সর্ব্বদা কার্য্যে নিযুক্ত থাকাতে তদ্ব্যবসায়িদিগকে যক্ষ্মা প্রভৃতি ক্রূর রোগের গ্রাসে পতিত হইতে হয় না, তাহারা ভাগীরথীর শীতল সজল সমীর অনবরত সেবন করিলেও বক্ষঃঘটিত কোন পীড়া নিশাচরীর বলি রূপে নির্দ্দিষ্ট হয় না। এইরূপে সুশিক্ষা দ্বারা শরীরস্থ সর্ব্বপ্রকার বৈকল্য বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে, এমন কি যে সকল রোগ পৈতৃক অর্থাৎ পুরুষ পরম্পরা অবরোহিত হইয়া থাকে তাহাও ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হওয়া সম্ভব। সর্ব্বশেষে স্বদেশীয় লোকদিগের প্রতি সবিনয় নিবেদন এই যে, হে দেশীয় মহাশয়েরা! আপনারা আর কতকাল ভ্রমনিদ্রাঘোরে কালক্ষেপ করিবেন? সুখময় বিজ্ঞান প্রভাকর করে প্রাচীদেশ আলোকময় হইতেছে,—দুর্ভাগ্য তিমির খণ্ড বিখণ্ড হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে ধাবমান হইতেছে, উপদেশ তাম্রচূড়ের সুগভীর শব্দতরবে দেশ পরিপূর্ণ হইতেছে, ঐ দেখ! ক্ষোভরূপ নিশাকর নিরাশা নীরধিনীরে নিমজ্জিত হইতেছে! অতএব আর কালবিলম্ব কেন? গাত্রোত্থান কর, সুসময় বুঝিয়া সৌভাগ্য ক্ষেত্রে সুখ শস্য উৎপাদনার্থ উদ্যোগি হও; যাহাতে শ্রান্তি আসিয়া সহসা তোমাদিগের দেহ গেহ আক্রান্ত করিতে না পারে,—যাহাতে পীড়া পিশাচী তোমাদিগের প্রতি অহরহ কটু কটাক্ষ সম্পাত দ্বারা আতঙ্ক উদয় করিতে না পারে, এবং যাহাতে হতাশ্বাস হস্তী তোমাদিগের উদ্যোগ রূপ উৎপলবন দলন করিতে না পারে, তজ্জন্য কায়মনোবাক্যে সচেষ্ট হও, আর নিশ্চেষ্ট থাকিবার সময় নাই,—ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, একাগ্রতা, উৎসুকতা, শ্রম-পরতা প্রভৃতি পুরুষার্থ সমূহ শরীর-সাধন ব্যতীত কিরূপে লাভ করিবে? হা! তোমরা যখন বীরবপু অন্য-দেশীয় লোকদিগের সমাজে স্বজাতীয় লোকের শারীরিক লাবণ্য এবং ক্ষুদ্রতা দর্শন করহ, তখন কি তোমাদিগের মনে লজ্জার উদয় হয় না? তখন কি অনুতাপানলে তোমাদিগের চিত্ত দগ্ধ হয় না?—তখন কি স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধি জননের বাসনা আবির্ভূত হয় না? আমরা যে মৃত মহাত্মার স্মরণোদ্দেশে অদ্য এই সভায় সমবেত হইয়াছি,—সেই মহাশয় সদৃশ ইয়ুরোপীয় সদাশয়গণ অস্মজ্জাতিকে মসীজীবী স্বাবৃত্তি পদারূঢ় করণার্থই পরিশ্রম পথে প্রাণাবশেষ করিয়া যান নাই, তাঁহাদিগের সংকল্প সিদ্ধি পক্ষে তোমরা কিজন্য উদ্যোগ পরায়ণ না হও? জগতীতলে প্রধান জাতি পদবী আরোহণের আশা কিছু স্বপ্নবৎ অসার নহে, অন্বেষণ করিলেই তাহা প্রাপ্ত হইবে ইতি।

সম্পূর্ণম্।

পরিশিষ্ট

মহাত্মা ডেভিড হেয়ার

যাঁহাদিগের যত্নে ও চেষ্টায়, অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল হইতে এ দেশে উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে মহাত্মা ডেভিড হেয়ার একজন প্রধান।

ডেভিড হেয়ার ১৭৭৫ সালে, স্কট্‌লণ্ড দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঘড়ির ব্যবসায় শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮০০ সালে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। সে সময়ে এখানে ঘড়ির ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা ছিল না, তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

১৮১৬ সালে তিনি শ্রীযুক্ত ই, গ্রে সাহেবকে তাঁহার কারবার সমর্পণ করেন। সেই জন্য, সেই সময়ের কোন সংবাদপত্রে আমোদ করিয়া লেখা হইয়াছিল, "Old hair turned grey."

হেয়ার সাহেব রাজা রামমোহন রায়ের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের নিকটে হেয়ার সাহেব মদ্‌গুর (মাগুর) মৎস্য আহার করিতে শিক্ষা করেন। হেয়ার সাহেব উহা আহার করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। যখন রাজা বিলাত যান, তখন হেয়ার সাহেব তাঁহার লণ্ডনস্থ সহোদর ভ্রাতৃগণকে পত্র দিয়াছিলেন যে, রাজা ইংলণ্ডে বিদেশী, অনেকপ্রকার অসুবিধায় পড়িবার সম্ভাবনা, সুতরাং তাঁহারা তাঁহাকে যেন বিশেষ যত্ন করেন। রাজার ইংলণ্ডবাস কালে তাঁহারা রাজার কিরূপ সেবা করিয়াছিলেন, তাহা রাজার জীবনবৃত্তান্তে বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে।

বাঙ্গালীদিগের সহিত হেয়ার সাহেবের যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল। তিনি বন্ধুভাবে লোকের বাড়ী বাড়ী যাইতেন, সকলের সুখ দুঃখের সংবাদ লইতেন। তিনি বাঙ্গালী জাতির কল্যাণের জন্য আপনার জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন।

সে সময়ে ইংরেজী শিক্ষার বড়ই দুরবস্থা, রাম রাম মিশ্র প্রথম ইংরেজী-ওয়ালা। তখন যিনি যত অধিক ইংরেজী শব্দ জানিতেন, তিনি তত বড় পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতেন। ইংরেজী শিক্ষার জন্য ক্রমে ক্রমে কলিকাতা নগরে কয়েকটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। রামমোহন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু, ভুবন দত্ত, শিবু দত্ত, আরাটুন পিটার্স্, সেরবরণ (Sherburn) প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি কলিকাতায় ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। এই সকল বিদ্যালয়ে অতি সামান্য ইংরেজী শিক্ষা হইত।

পড়াইবার পুস্তক প্রায় কিছুই ছিল না। Thomas Dyce's Spelling,

School Master, Arabian Nights, Pleasing Tales, ইত্যাদি পাঠ্যপুস্তক ছিল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অতি শোচনীয় অবস্থা ছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মনসামঙ্গল, ধর্ম্মজ্ঞান, কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, গুরু-দক্ষিণা, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর, এই কয়েকখানি প্রচলিত পুস্তক ছিল। বালকদের পড়িবার উপযুক্ত পুস্তক কিছুই ছিল ছিল না। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় লেখা পড়া শিক্ষা হইত।

এই সময় ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবার জন্য হেয়ার সাহেব সুপ্রীম কোর্টের চীফ জষ্টিস্ স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট সাহেবের সহিত দেখা করেন। তিনি সকল কথা শুনিয়া বলিয়া বলিলেন যে এ বিষয়ে আমি বিবেচনা করিব।

ক্রমে হিন্দুকলেজ সংস্থাপিত হইল। হিন্দুকলেজ সংস্থাপন জন্য একটি কমিটি হইয়াছিল। ৮ জন ইয়োরোপীয় এবং ২০ জন দেশীয় উহার সভ্য ছিলেন। হেয়ার সাহেব দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিতেন। এবং সকল বিষয়ে সৎ পরামর্শ দিতেন।

১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারী গরানহাটার গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা দিবসে অনেক দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক এবং তিনজন সম্ভ্রান্ত ইয়োরোপীয় উপস্থিত ছিলেন। তম্মধ্যে হেয়ার সাহেব অবশ্য একজন।

হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজের জন্য বাটী নির্ম্মিত হইল। কিন্তু হিন্দু-কলেজের নামেই ভিত্তি সংস্থাপন হইয়াছিল। এই গৃহ নির্ম্মাণের জন্য গবর্ণ-মেণ্ট ১২৪০০ টাকা দিয়াছিলেন। কলেজ স্কোয়ারের উত্তর দিকে ডেভিড হেয়ারের কিছু ভূসম্পত্তি ছিল। তিনি উহা এই মহৎ কার্য্যে দান করেন। ১৮২৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী বিদ্যালয়গৃহের ভিত্তি সংস্থাপন হয়।

পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ মহাশয় হিন্দু কলেজের একজন ছাত্র ছিলেন। হেয়ার সাহেব এইরূপ ছাত্রদিগের উপকার করিতে ও তাঁহা-দিগকে উৎসাহ দিতে সর্ব্বদাই বিশেষ যত্নশীল থাকিতেন। হেয়ার সাহেবের সুপারিসে রামগোপাল বাবু কলিকাতার এক সদাগরের আপিসে সহকারিরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই কার্য্য হইতে ক্রমে যে তাঁহার কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

হেয়ার সাহেবের মহৎ চরিত্র ও সদ্গুণ সকল দেখিয়া হিন্দুকলেজের শিক্ষক ডিরোজিওর ছাত্রগণ তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিতে লাগিলেন। হেয়ার সাহেবকে প্রকাশ্যরূপে সম্মান করিবার জন্য তাঁহারা তাঁহার

যোড়াসাকোস্থ মাধব চন্দ্র মল্লিকের বাটীতে একটি প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিলেন।

উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত রাধানাথ শিকদার বলিলেন, "হেয়ার সাহেব আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিবার পক্ষে প্রভাত-তারা।" পার্চমেন্ট কাগজে একখানি অভিনন্দন পত্র লিখিত হইয়াছিল। উহা হেয়ার সাহেবকে প্রদত্ত হইল। পরলোকগত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বলিলেন, —'আপনি মাতার ন্যায় আমাদিগকে স্তন্যপান করাইয়াছেন।' হেয়ার সাহেব এই মিষ্ট কথাটিতে ঈষৎ হাস্য করিয়া মাথা নাড়িলেন।

হেয়ার সাহেবের প্রশংসা করিয়া ছাত্রগণ যে সকল বক্তৃতা করিলেন, তিনি তাহার উত্তরে যাহা বলিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই, "আমি বীজ বপন করিয়াছিলাম ; এক্ষণে উহা বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছি।' ইত্যাদি।

এই সকল ছাত্রদিগের উদ্যোগে ও ব্যয়ে হেয়ার সাহেবের একটি ছবি প্রস্তুত হইয়াছিল। উহা এক্ষণে হেয়ারস্কুলে আছে।

অনেকের চেষ্টায় হিন্দুকলেজ সংস্থাপিত হয়, সত্য, কিন্তু তন্মধ্যে হেয়ার সাহেবই প্রকৃত সংস্থাপক। তিনি ভিন্ন এ কার্য্য হইতে পারিত না। কলেজ সংস্থাপন বিষয়ে, হেয়ার সাহেব সকলকে এক মতে আনেন, এবং তজ্জন্য উপযুক্ত উপায় সকল অবলম্বন করিবার জন্য তিনি সকলকে উৎসাহিত করেন। এই হিন্দুকলেজের কলেজবিভাগ এক্ষণে প্রেসিডেন্সি কলেজরূপে, এবং স্কুলবিভাগ হিন্দু স্কুলরূপে পরিণত হইয়াছে।

হিন্দুকলেজ সংস্থাপনের কিছু কাল পরে তিনি কলিকাতা ছোট আদালতের কমিসনর নিযুক্ত হন। তথাচ তিনি অধিকাংশ সময় হিন্দু-কলেজের তত্ত্বাবধানে ক্ষেপণ করিতেন।

হেয়ার সাহেবের দ্বারা বহুল পরিমাণে মেডিকেল কলেজের উন্নতি হইয়াছিল। উক্ত কলেজ সংস্থাপন সময়ে যে সকল গুরুতর বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হেয়ার সাহেবের চেষ্টাতেই দূরীভূত হয়। হিন্দুসন্তান শবচ্ছেদ করিয়া ধর্ম্মচ্যুত হইবে বলিয়া গোড়া হিন্দুরা ঘোরতর আপত্তি উপস্থিত করিয়া ছিলেন।

বাবু শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, তিনি এক দিবস হেয়ার সাহেবের নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় সংস্কৃত কলেজের আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক মধুসূদন গুপ্ত মহাশয় দ্রুত পদে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হেয়ার সাহেব তাঁহাকে দেখিবা মাত্র বলিলেন, "মধু, তুমি এত কাল কি করিতেছিলে ? তুমি কি জান না যে, প্রায় এক সপ্তাহ কাল আমি কিরূপ দুর্ভাবনা ভোগ করিতেছি ? আমি রাধাকান্তের (রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর) সহিত

দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে যাহা বলিলেন, তাহাতে আশা হইয়াছে। তোমার কি বলিবার আছে বল ? তুমি কি তোমাদের শাস্ত্রে এমন কোন শ্লোক পাইয়াছ, যাহাতে শবচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে ?" মধুসূদন উত্তর করিলেন, "মহাশয়, গোড়া হিন্দুদের আপত্তির জন্য কোন ভয় করিবেন না। যদি তাঁহারা প্রতিবাদ করেন, আমি এবং আমার পণ্ডিত বন্ধুগণ তাহার উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, তাঁহারা তাহা করিবেন না।" হেয়ার সাহেব এই সকল কথায় সান্ত্বনা পাইলেন। বলিলেন, আমি কল্য এ বিষয়ের জন্য লাট সাহেবের সহিত দেখা করিতে যাইব।

১৮৩৩ সালে তিনি মেডিকেল কলেজের সেক্রেটারি হন এবং কলেজের উন্নতি সাধনের জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিছুকাল পরে তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করিলে, গবর্ণমেণ্ট তাহাকে কলেজের সম্মানিত সভ্যের পদে নিযুক্ত করেন। সম্মানিত সভ্যরূপেও তিনি কলেজের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তিনি চিরজীবনই মেডিকেল কলেজের হিতসাধনে যত্নশীল ছিলেন।

হেয়ার সাহেব কলিকাতা স্কুল সোসাইটির ইয়োরোপীয় সম্পাদক ছিলেন। এই সভার সম্পাদকরূপে তিনি ইহার পাঠশালা সমূহের ভার গ্রহণ করিয়া সে সকলের উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। আরপুলি পাঠশালা তাঁহার বিশেষ তত্ত্বাবধানে ছিল। তাহার সমস্ত ব্যয় তিনি নিজে বহন করিতেন।

ছাত্রগণ যাহাতে বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করে, তদ্বিষয়ে তিনি অতিশয় মনোযোগী ছিলেন! তিনি মনে করিতেন যে, কেবল ইংরেজী শিখিলেই হইবে না, বাঙ্গালা ভাষা সুন্দররূপে শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক।

কলিকাতায় জুভিনাইল সোসাইটি নামে একটি সভা ছিল। উক্ত সভা হইতে শ্যামবাজার, জানবাজার, ইটালি পদ্মপুকুর প্রভৃতি স্থানে বালিকা বিদ্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যে স্কুল-বুক-সোসাইটির কথা বলিয়াছি, স্ত্রীশিক্ষা প্রচার করা তাহারও একটি উদ্দেশ্য ছিল। এই সকল সভার সহিত যোগ দিয়া হেয়ার সাহেব অনেক কার্য্য করিতেন। রাধাকান্ত দেবের বাটীতে বালিকাদিগের বাসৎরিক পরীক্ষা গৃহীত হইত। ক্রমে উহা রহিত হইয়াছিল।

হেয়ার সাহেব স্কুল-বুক-সোসাইটিতে বাৎসরিক ১০০ শত টাকা চাঁদা দিতেন। এই সকল সভা হইতে যে সকল পুস্তক প্রকাশ হইত, তাহা স্কুলের শিক্ষকদিগের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ করা হইত।

হিন্দুকলেজের ছাত্র, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে লইয়া হিন্দুকলেজের শিক্ষক ডিরোজিও সাহেব

একাডেমিক এসোসিয়েশন (Academic Association) নামক একটি সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মানিকতলার যে বাড়িতে ওয়ার্ডস্‌ ইনিষ্টিটিউষণ ছিল, সেই বাড়ীতেই উক্ত সভা হইত। হেয়ার সাহেব তথায় নিয়মিতরূপে গমন করিতেন, ও মনোযোগপূর্ব্বক বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। কিছু দিন পরে মানিকতলার বাটী হইতে হেয়ার সাহেবের স্কুল গৃহে সভা উঠিয়া আসিয়াছিল। ডিরোজিও সাহেব উক্ত সভার সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিলে হেয়ার সাহেব সভাপতি হইয়াছিলেন। সভার দিনে, সভার কার্য্য হইয়া গেলে পর, হেয়ার সাহেব কোন কোন সভ্যের সহিত গল্প করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

১৮৩৮ সালের ১২ই মার্চ্চ একটি নূতন সভা সংস্থাপিত হইল। উহার নাম Society for the Acquisition of General Knowledge। হেয়ার সাহেব এই সভার সম্মানিত দর্শক (Honorary Visitor) পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি নিয়মিতরূপে সভার অধিবেশনে উপস্থিত হইতেন।

হিন্দুকলেজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কলেজের নিকটেই একটী পাঠশালা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। হেয়ার সাহেব উক্ত পাঠশালার ভিত্তি সংস্থাপন করেন।

হেয়ার সাহেব যে কেবল এ দেশের বালক ও যুবকদিগের শিক্ষার জন্যই যত্ন করিতেন এমন নহে, অন্যান্য দেশহিতকর কার্য্যেও তিনি উৎসাহের সহিত নিযুক্ত হইতেন। কয়েকটি রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি বিশেষ ভাবে যোগ দিয়াছিলেন। প্রথম তাঁহার সময়ে এরূপ একটি আইন হইয়াছিল, যাহাতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এবং প্রকাশ্য সভা করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিবার জন্য কলিকাতাবাসিগণের এক সভা হয়। এই সভায় হেয়ার সাহেব একজন বক্তা ছিলেন। এই সভার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে কমিটি হইয়াছিল, হেয়ার সাহেব তাহারও একজন সভ্য ছিলেন।

দ্বিতীয়, যাহাতে দেওয়ানি মোকদ্দমায় সুপ্রীম্‌ কোর্টে জুরির বিচার প্রবর্ত্তিত হয়, এবং যাহাতে মফঃস্বল আদালতেও ক্রমে ক্রমে উক্তরূপ বিচারের ব্যবস্থা হইতে পারে, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিবার জন্য ১৮৩৫ সালের ৮ই জুলাই টাউন হলে কলিকাতাবাসিগণের একটি প্রকাশ্য সভা হয়। এই সভার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে কমিটি হইয়াছিল, হেয়ার সাহেব তাহারও একজন সভ্য ছিলেন

তৃতীয়, সে সময়ে এমন একটি আইন হইয়াছিল যাহাতে মফঃস্বল আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে, ব্রিটিস্‌ প্রজাগণের বিলাত আপিল করিবার ক্ষমতা

কাড়িয়া লওয়া হয়। এই অন্যায় আইন রহিত করিবার জন্য পার্লমেণ্টে আবেদন করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৩৬ সালের ১৮ই জুন কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসিগণের এক মহা সভা হইয়াছিল। হেয়ার সাহেব উক্ত সভায় এই প্রস্তাব করেন, যে সভার উদ্দেশ্য সংসাধনজন্য বিলাতে একজন এজেণ্ট প্রেরণ করা হয়।

চতুর্থ, সে সময়ে কুলীদিগের প্রতি ভীষণ অত্যাচার হইতেছিল। হেয়ার সাহেব তাহা নিবারণ করেন। ১৮৩৫ সালে এদেশীয় কুলিদিগের মরিসাস ও বোরবোন্ যাত্রা আরম্ভ হয়। যাইবার উদ্দেশ্য পরিষ্কাররূপে বুঝিয়া, স্বাধীনভাবে যে সকলে যাইত, এমন নহে। অনেক কুলি প্রতারিত হইত। অনেক মিথ্যা কথা বলিয়া, অনেক মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদিগকে স্বদেশ হইতে লইয়া যাওয়া হইত।

পটলডাঙ্গার একটা বাড়ীতে প্রায় একশত কুলিকে দরজায় তালা দিয়া বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। হেয়ার সাহেব এ বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য প্রায় প্রতিদিন উক্ত স্থানে যাইতেন। তিনি চেষ্টা করিয়া ঐ সকল কুলিকে মুক্ত করিলেন।

কুলিদিগের উপকার করার অপরাধে অনেক লোক হেয়ার সাহেবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু হেয়ার সাহেব ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। কুলিদিগের অত্যাচারের বিষয়ে তিনি ক্রমাগত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শেষে এই অত্যাচার নিবারণ জন্য ১৮৩৮ সালের ১০ই জুলাই টাউন হলে একটি সভা হইল। এই সভা হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা হইল যে, কুলীদিগের প্রতি অত্যাচারের বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিসন নিযুক্ত করা হয়। গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য ১৮৩৮ সালে একটি কমিসন নিযুক্ত করেন। হেয়ার সাহেব এই কমিসনের সম্মুখে কুলিদিগের প্রতি অত্যাচারের বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন। কমিসন রিপোর্ট করিলেন যে, কুলি-দিগকে যথার্থই ঠকাইয়া, ভুলাইয়া বিদেশে লইয়া যাওয়া হয়। ইহাদ্বারা তৎকালে এই অত্যাচার নিবারিত হইয়াছিল।

পঞ্চম, ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য বিলাতে ব্রিটিস ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামে একটি সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাহার সহিত যোগ দিয়া কার্য্য করিবার জন্য ১৮৩৯ সালে এখানে একটি সভা হয়। হেয়ার সাহেব ইহার একজন উদ্যোগী ছিলেন। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এ বিষয়ে সভাতে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, হেয়ার সাহেব তাহার সমর্থন করেন।

হেয়ার সাহেবের আর একটি কার্য্য। সে সময়ে এ দেশের আদালত সমূহে ইংরেজী ভাষা প্রচলিত ছিল না। হেয়ার সাহেব জানিতেন, ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার হইলে, এ দেশের বিশেষ কল্যাণ হইবে। আদালত সমূহে

যদি ইংরেজী ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে, এবং ইংরেজী স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের জীবিকা অর্জ্জনের বিশেষ সুবিধা হইবে। সেই জন্য তিনি হিন্দু-কলেজের ম্যানেজার, ছাত্রগণ ও তাহাদের অভিভাবকগণের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করাইলেন যে, আদালত সমূহে ইংরেজী ভাষা প্রচলিত হয়। গবর্ণমেণ্ট ইহার উত্তরে বলিলেন যে, আপাততঃ পরীক্ষাস্বরূপ নিকটবর্ত্তী কোন কোন জিলার আদালতে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইবে।

সর্ব্বপ্রকার সৎকার্য্যের সহিত হেয়ার সাহেবের যোগ ছিল। ১৮৩৬ সাল হইতে তিনি ভারতবর্ষীয় কৃষিজাত ও উদ্যানজাত সামগ্রী সম্বন্ধীয় সভার **(Agricultural and Horticultural Society in India)** জনৈক সভ্য ছিলেন। তিনি উহার মাসিক অধিবেশনে নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইতেন। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির একজন সভ্য ছিলেন। ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটিতে নিয়মিতরূপে চাঁদা দিতেন।

হেয়ার সাহেবের শরীর সুস্থ ও সবল ছিল। পদব্রজে দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিতে পারিতেন। একদিবস তাঁহার বাসস্থানে একটি যুবা পুরুষ আসিয়া চা পান করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত পদব্রজে ভ্রমণের কথা হওয়াতে তিনি হেয়ার সাহেবকে এমন কিছু কথা বলিলেন, যাহাতে হেয়ার সাহেব পদব্রজে ভ্রমণ বিষয়ে তাঁহার সহিত লড়াই দিতে চাহিলেন। যুবা পুরুষটি তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন উভয়ে একত্রে ব্যারাকপুর পর্য্যন্ত সাত ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গেলেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহারা যখন হেয়ার ষ্ট্রীটে, অর্থাৎ হেয়ার সাহেবের বাসস্থানের নিকটে পেঁছিলেন, তখন সেই যুবা পুরুষটি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আর তাঁহার পা উঠে না। কিন্তু হেয়ার সাহেব তখনও শ্রান্ত হন নাই। তিনি অবশিষ্ট পথটুকু দৌড়িয়া গিয়া আপনার গৃহে পেঁছিলেন। হেয়ার সাহেবেরই জয় হইল!

হেয়ার সাহেব সামান্য দ্রব্য আহার করিতেন। কলিকাতার মাখন ভাল নয় বলিয়া উহা খাইতেন না। বলিতেন, উহা কেবল গাড়ীর চাকাতে লাগাইবার যোগ্য।

ছাত্রগণের প্রতি হেয়ার সাহেবের অসাধারণ যত্ন ছিল। যদি শুনিতেন কোন ছাত্রের পীড়া হইয়াছে, তিনি ঔষধ লইয়া তাহার বাসস্থানে গিয়া নিজে তাহার চিকিৎসা ও সেবা করিতেন। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, তিনি একবার জ্বররোগে আরোগ্য লাভ করিয়া হেয়ার সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। হেয়ার সাহেব অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমাকে জ্বরের সময় সংবাদ দেও

নাই কেন? আমি তাহা হইলে ঔষধ লইয়া গিয়া তোমার চিকিৎসা করিতাম।"

স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন তিনি একবার ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। হেয়ার সাহেব তাহাকে কিছু ঔষধ সেবন করিতে দিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরে তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। একটি অতি জঘন্য, অপরিষ্কার গলির ভিতরে রামতনু বাবুর বাসা ছিল। হেয়ার সাহেব গভীর রাত্রিকালে তথায় আসিয়া দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। বাটীর লোক মনে করিল, কোন মদ্যপায়ী ইয়োরোপীয় খালাসি ঐরূপ করিতেছে। সুতরাং তাহারা ভয় পাইয়া কিছুতেই দ্বার খুলিতে চাহিল না। হেয়ার সাহেব তাহা বুঝিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন;—"হাম হেয়ার সাহেব হ্যায়, খোল্ দেও।" তখন দরজা খোলা হইল! তিনি ভিতরে আসিলেন।

আর একবার স্বর্গীয় লাহিড়ী মহাশয়ের জ্বর হইয়াছিল। তিনি জ্বরবিচ্ছেদে গুঁড়া কুইনাইন সেবন করিতে সম্মত নহেন বলিয়া, হেয়ার সাহেব কুইনাইনের বড়ি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে দিয়া গিয়াছিলেন।

বাবু চন্দ্রকুমার মৈত্র বলেন;—"একদিন হেয়ার সাহেব শুনিলেন যে, বাগবাজারে রাধানাথ সেন জ্বররোগে কষ্ট পাইতেছেন। আমারও বাসস্থান ঐ অঞ্চলে শুনিয়া তিনি আমাকে অনুরোধ করিলেন যে, আমি তাঁহার সঙ্গে রাধানাথ সেনের বাটীতে যাই। সে দিন বেলা চারিটা হইতে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত অবিশ্রান্ত মুষলধারে বৃষ্টি হইয়াছিল। তথাচ তিনি রাত্রি ৯টার সময় আমাকে সঙ্গে লইয়া একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ীতে রাধানাথ সেনের বাটীতে গমন করিলেন। তথায় দুই ঘণ্টা কাল রোগীর চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিলেন।

হেয়ার সাহেবের স্কুলের কোন ছাত্র পীড়িত হইলে তিনি তাহার বাসস্থানে গিয়া তাহার চিকিৎসা ও সেবায় নিযুক্ত হইতেন। ছাত্র দরিদ্র হইলে নিজ ব্যয়ে ঔষধ দিতেন এবং পথ্যের জন্য টাকা দিতেন। স্কুলের ছুটির সময় বৃষ্টি হইলে তিনি বালকদিগকে ভিজিয়া বাটী যাইতে দিতেন না। ক্ষুধায় কষ্ট পাইবে বলিয়া নিজ ব্যয়ে খাদ্য আনাইয়া তাহাদিগকে খাইতে দিতেন। বৃষ্টি শীঘ্র না ধরিলে ভাড়াটিয়া গাড়ী অথবা ছাতাওয়ালা* ডাকিয়া নিজ ব্যয়ে বালকদিগকে বাটী পাঠাইয়া দিতেন।

* সে সময়ে কলিকাতার নানা স্থানে উৎকল দেশীয় অনেক ছাতাওয়ালা দেখিতে পাওয়া যাইত; রৌদ্র বাবৃষ্টির সময় তাহাদিগকে পয়সা দিলে তাহারা ছত্রধারণ করিয়া লোককে গন্তব্যস্থানে রাখিয়া আসিত। কার্ত্তিকপূজার সময় অনেক কার্ত্তিকের পশ্চাতে যে ছত্রধারী উড়িয়া বেহারা দেখা যায়, তাহার মূল এই।

স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, বালকেরা যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। প্রায়ই দেখা যাইত যে, অপরাহ্নে স্কুলের ছুটি হইবার সময় হেয়ার সাহেব একখানি পরিষ্কার তোয়ালে হস্তে লইয়া সদর দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতেন। উহা দ্বারা অনেক বালকের শরীরে মুছিয়া দেখিতেন, তাহারা পরিষ্কার থাকিতে যত্ন করে কিনা। হেয়ার সাহেবের ভয়ে বালকেরা নিজ নিজ দেহ নির্ম্মল রাখিতে যত্ন করিত।

হেয়ার সাহেব বালকদিগকে প্রহার ভাল বাসিতেন না। বাবু গোবিন্দ-চন্দ্র দত্ত বলেন যে, তিনি বাল্যকালে হিন্দুকলেজের স্কুলবিভাগের ছাত্র ছিলেন। তিনি যে শ্রেণীতে পাঠ করিতেন তাহার শিক্ষক, ছাত্রদিগকে অতিশয় প্রহার করিতেন। তিনি মনে করিতেন যে, চক্মকির পাথরে ইস্পাতের আঘাত করিলে যেমন তাহাতে অগ্নির প্রকাশ হয়, সেইরূপ বালকদিগকে প্রহার করিলে তাহাদের বুদ্ধির বিকাশ হইয়া থাকে। বাৎসরিক পরীক্ষার সময় যত নিকট হইত, তাহার প্রহারের পরিমাণও সেই অনুসারে বৃদ্ধি হইত। অর্থাৎ পরীক্ষা হইবার আটাশ দিন যখন বিলম্ব থাকিত, তখন প্রত্যেক ভুলের জন্য একখানি তালের পাখার বাঁটের দ্বারা দুই ঘা করিয়া প্রহার করিতেন। ছাব্বিশ দিন বিলম্ব থাকিতে তিন ঘা। চব্বিশ দিন বিলম্ব থাকিতে চারি ঘা। পরীক্ষা নিতান্ত নিকটে আসিয়া পড়িলে প্রত্যেক ভুলের জন্য দশ কিম্বা বার ঘা প্রহার হইত। গোবিন্দ বাবু বলেন যে, যে দিন আট ঘা প্রহারের দিন, সে দিন তাঁহার একটা ভুল হওয়াতে তিনি প্রথম একটী ঘা খাইয়াই এত কাঁদিতে লাগিলেন যে, শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, আজ তবে থাক্, অবশিষ্ট কয়েক ঘা আর একদিন হইবে। অনাদায়ী ঋণের ন্যায় উহা আর একদিন আদায় করিবেন। কিন্তু গোবিন্দ বাবুর ভাগ্যক্রমে তিনি উহা আদায় করিতে চেষ্টা করেন নাই।

শিক্ষক মহাশয়ের তাল বৃন্তটিতে দুটি কার্য্য হইত। প্রথম বালকদিগকে প্রহার করা, দ্বিতীয় গ্রীষ্মকালে আপনাকে বাতাস করা। একদিন কিছু অতিরিক্ত পরিমাণে ঐ পাখার বাঁটের দ্বারা তিনি একটি বালককে প্রহার করিয়াছিলেন। হেয়ার সাহেব প্রত্যহ কলেজে আসিয়া তত্ত্বাবধান করিতেন ও প্রত্যেক শ্রেণীর সংবাদ লইতেন। সুতরাং এ কথা তাঁহার কর্ণে উঠিল। তিনি মৃদু হাস্য করিতে করিতে ঐ শ্রেণীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাশয়ের নিকটে আসিয়া তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ কথা কহিলেন। তৎপরে তাঁহার পাখাখানি লইয়া আপনার জেব একখানি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া উহার বাঁটটী গোড়া পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিলেন। এই মহৎ কার্য্যটি

সম্পন্ন করিয়া তিনি দণ্ডায়মান হইয়া ছাত্রদিগের প্রতি একবার তাকাইলেন। তৎপরে উচ্চ হাস্য করিয়া অবশিষ্ট তালবৃন্তটি বায়ুসেবন করিবার জন্য শিক্ষক মহাশয়ের হস্তে দিয়া তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

হেয়ার সাহেব অতিশয় সাহসী লোক ছিলেন। একদিন কলেজের সম্মুখ দিয়া একজন বলবান্ বিলাতী খালাসী মাতাল যাইতেছিল। কলেজের সম্মুখে একজন ছাত্রের গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। সে উহার কোচম্যানের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। কোচম্যান ও সহিস ভয়ে গাড়ী ফেলিয়া পলায়ন করিল। তখন সে কলেজের প্রাঙ্গণ হইতে একটা প্রকাণ্ড যষ্টি কুড়াইয়া লইয়া গাড়ীখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল। কলেজের দরোয়ানেরা উহা নিবারণ করিতে আসিল বটে, কিন্তু সে তাহাদিগকে এমন প্রবলভাবে আক্রমণ করিল যে, তাহারাও ভয়ে চম্পট দিল। তখন খালাসী গাড়ীখানি চূর্ণ করিয়া অদৃশ্য হইল।

এমন সময় হেয়ার সাহেব আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন দরোয়ানেরা আসিয়া তাঁহার নিকট আনুপূর্ব্বিক সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া যে দিকে সেই খালাসি চলিয়া গিয়াছে দেখাইয়া দিল। হেয়ার সাহেব তখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তথাচ তিনি তীরের ন্যায় বেগে দৌড়িয়া গিয়া সেই মাতাল খালাসিকে ধরিয়া পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় বলেন যে, সিমলা কালীতলায় একদিন রাত্রে একজন চোর এক শিশুর অলঙ্কার চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছিল। হেয়ার সাহেব তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করাতে, সে একটা যষ্টি দ্বারা তাঁহার মস্তকে এমন আঘাত করিল যে, তাহাকে কিছুদিন শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল।

বালকেরা হেয়ার সাহেবকে এত ভালবাসিত যে, তাহারা তাঁহার বাটীতে পর্য্যন্ত গমন করিত। তিনি তাহাদিগকে অতিশয় যত্ন করিতেন। তাহাদের সহিত গল্প করিতেন, তাহাদিগকে ক্রীড়ার সামগ্রী সকল উপহার দিতেন।

বাবু চন্দ্রশেখর দেব বলেন যে, তিনি এক দিন অপরাহ্নে হেয়ার সাহেবের বাটীতে যাইবার সময় পথে বৃষ্টিতে ভিজিয়াছিলেন। তথায় পৌঁছিবামাত্র হেয়ার সাহেব তাহাকে আর্দ্র বস্ত্র ছাড়াইলেন। নিজ হস্তে উহা নিঙ্গড়াইয়া ভৃত্যকে শুকাইতে দিলেন। নিজের রুমাল দিয়া তাহার মাথা মুছাইয়া দিলেন। পরে একটী তাড়িত যন্ত্র ও একটী গ্যালভেনিক ব্যাটারি লইয়া তাঁহাকে আমোদ দিতে লাগিলেন।

আর একদিন চন্দ্রশেখর বাবু হেয়ার সাহেবের বাটীতে অপরাহ্নে উপস্থিত হইলে পর বৃষ্টি হইতে লাগিল, শীঘ্র থামিল না। সন্ধ্যার পর পর্যন্ত বৃষ্টি হইতে লাগিল। চন্দ্রশেখর বাবু বাটী ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন।

কিন্তু তিনি তাঁহাকে ভিজিয়া বাটী যাইতে দিলেন না। তাঁহার আহারের সময় উপস্থিত হওয়াতে তিনি নিকটবর্ত্তী ময়রার দোকানে চন্দ্রশেখর বাবুর আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া নিজে আহার করিতে গেলেন। তৎপরে তিনি চন্দ্রশেখর বাবুকে বাটী পৌঁছিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পটলডাঙ্গায় তাঁহার পৈতৃক বাটীর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি কি এখান হইতে বাটী যাইতে পারিবে? যাইতে পারিব, বলিয়া চন্দ্রশেখর বাবু বাটীর দিকে দৌড়িয়া গেলেন। কিন্তু ইহাতে হেয়ার সাহেবের মন বুঝিল না। তিনি তাঁহার পৈতৃক বাটীর সম্মুখে গিয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বালক পৌঁছিয়াছে কি না। তাঁহার পিতা আসিয়া বলিলেন যে, সে বাটী পৌঁছিয়াছে। তখন হেয়ার সাহেব নিশ্চিন্তমনে ফিরিয়া গেলেন।

বালকদিগের উন্নতির জন্য হেয়ার সাহেব নানাপ্রকারে চেষ্টা করিতেন। অলস বালকদিগকে পরিশ্রমী হইবার জন্য উত্তেজিত করিতেন, পরিশ্রমী বালকদিগকে পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করিতেন। কোন্নগর নিবাসী স্বর্গীয় শিবচন্দ্র দেব মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, তিনি যখন হিন্দু কলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, তখন এক দিবস একজন দর্শক আসিয়া তাঁহাদের শ্রেণীর পরীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি উত্তম পরীক্ষা দেওয়াতে হেয়ার সাহেব তাঁহাকে একখানি তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর ইংরেজী ও বাঙ্গালা ডিক্সনারি পুরস্কার দিয়াছিলেন।

বালকদিগের চরিত্রের প্রতি তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। যে সকল বালক বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত হইত তাহারা কোথায় থাকে, কি করে, অনুসন্ধান করিবার জন্য, তিনি কাশীমালী নামক একজন ভৃত্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কেবল ভৃত্যের উপরেই নির্ভর করিতেন না। অনুপস্থিত বালকদিগের গৃহে নিজে গিয়া জানিতেন যে, তাহারা তথায় আছে কি না। গৃহে দেখিতে না পাইলে, অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের গুপ্ত আড্ডায় গিয়া তাহাদিগকে ধরিতেন। অনেক মন্দ বালককে তিনি ভাল করিয়াছিলেন। অনেক অসচ্চরিত্র ছাত্রকে তিনি সচ্চরিত্র করিয়াছিলেন। যে সকল বালক সম্বন্ধে কেহই মনে করিত না যে, তাহারা কখন মানুষ হইবে, এমন অনেক বালক হেয়ার সাহেবের প্রভাবে সুশিক্ষিত ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়াছিল। কেহ কেহ তাহাদের পরিবারের ও জনসমাজের পক্ষে অলংকারস্বরূপ হইয়াছিলেন। বালকদিগের ব্যবহার ও কার্য্য সম্বন্ধে হেয়ার সাহেব কত দূর অনুসন্ধান করিতেন, তাহা একটি ঘটনার কথা বলিলে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন। কোন ধনী পরিবারের একটি দুষ্ট বালক, তাহার অপেক্ষা অল্প বয়স্ক আর একটি বালকের সঙ্গ

লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিত। কিন্তু সেই অল্প বয়স্ক বালক তাহার নিকট থাকিতে ভালবাসিত না। ইহাতে সেই দুষ্ট বালকটি উহার উপর বড়ই বিরক্ত হইল এবং উহাকে সকলের নিকট অপদস্থ ও অপমানিত করিবার জন্য একটি উপায় স্থির করিল। সে কোন ব্যক্তির দ্বারা ঐ বালকের নিন্দাসূচক একটি কুৎসিত কবিতা রচনা করাইয়া লইল। স্থির করিল, স্কুলের দরোয়ানদিগকে বশীভূত করিয়া গভীর রাত্রে আসিয়া স্কুলের হলে, প্রকাশ্য স্থানে উহা লাগাইয়া দিবে। একদিন রাত্রি একটার সময় সে একটি লণ্ঠন হস্তে স্কুলের হলে আসিয়া সেই নিন্দাসূচক কবিতা দেওয়ালে লাগাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ দেখিল যে, হেয়ার সাহেব হলের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তখন বৃষ্টি হইতেছিল; সুতরাং হেয়ার সাহেবের সমস্ত শরীর ভিজিয়া গিয়াছিল। হেয়ার সাহেব পূর্ব্ব হইতেই এ বিষয়ের সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি সেই দুষ্ট বালককে ধরিয়া ফেলিলেন। একটি নির্দ্দোষী বালক অপমান, লজ্জা ও অমূলক কুৎসা হইতে রক্ষা পাইল।

সে সময়ে, মাহেশের স্নানযাত্রার সময়, কলিকাতার অনেক বাবু, বারাঙ্গনা সমভিব্যাহারে, নৌকা করিয়া আমোদ করিতে করিতে মাহেশে যাইতেন। বালকদিগের চরিত্রের প্রতি হেয়ার সাহেবের এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল যে, যাহাতে তাঁহার বালকগণ কেহ ঐ প্রকার কুসংসর্গে মাহেশ গমন না করে, সে জন্য তিনি গঙ্গার ঘাটে ঘাটে অনুসন্ধান করিতেন, কোন বালককে ঐরূপ কুসঙ্গে দেখিতে পাইলে, তাহাকে ধরিয়া আনিতেন ও উপযুক্ত শাস্তি দিতেন।

গরিব লোকের সন্তানকে হেয়ার সাহেব বিনা বেতনে তাঁহার স্কুলে ভর্ত্তি করিতেন। কত গরিব দুঃখীর ছেলে তাঁহার স্কুলে পড়িয়া মানুষ হইয়াছে, কে তাহা নির্দ্ধারণ করিবে? তিনি গরিবের মা বাপ ছিলেন। একদিন হেয়ার সাহেব একটী বাঙ্গালী বাবুর সঙ্গে তাঁহার স্কুল গৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময় একটী দুঃখিনী বিধবা নারী তাহার শিশু সন্তানটিকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিল যে, তিনি তাহাকে তাঁহার স্কুলের লাণ্টক্লাসে বিনা বেতনে ভর্ত্তি করিয়া লন। লাষ্টক্লাসে তখন অনেক বালক ভর্ত্তি হওয়াতে ক্লাস পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া হেয়ার সাহেব ঐ শিশুটিকে ভর্ত্তি করিতে অস্বীকার করিলেন। ইহাতে দুঃখিনী বিধবা ক্রন্দন করিতে করিতে নিজ গৃহে চলিয়া গেল।

ডেভিড হেয়ারের কোমল হৃদয়ে ইহা বড়ই লাগিল। তিনি যে বাঙ্গালী বন্ধুটির সহিত একত্রে বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে বলিলেন যে, ঐ স্ত্রীলোকটির প্রকৃত অবস্থা জানা এবং উহার বাসস্থান খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক।

তখন তিনি সেই বন্ধুটির সহিত বাহির হইয়া অনেক অন্বেষণের পর সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে তাহার সন্ধান পাইলেন। হেয়ার সাহেব ও একটি বাঙ্গালী বাবু আসিয়াছেন, শুনিয়া স্ত্রীলোকটি তাহার শিশু সন্তানটিকে সঙ্গে লইয়া অতি ব্যগ্রভাবে তাহার কুটীর হইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে একটিও কথা বলিতে পারিল না। নীরবে দণ্ডায়মান রহিল। তাহার গণ্ডস্থল ধৌত করিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহার এইরূপ ভাব দেখিয়া হেয়ার সাহেব এত দূর অভিভূত হইলেন যে, কিয়ৎক্ষণ পর্যন্ত একটিও কথা বলিতে পারিলেন না। পরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে আমি অদ্য হইতে তোমার পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ভার গ্রহণ করিলাম। তোমার পুত্র যতদিন না অর্থোপার্জন করিতে সক্ষম হইবে, ততদিন তোমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রতি মাসে নিয়মিতরূপে চারি টাকা করিয়া দিব। এই কথা বলিয়া তিনি তখনই তাহাকে চারিটি টাকা দিলেন। হেয়ার সাহেবের এই প্রকার দয়া দেখিয়া স্ত্রীলোকটি আশ্চর্য্য হইল। সে প্রাণের সহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। সে বলিতে লাগিল যে, সাহেব মানুষ নহেন। কোন দেবতা মানবাকার ধারণ করিয়া দুঃখীর উপকারের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছেন। হেয়ার সাহেব নিজের প্রশংসা শুনিতে ভাল বাসিতেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

হেয়ার সাহেব যে কেবল বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্যই অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন এমন নহে। তিনি গরীব দুঃখীর উপকারের জন্য নানাপ্রকার অর্থব্যয় করিতেন। বাবু শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, দুইবার পূজার সময় হেয়ার সাহেব চারি শত টাকার ধুতি ও সাড়ী ক্রয় করিয়া তাঁহার স্কুলের দুঃখী বালকদিগকে ও তাহাদের মাতা ও ভগিনীদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন। পূজার সময় নূতন বস্ত্র না হইলে তাহাদের মনে বড়ই কষ্ট হইবে বুঝিতে পারিয়া হেয়ার সাহেব নিজব্যয়ে বস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন।

এদেশীয়দিগের কল্যাণ সাধন করিবার জন্য হেয়ার সাহেব কয়েক লক্ষ টাকা রাখিয়া দিয়াছিলেন। উহা ক্রমে নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন চীনদেশ-প্রবাসী তাঁহার কোন ধনী আত্মীয়ের নিকট সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। সেই ধনী আত্মীয় তাঁহারই ন্যায় দয়ালু লোক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার যাহা কিছু ভূসম্পত্তি ছিল সৎকার্য্যের ব্যয় করিবেন বলিয়া সকলই বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। কলেজ স্কোয়ারের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের যত ভূমি সকলই হেয়ার সাহেবের ছিল। তিনি ঐ সমস্তই বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া ছিলেন।

১৮৪২ সালের ৩১শে মে হেয়ার সাহেব ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইলেন। তিনি ইহাতে কিছুমাত্র ভয় পান নাই। মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইলেন। তিনি তাহার সরদার বেহারাকে আজ্ঞা করিলেন, গ্রে সাহেবের নিকটে গিয়া বল যে, আমার জন্য একটা কফিন নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সরদার বেহারা তাঁহার আজ্ঞাপালন করে নাই। চিকিৎসা যথেষ্ট হইল, কিন্তু কোন ফল হইল না। মৃত্যুশয্যায় তিনি তাঁহার ডাক্তার প্রসন্ন মিত্রকে বলিলেন "আর শরিষার পুলটিস্ লাগাইও না, আমি শান্তিতে মরিতে চাই।" মহাপুরুষ পরদিবস অর্থাৎ ১৮৪২ সালের ১লা জুন দেহ ত্যাগ করিলেন।

হেয়ার সাহেবের পরলোক গমনে আপামর সাধারণ সকলেই শোকার্ত্ত হইলেন। শত শত চক্ষে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। মৃত্যুসংবাদ পাইয়া বহুসংখ্যক বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহার গৃহে আসিলেন, গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। রাজা রাধাকান্ত দেব, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বাবু রসময় দত্ত প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাত্মা হেয়ার সাহেবের অন্তেষ্ঠি ক্রিয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, সে দিন অতিশয় বৃষ্টি, পথে অতিশয় জল ও কাদা, তথাচ পাঁচ হাজার লোক কাঁদিতে কাঁদিতে শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিল। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ তাঁহার কফিন বহন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আমাদের ভক্তিভাজন স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় একজন।

শব লইয়া যাইবার সময় পথের দুই পার্শ্বে, রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী বাটী সকলের বারান্দায় ও জানালায়, ছাদের উপরে, আবাল বৃদ্ধ বনিতা দণ্ডায়মান হইয়া কফিন দর্শন ও শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। ক্রমে সকলে কলেজ স্কোয়ারে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায় লোকে লোকারণ্য হইল। সেই স্থানেই হেয়ার সাহেবের সমাধি হইল।

পাঠকবর্গ এস্থলে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। হেয়ার সাহেবের সমাধি, সাহেবদিগের গোরস্থানে না হইয়া কলেজ স্কোয়ারে হইল কেন? ইহার উত্তর এই যে, প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মে হেয়ার সাহেবের বিশ্বাস ছিল না।

হেয়ার সাহেব এদেশের জন্য কি করিয়াছেন? এ দেশে যাঁহারা পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলোক আনয়ন করেন, তন্মধ্যে তিনি একজন প্রধান। তাঁহাকে হিন্দুকলেজের সংস্থাপক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হিন্দু কলেজ সংস্থাপন বিষয়ে সকলের মত করিবার জন্য তিনি ভিক্ষুকের ন্যায় দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। স্কুল সোসাইটির পক্ষ হইয়া তিনি স্থানে স্থানে বাঙ্গালা ইংরেজী স্কুল সংস্থাপন করেন। স্কুল-বুক সোসাইটি হইতে তাঁহারই যত্নে

বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষায় ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। বালকদিগের ন্যায় যাহাতে বালিকাদিগেরও শিক্ষা হয়, তজ্জন্যও তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। বালক বালিকাদিগের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া দরিদ্র হইয়া গিয়াছিলেন। এমন কি তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পরমেশ্বর তাঁহার দ্বারা যে উন্নতি স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা চিরদিনই প্রবাহিত হইয়া ভারতের অশেষ কল্যাণ সংসাধন করিবে।

কেবল কি শিক্ষা সম্বন্ধে? অত্যাচারিত কুলিদিগের মা বাপ কে ছিলেন? মহাত্মা হেয়ার সাহেব। তাঁহার সময়ে যে সকল রাজনৈতিক আন্দোলন হইয়াছিল, তাহাতে কোন্ ইয়োরোপীয় উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়া এদেশীয়দিগের কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন? মহাত্মা হেয়ার সাহেব।

হেয়ার সাহেবের চরিত্র ও জীবন দেখিয়া আমরা কি শিক্ষা করিতে পারি? কেমন করিয়া মানবের হিতার্থে দেহ, মন, প্রাণ সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে হয়, কেমন করিয়া দুঃখী ধনী সকলকে সমভাবে ভালবাসিতে হয়, কেমন করিয়া সকলের বন্ধু হইয়া সকলের হিতার্থে সকলের গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে হয়, কেমন করিয়া দুঃখীর দুঃখে চক্ষের জল ফেলিতে হয়, কেমন করিয়া নিজের শ্রমোপার্জ্জিত অর্থ দুঃখীর দুঃখ নিবারণ ও বিপন্নের উদ্ধারের জন্য অকাতরে ব্যয় করিতে হয়, কেমন করিয়া কাঙ্গালের মা বাপ হইতে হয়, কেমন করিয়া আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া পরকে সুখী করিতে হয়, হেয়ার সাহেবের চরিত্রে ও জীবনে আমরা তাহাই শিক্ষা করিতে পারি।

হেয়ার সাহেব চির কুমার ছিলেন। এ দেশের বালক বালিকারাই তাঁহার সন্তান সন্ততি। তিনি আমাদের জন্য খাটিয়া খাটিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন! আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাঋণে চিরবদ্ধ। পরমেশ্বর আমাদিগকে এরূপ সুবুদ্ধি দিন যাহাতে আমরা এই মহাত্মার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইতে পারি।

হেয়ার-সাহেব ও হেয়ার-স্কুলে তাঁহার তৈলচিত্র

হেয়ার সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শন-সভা

হেয়ার-সাহেবের ভক্ত ছাত্রগণ ও বন্ধুসমূহ হেয়ার সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে যোড়াসাঁকোয় মাধবচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে সভা করিলেন। উপর্যুপরি দুই দিন সভা হইয়াছিল। প্রথম দিন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বিতীয় দিন রসিককৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাধানাথ শিকদার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং আরও কয়েক জন সভ্য হেয়ার সাহেবের গুণগ্রাম সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পরিশেষে সভায় স্থির হইল যে, সাহেবের জন্য একখানি তৈল-চিত্র প্রস্তুত করা যাইবে এবং এই নিমিত্ত চাঁদা তুলিতেও হইবে। আরও কথা হইল যে, হেয়ার-সাহেব মহাশয় ছবির জন্য চিত্রকরের সম্মুখে বসিবেন। হরচন্দ্র ঘোষ সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন।

হেয়ার-সাহেবের তৈল-চিত্রাঙ্কণ

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তৈলচিত্র অঙ্কিত করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। তৎকালে চারলস পোট নামক একজন ইউরেসিয়ান্ ইটালীতে মৌলালী-দর্গার নিকটে বাস করিতেন। তখন ইনিই কলিকাতায় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চিত্রকর। ইনি ডিরোজিও সাহেবের পরম বন্ধু ছিলেন, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কয়েক মাসের মধ্যেই চিত্রখানি অঙ্কিত হইল। হেয়ারের ছাত্রগণ ইহা দেখিয়া পোট সাহেবের প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহা প্রস্তুত করিতে কত টাকা খরচ পড়িয়াছিল, তাহা জানা যায় না। হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সমস্তই জানিতেন। আজ ছবিখানির বয়স ৯৯ বৎসর। চিত্রকরের বিশেষ নৈপুণ্য ও কৌশল এই যে, সুদীর্ঘ কাল পরেও ছবিখানি বিবর্ণ হয় নাই,—এমন কি ইহার কোন স্থানেও পোকা ধরে নাই। ফ্রেমও ঠিক আছে। এরূপ বস্তুর সম্মান রক্ষা করা হেয়ার-স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণের বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহা না করিলে তাঁহাদের কলঙ্ক দূরপনের। এক শত বৎসরে কলিকাতার কতই পরিবর্ত্তন হইল, কিন্তু ছবিখানি আজিও ঠিক রহিয়াছে। সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ হেয়ার সাহেব আজ জীবিত নাই,—পার্শ্ববর্ত্তী তাঁহার দুইটী প্রিয় ছাত্রও আজ জীবিত নাই,—কিন্তু সেই ছবিখানি আজিও জীবিত রহিয়াছে। এক্ষণে হেয়ার স্কুলের সুযোগ্য ও সুবিদ্বান হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত

আদ্যনাথ রায় বি-এ, বি-টি মহোদয় ও অন্যান্য শিক্ষকগণের নিকটে আমরা এই আশা করি যে, আগামী বৎসরে (১৯৩০ খৃষ্টাব্দে) এই পরম পবিত্র পুণ্য স্মৃতিময় হেয়ার সাহেবের ছবিখানির শতবার্ষিক উৎসব দেখিতে পাইব। আরও আশা করি যে, প্রত্যেক বৎসর ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে হেয়ার সাহেবের প্রস্তর-মূর্ত্তির যেরূপ পূজা ও সম্মান করা হয়, ছবিখানিরও সেই দিন যেন সেইরূপ করা হয়।

হেয়ার সাহেবের তৈলচিত্রে দুইটী ছাত্রের প্রতিমূর্ত্তি

হেয়ার স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয় যে ঘরে বসিয়া স্কুলের কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করেন, সেই ঘরের পশ্চিম প্রাচীরের গাত্রে একখানি সুন্দর সুবৃহৎ তৈলচিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মহামতি হেয়ার সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে আর যে দুইটি ছাত্রের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত রহিয়াছে, তাঁহারা কে ইহাই এখন বিবেচ্য ও বিচার্য্য। যে ছাত্রটি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার নাম তারকনাথ ঘোষ; এবং যে ছাত্রটি বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার নাম দ্বারকানাথ চন্দ্র (১)।

হেয়ার-সাহেবের প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি ও ক্লক-ঘড়ী

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ১৭ জুন কাশীম-বাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায় মহাশয় মেডিক্যাল কলেজে একটি সভা আহ্বান করেন। কলিকাতার অনেক গণ্য-মান্য লোক উপস্থিত হইলেন, হেয়ার সাহেবের পুণ্য ও পবিত্র স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য কি কার্য্য করা উচিত, ইহাই স্থির করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুর সভাপতি হইলেন। রাজা দিগম্বর মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কাপ্তেন ডি. এল. রিচার্ডসন মহাশয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ তর্ক-বিতর্কের পরে স্থির হইল যে, হেয়ার-সাহেবের স্মৃতি রক্ষার জন্য একটী "প্রস্তর মূর্ত্তি" নির্ম্মাণ করা হইবে (২। চাঁদার খাতায় অনেকে স্বাক্ষর করিলেন - ৮০০০ টাকার অধিক চাঁদা উঠিল। একটী কমিটী স্থাপিত হইল। ইহার মেম্বারগণের নাম এই:—রাজা কৃষ্ণনাথ রায়, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল সিংহ, হরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী (টাকী), রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণ বন্দ্যো, তরাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, দিগম্বর মিত্র, রমাপ্রসাদ রায়, কৈলাসচন্দ্র দত্ত, রামচন্দ্র মিত্র, ব্রজনাথ ধর, প্যারীচাঁদ মিত্র। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রস্তর-মূর্ত্তি বিলাত হইতে নির্ম্মিত

হইয়া আসিল। প্রথমতঃ ইহা সংস্কৃত কলেজের প্রাঙ্গণে স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে ইহা প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হেয়ার স্কুলের মধ্যস্থলে স্থাপিত হয়। হেয়ার স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার, সুপণ্ডিত বন্ধুবর রায়-সাহেব শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ এম. এ. মহাশয় লিখিয়াছেন, এই প্রস্তর-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইতে ৩০০০০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।

এই প্রস্তর-মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া কবিবর দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় স্বীয় "সুরধুনী কাব্যে" লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—

"হেয়ারের শুভ্র মূর্ত্তি প্রস্তরে ক্ষোদিত
কলেজের প্রাঙ্গণের মধ্যে অবস্থিত।"

হেয়ার স্কুলে এখনও একটী ক্লক-ঘড়ী আছে। ঈশানবাবু বলেন, হেয়ার সাহেব ইহা School Society's School-এ উপহার দিয়াছিলেন। হেয়ার স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার, কোন্নগর নিবাসী স্বর্গত গিরিশচন্দ্র দেব মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে হেয়ার সাহেবের যখন ঘড়ীর দোকান ছিল তখন তিনি স্বয়ং ইহা ব্যবহার করিতেন। ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আমাকে একবার বলিয়াছিলেন যে, ২২ টাকা খরচ করিয়া এই ঘড়ীটী মেরামত করাইয়া আনিয়াছি। বর্ত্তমান হেডমাষ্টার মহাশয়ের মুখে শুনিলাম, ইহা এখন আর চলে না। ঘড়ীটির বয়স এখন অন্ততঃ ১২০ বৎসর। হেয়ার সাহেবের সম্মানার্থ ইহা বিলাত হইতে মেরামৎ করাইয়া আনিয়া স্কুলে রাখা উচিত।

হেয়ার-সাহেবের সমাধি-স্তম্ভ

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১লা জুন, বুধবার, অপরাহ্ণ ৬ টার সময় মহাত্মা হেয়ার সাহেব দেহত্যাগ করেন। পরদিন তাঁহার ভক্তগণ ও ছাত্রসমূহ গোলদীঘির দক্ষিণ পাড়ে তাঁহার পবিত্র দেহ সমাহিত করেন। নিয়ম হইল যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটী করিয়া টাকা চাঁদা দিতে হইবে। এক একটী করিয়া টাকা দেওয়াতে স্তম্ভ-নির্ম্মাণের জন্য নিরূপিত টাকা আদায় হইয়া গেল। তৎপরে যাঁহারা টাকা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের টাকা আর গ্রহণ করা হয় নাই। পাছে তাঁহার পবিত্র দেহ কোনরূপে অপনীত হইয়া যায় এই উদ্দেশ্যে সমাধি-স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে একটী লোহার রেলিং দেওয়া হইয়াছে।

কবিবর দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়, স্বীয় "সুরধুনী কাব্যে" হেয়ার সাহেবের সমাধি-স্তম্ভ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—

"দেখ মাতা গোলদীঘি, বড় রক্ত জোর,
বিরাজে দক্ষিণ দিকে হেয়ারের গোর।

দীন দুঃখী শিশুদের পরম আত্মীয়,
বঙ্গের বদান্য বন্ধু প্রাতঃস্মরণীয়।
বাঙ্গালীর উন্নতির নির্ম্মল নিদান,
যার জন্য করেছেন সর্ব্বস্ব প্রদান।"

হেয়ার সাহেবের মৃতদেহের দুর্গতি

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ২রা জুন, বৃহস্পতিবার গোলদীঘির দক্ষিণ পাড়ে হেয়ার সাহেবের মৃতদেহের সমাধি হইয়াছিল। মৃতদেহের সমাধি হইল বটে, কিন্তু ইহার দুর্গতি হইবার কথা শুনিলে চক্ষুঃ দিয়া জল আসে। তৎকালে Calcutta Star নামক একখানি ইংরাজী সংবাদ-পত্র কলিকাতা হইতে বাহির হইত। গোলদীঘির চতুষ্পার্শ্বস্থ ৬০ জন ভদ্র গৃহস্থ, নিজ নিজ নাম স্বাক্ষরিত করিয়া উক্ত সংবাদ-পত্রে এই বলিয়া অভিযোগ করিয়া পাঠাইলেন যে, গোলদীঘির পাড়েই যখন সাহেবের মৃতদেহ পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে, তখন এই দীঘির জল অস্বাস্থ্যকর ও হিন্দুশাস্ত্রমতে অপেয়। সুতরাং সাহেবের মৃতদেহ এস্থান হইতে তুলিয়া অন্য স্থানে রাখা হউক। এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র হেয়ার সাহেবের ভক্তগণ ও ছাত্রসমূহ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ৮২ জন বড় বড় লোক নিজ নিজ নাম স্বাক্ষরিত করিয়া কলিকাতার তাৎকালিক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে একখানি দরখাস্ত পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা লিখিলেন যে, যখন গোলদীঘি কাটান হয়, তখন কোন হিন্দুই ইহা প্রতিষ্ঠা করেন নাই। বিশেষতঃ মৃতদেহ যখন দীঘির জল হইতে বহুদূরে অবস্থিত রহিয়াছে, তখন ইহার জল কিছুতেই অস্বাস্থ্যকর ও হিন্দুশাস্ত্রমতে অপেয় হইতে পারে না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিচার করিয়া স্থির করিলেন যে, মৃতদেহ যেমন আছে, সেইরূপই থাকিবে। ইহা স্থানচ্যুত করা হইবে না।(৩)

হেয়ার-স্কুলের প্রাচীর গাত্রে প্রস্তর-ফলক

হেয়ার স্কুলের শিক্ষক-গণ ও ছাত্র-সমূহ হেয়ার সাহেবের পবিত্র স্মৃতি রক্ষা করিবার নিমিত্ত একতোলার দক্ষিণ দিগ্‌বর্ত্তী হলের উত্তরে প্রাচীর-গাত্রে একখানি প্রস্তর-ফলক সংযোজিত করিয়া রাখিয়াছেন। স্কুল-কমিটী ও কাউন্সেল অফ এডুকেশনের অনুমতি লইয়াই অবশ্য ইহা সংযোজিত করা হইয়াছে। শিক্ষক ও ছাত্রগণই প্রস্তর ফলক প্রস্তুত করিবার ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রাচীর গাত্রে সংলগ্ন করা হয়। ইহার উপরি যে একটী মনোহারিণী কবিতা উৎকীর্ণ রহিয়াছে, ইহা কবিবর ডি-এল-রিচার্ডসন সাহেব মহাশয়ের রচিত।

হেয়ার-সাহেবের মৃত্যু দিবসে বার্ষিক সম্মেলন ও পুরস্কার প্রদান

হেয়ার-সাহেবের স্মৃতি-রক্ষার্থ নিমতলায় কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাটীতে একটী সভা হইয়াছিল। রামচন্দ্র মিত্র সভাপতি হইলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, কবির ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভায় স্থির হইয়াছিল যে, প্রত্যেক বৎসর হেয়ার সাহেবের মৃত্যুদিনে অর্থাৎ ১লা জুন তারিখে হেয়ার সাহেবের বন্ধুগণ ও ছাত্র-সমূহ একত্র সম্মিলিত হইবেন। এতদ্ভিন্ন আরও নিয়ম হইল যে, প্রত্যেক বৎসর ঐ দিনে একজন একটী প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, প্রত্যেক বৎসর প্রবন্ধের জন্য একটী করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইত। পুরস্কারও অতি মূল্যবান্ ছিল। ১০০৲ টাকা হইতে ৪০০৲ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

(১) এইখানে বহুদিনের একটী গল্প বলা আবশ্যক মনে করি। কোন্নগর-নিবাসী ধার্ম্মিকবর স্বদেশ-হিতৈষী, সুপণ্ডিত শিবচন্দ্র দে মহাশয় কোন্নগরস্থ ইংরাজী ও বাঙ্গালা স্কুলের স্থাপয়িতা। আমি যখন এই বাঙ্গলা স্কুলে পড়িতাম, তখন শিবচন্দ্র বাবু ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গিরিশচন্দ্র দে (হেয়ার-স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার) মহাশয় আমাদিগের বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বর্দ্ধমান বিভাগে যখন প্রথম স্থান অধিকার করি, তখন শিবচন্দ্র বাবু সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন। তৎপরে যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ি, তখন মধ্যে মধ্যে আমি তাঁহার বাটীতে গিয়া দেখা করিতাম। আমি তাঁহার স্কুলের ছাত্র বলিয়া তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। একদিন কথায় কথায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হেয়ার সাহেবের এত প্রিয় ছাত্র থাকিতে দুইটী মাত্র ছাত্র তাঁহার ছবিতে স্থান পাইলেন কেন? তখন তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ইহার এক কারণ আছে। আরপুলি পাঠশালা, পটলডাঙ্গার স্কুল ও হিন্দু কলেজ লইয়া প্রত্যহ তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন। এই সব করিয়া সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে বাটী যাইতে হইত। হেয়ার সাহেবেরবাড়ীখানিতে বহু ছাত্র সর্ব্বদাই দেখা করিতে যাইতেন। একদিন সাহেবের ভীষণ মাথা ধরিয়াছে। তিনি শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন; নিদ্রা আসিতেছে না। এমন সময় তারকনাথ ঘোষ ও দ্বারকানাথ চন্দ্র সহসা গিয়া উপস্থিত হইলেন। সাহেব বলিলেন, "অত্যন্ত মাথা ধরিয়াছে; কষ্টর একশেষ হইতেছে।" শুনিবামাত্র গুরুভক্ত ছাত্র দুইটী মাথায় হাত বুলাইয়া দেওয়াতে সাহেবের সুনিদ্রা আসিল। নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইবার পরে তিনি উঠিয়া দেখিলেন যে, সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। ছাত্র দুইটী বরাবর সেখানে বসিয়াছিলেন। সাহেব উঠিয়া তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ জলযোগ করাইয়া দিলেন। তদবধি তাঁহাদের উপরি সাহেবের বিশেষ স্নেহ-মমতা জন্মিয়াছিল। এজন্য ছবি তুলিবার সময় তিনি এই দুইটী ছাত্রকেই নিকটে রাখিয়াছিলেন।"—লেখক

(২) ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন সাহেবের ইচ্ছা ছিল যে, হেয়ারের স্মৃতিরক্ষার জন্য "প্রস্তর মূর্ত্তি" না করিয়া একটী "Lyceum" অর্থাৎ বক্তৃতা-মন্দির নির্ম্মাণ করা হয়। "ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া" পত্রিকার সম্পাদক জে. সি. মার্শমেন সাহেবও কাপ্তেন সাহেবের সহিত একমত হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ৪ জুলাই, সোমবার লিখিয়াছিলেন,—An account appears this morning in the journals of a public meeting of the friends of the late Mr

David Hare, for the purpose of determining on the most suitable tribute to his memory, when it was determined to erect a statue in honour of him. The subscriptions received amount to more than Rs. 8000. We think with Captain Richardson that the building of a Lyceum would have been more appropriate. We hope the committee will not allow the matter to drop, as the case of Rammohan Roy" The Friend of India, 7th July, Thursday, 1842.

(৩) The Calcutta Star, 16th June, 1842; The Friend of India, 16th and 23rd June, 1842.

প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়, হেয়ার-সাহেবের জীবন-চরিতে তাঁহার মৃতদেহের দুর্গতির প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই, ইহাই অতি বিস্ময়-জনক।—লেখক

গীত

কৃপানিধি ডেবিড হ্যারকে কল্লে হরণ।
মরণের, বুঝি নাই কো মরণ।।
সদা, হাহা হাহারবে, কাঁদে শিশু সবে,
ত্রিভুবনে হবে, আর কি তেমন।
হায়, কে করিয়া প্রীতি, বালকের প্রতি,
পিতৃভাবে করে, স্নেহ বিতরণ।।
হোয়ে শশি সুধাহত, চকোরের মত,
ছাত্রগণ যত, করছে রোদন।১।
খেদে, ভনে রসময়, এই অসময়, কোথা
দয়াময় রইলে এখন।
প্রভু একা আমায় ফেলে, কোথা তুমি গেলে,
কোথা গেলে পাব তোমার চরণ।২।

৯ মে ১৮৪৯ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' স্ত্রীবিদ্যা' শীর্ষক নিবন্ধে এই গীতটি প্রথম প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটির প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নরূপঃ ···এই রাজ্যে ব্রিটিস জাতির প্রভুত্ব স্থাপন হওনাবধি অনেকানেক সদ্বিদ্বান্ সাহেবের সহিত আমারাদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছে বটে, কিন্তু এ পর্যন্ত শুদ্ধ এক ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহাকেই সর্বতোভাবে আমারদিগের যথার্থ হিতৈষি বন্ধু দেখিতে পাই নাই, সেই সদাত্মা ব্যক্তি অস্মদ্দেশীয় বৃদ্ধদিগের ভ্রাতার অপেক্ষা অধিক হিতকারী যুবকদিগের বন্ধুরঅপেক্ষা অধিক হিতকারী এবং বালক ব্যূহের পিতার অপেক্ষা অধিক হিতকারী ছিলেন, তিনি এই প্রকাণ্ড পৃথিবীমণ্ডলে অপর কোন কর্ম্মকেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন না, কেবল এদেশের বালকগণকে বিবিধ বিষয়ের বিদ্যাবিতরণ এবং তাহাদিগের হিত চেষ্টাকেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তিনি উইরোপ খণ্ডে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই বঙ্গভূমি তাঁহার জন্মভূমি অপেক্ষা অত্যন্ত প্রিয়স্থল হইয়াছিল, তিনি স্বজাতীয়দিগের সহিত আমোদ প্রমোদে তাদৃশ সুখানুভব না করিয়া শুদ্ধ আমারদিগের সহিত আমোদ প্রমোদে বিশেষ সুখী হইতেন, অস্মদাদির সহিত অধিক ঘনিষ্টতা করাতে ধবলকান্তির মধ্যে অনেকে তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ বিরক্ত ছিলেন, এবং এক প্রকার গুরু পুরোহিত বারণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সাহেব এরূপ করাতে

তাহারা বিবেচনা করিতেন তিনি স্বধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন না।

এই মহাশয়ের নাম আর গোপন রাখিতে পারিলাম না, তাঁহার নাম ডেবিড্ হেয়ার সাহেব, এই মৃত মহাত্মা এতদ্দেশের যেরূপ হিতকারী বন্ধু ছিলেন তাহা আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি কাহারো অগোচর নাই, ইনি আমারদিগের কুশলের কার্য্যে আপনার সমুদয় সম্পত্তি সংহার করিয়াছিলেন তথাচ সংহারের সময় পর্য্যন্ত স্বীয় মানসিক কল্পনা সুসিদ্ধ করণে বিরত হয়েন নাই, বোধকরি তিনি চরম কালে মৃত্যু চিন্তায় চিন্তিত মাত্র না হইয়া কেবল পুত্রতুল্য বালকদিগের চিন্তায় অধিক ব্যাকুল হইয়াছিলেন, উক্ত মহাশয় লোকান্তরিত হইলে কলিকাতাস্থ কোন ব্যক্তি কাতর চিত্তে এক গীত রচনা করেন, ভিখারিরা ভিক্ষাছলে সেই গান গাইয়াছিল।

ডেভিড্ হেয়ার

সাগরের পার হ'তে দেব-আশীর্বাদ
মূর্ত্ত হ'য়ে এসেছিলে তুমি হে মহান্—
গঠিতে বঙ্গের ভাবী উন্নতি-সোপান,
বিতরিয়া প্রতীচীর বাণীর প্রসাদ।
গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের কি মধু-আস্বাদ
প্রদানি' করিলে তুমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ—
প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে নাহি কোন ব্যবধান,
এক প্রেমে বাঁধা সবে ভুলি বিসম্বাদ।

তোমার সে মহাদর্শ দয়া, মায়া, স্নেহ—
উদ্দীপিত করেছিল তব ভক্তগণে
সফল করিতে বঙ্গে তব পুণ্য-ব্রত।
সে স্বর্ণ-যুগের কথা তুলিলেই কেহ,
তোমার মধুর স্মৃতি ভেসে আসে মনে
জ্যোৎস্না রাতে দূরাগত সঙ্গীতের মত।

নবকৃষ্ণ ঘোষ

ডেভিড হেয়ার

দুর্গতি-দুর্গম দেশে ভালবেসে আত্মীয়ের মত
জেবলেছিলে শুভ্র দীপ শুদ্ধ জ্ঞান প্রবুদ্ধ করিতে ;
জনমি খ্রীষ্টান-কুলে খ্রীষ্ট-নামে তরাতে তরিতে
চাহ নাই ; তাইত নাস্তিক তুমি নর-সেবা-ব্রত !

অর্থ দানে মুক্তপাণি, বিদ্যা দানে অতন্দ্র নিয়ত,
আর্তের ছাত্রের বন্ধু, ছিলে পটু মানুষ গড়িতে
স্নেহবিত্ত চিত্ত দানে ; নব্য বঙ্গে বিকল ঘড়িতে
বিনি মূলে কল-বল নিত্য তুমি জোগায়েছ কত !

কুড়ায়ে পথের রোগী সংক্রামকে দিলে তুমি প্রাণ –
তবুও নাস্তিক তুমি – ও অস্থি নেবে না গোরস্থান !

তাই ছাত্র-পল্লী-তলে বিরাজিছ ছাত্রের দেবতা ।
সমাধা—সমাধি সেথা পবিত্র ব্রতের যেথা সুরু ।
ছাত্র-পরম্পরা স্মরে পুণ্য তব জীবনের কথা—
মনুষ্যত্ব-ধর্ম্মে পূত – হে নাস্তিক ! আস্তিকের গুরু !

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

লেখক পরিচিতি

অক্ষয়কুমার দত্ত

জন্ম বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী গ্রামের কাছে চুপীতে (ইং ১৮২০, ১৫ই জুলাই)। পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত। পাঁচ বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ হয়। পরে আসিউদ্দীন নামে এক মুন্সীর কাছে ফার্সি ভাষা শিক্ষা করেন। নয় বছর বয়সের সময় খিদিরপুরে পিতার কাছে আসেন এবং জেঠতুত ভাই কাশীনাথের প্রচেষ্টায় জয়কৃষ্ণ সরকার ও এক পাদরীর কাছে ইংরেজি শিক্ষা শুরু করেন। পরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী-তে ভর্তি হন। ১৯ বছর বয়সে তাঁর পিতা মারা যান। এর ফলে লেখাপড়া বেশীদূর অগ্রসর না হলেও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তিনি অনেক বিষয়ে জ্ঞান-লাভ করেন। ১৮৪০-এ মাসিক আট টাকা বেতনে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় ভূগোল ও পদার্থ বিদ্যার শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর বেতন ১০্ টাকা হয়। কালক্রমে ১৪্ টাকা বেতনে তিনি তৃতীয় শিক্ষকের পদে উন্নীত হন। ১৮৪৩-এ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন এবং ১৮৫৫ পর্যন্ত অতি যোগ্যতার সঙ্গে ঐ পত্রিকা সম্পাদন করেন। ইতিমধ্যে কিছুদিন মেডিকেল কলেজে পড়াশুনা করে উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যায় জ্ঞানলাভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় তিনি নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪৩-এর ২১ ডিসেম্বর তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়', 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', 'পদার্থ বিদ্যা', 'ভূগোল', 'ধর্মনীতি' হল প্রধান। 'আত্মীয় সভা', 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি'র মত সমাজসংস্কারমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৮৮৬-র ২৮ মে তাঁর মৃত্যু হয়।

তারাশংকর তর্করত্ন

নদীয়া জেলায় কাঁচকুলি গ্রামে উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে জন্ম হয়। পিতার নাম মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ১৩ বছর পড়াশুনা করেন।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যুর পর মাসিক ৩০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫৫ পর্যন্ত তিনি সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে নদীয়ার স্কুলসমূহের সাব-ইন্স্পেক্টর পদে যোগ দেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা', 'পশ্বাবলী', 'কাদম্বরী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১ ৪৮-এ তিনি পরলোকগমন করেন।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৮৪৩-এর অক্টোবরে হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই পিতা দ্বারকানাথ তর্কচূড়ামণি মারা যান। চুঁচুড়া, হুগলী এবং কলিকাতার রসাপাগলা স্কুলে পড়াশুনা করেন। ১৮৬১-কৃষ্ণনগর যান এবং ১৮৬২-তে সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। অল্প বয়সেই ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন এবং ১৮ বছর বয়সে ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য পদ লাভ করেন। বিধবা বিবাহের সমর্থক ছিলেন এবং নিজে উদ্যোগী হয়ে কৃষ্ণনগরে এক বিধবা মহিলাকে বিয়ে করেন। ভারত সভার প্রতিষ্ঠা ও কাজে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। যুবকদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বাঁশবেড়িয়ায় 'ছাত্র সমাজ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত', 'থিয়োডোর পার্কারের জীবনী', সাকার ও নিরাকার উপাসনা', 'অনন্তের উপাসনা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রভাকর, বঙ্গদর্শন, সাধারণী ও অন্যান্য পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

জুন, ১৯১৩ য় কলিকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

পূর্ণচন্দ্র দে কবিভূষণ কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর

হুগলী জেলার ভদ্রকালীতে ১৮৫৭-র ১০ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করার পর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। পরে আশুতোষ কলেজে অধ্যাপকের পদে যোগ দেন। বহু সংস্কৃত কবিতা সংগ্রহ ও বঙ্গানুবাদ করে উদ্ভটসাগর উপাধি পান। তাঁর লেখা গ্রন্থের মধ্যে 'উদ্ভটশ্লোকমালা' 'উদ্ভটসমুদ্র' 'স্তবসমুদ্র', 'প্রশ্নোত্তর-মণিরত্নমালা', 'মোহমুদ্গর', মোহকুঠার', 'মহাভারত', 'কৃত্তিবাসী-রামায়ণ', 'পাণ্ডবগীতা' ও 'উপক্রমণিকা (ব্যাকরণ)' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৬-এর, ১৮ই অক্টোবর তিনি পরলোকগমন করেন।

মদনমোহন তর্কালংকার

নদীয়া জেলার বিল্বগ্রামে ১৮১৭-য় মদনমোহন তর্কালংকারের জন্ম হয়। পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়। বার বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহপাঠী ছিলেন। সেখানে প্রথম তিন বছর মুগ্ধবোধ, পরে সাহিত্য, অলংকার ও জ্যোতিষ এবং সবশেষে স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করেন। শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জজপণ্ডিতের সার্টিফিকেট পান। ১৮৪২-এ সংস্কৃত কলেজের পাঠ সমাপ্ত করেন।

পাঠ্যজীবনের শেষে প্রথম কিছুদিন হিন্দুকলেজ পাঠশালায় শিক্ষকতা করেন। পরে একবছর বারাসাত গভর্নমেণ্ট স্কুলে প্রথম পণ্ডিতের পদে কাজ করেন। এপ্রিল ১৮৪৩ থেকে ডিসেম্বর ১৮৪৫ পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৪৬-এর জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ছয় মাস কৃষ্ণনগর কলেজের পণ্ডিতের কাজ করেন। পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক (সাহিত্যের) জয়গোপাল তর্কালংকারের মৃত্যুর পর তিনি উক্ত পদে নিযুক্ত হন। সেই সময়ে তাঁর মাসিক বেতন ছিল ৯০ টাকা। ১৮৫০-এর নভেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের চাকরি পরিত্যাগ করে মুর্শিদাবাদের জজ পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। এর পাঁচ বছর পরে (১৮৫৫) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে যোগ দেন।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তাঁর ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধটি সর্বশুভকরী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল অসামান্য। 'শিশুশিক্ষা' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ তার সাক্ষ্য বহন করে।

১৮৫৮, ৯ মার্চ কান্দীতে কলেরা রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ধমান জেলার বাকুলিয়া গ্রামে, ১৮২৭-এ রঙ্গলাল জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামনারায়ণ মুর্শিদাবাদের নবাববাহাদুরের ছোট দেওয়ান ছিলেন।

পাঁচ বছর বয়সে প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায়, পরে স্থানীয় মিশনারী স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৩৫-এ পিতৃবিয়োগ হয়। তখন তাঁর মামা রামকমল অন্যান্য ভাইবোনদের সঙ্গে রঙ্গলালকেও চুঁচুড়ায় আনেন এবং ইংরেজি শিক্ষার জন্য হুগলী এমামবারা মাদরাসার ইংরেজি পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। হুগলী কলেজ স্থাপিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই সহোদরদের সঙ্গে তিনিও ঐ কলেজে ভর্তি হন। সম্ভবত ১৮৪৩ পর্যন্ত তিনি ঐ কলেজে পড়াশুনা করেন

মার্চ, ১৮৬০ প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলার অস্থায়ী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ছয় মাস কাজ করার পর নভেম্বর মাসে নদীয়া জেলার ইনকাম্ ট্যাক্স অ্যাসেসার ও ডেপুটি কালেকটার পদে যোগ দেন।

১৮৬৩, বালেশ্বরে অস্থায়ী স্পেশাল ডেপুটি কালেক্টরের পদে, ১৮৬৪ কটকে স্থায়ী ডেপুটি কালেক্টর ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে যোগ দেন। ১৮৬৯ এপ্রিল মাসে হুগলী জেলার জাহানাবাদে স্থানান্তরিত হন। ১৮৭৩, এপ্রিলে পুনরায় কটকে ফিরে যান। ১৮৭৯, মার্চ মাসে হাওড়ায় বদলি হন। ১৮৮২, এপ্রিল মাসে অবসর গ্রহণ করেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্ম্মদেবী', 'শূরসুন্দরী', 'কুমারসম্ভব', 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী', 'কাঞ্চীকাবেরী' উল্লেখযোগ্য।

১৩ মে, ১৮৮৭ তিনি পরলোকগমন করেন।

রাজনারায়ণ বসু

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বোড়াল গ্রামে ১৮২৬-এর ৭ সেপ্টেম্বর রাজনারায়ণ বসুর জন্ম। পিতা নন্দকিশোর বসু। প্রথমে হেয়ার স্কুলে, পরে হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আনন্দকৃষ্ণ বসু, গিরিশচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত তাঁর সহপাঠী ছিলেন। কলেজের পাঠ শেষ করে সেপ্টেম্বর, ১৮৪৫ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ইংরেজি অনুবাদকের পদে যোগ দেন। ১৮৪৮-এ উক্ত পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৮৪৯-এর মে মাসে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি শিক্ষকের পদে যোগ দেন। ১৮৫১-র ফেব্রুয়ারি মাসে মেদিনীপুরের সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ডিসেম্বর, ১৮৬৮ চাকরি থেকে অবসরগ্রহণ করেন।

মেদিনীপুরে থাকাকালীন সেখানকার বিভিন্ন সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিজ স্কুলে বিতর্ক সভার প্রতিষ্ঠা, শ্রমজীবীদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য নৈশ বিদ্যালয় এবং সুরাপান নিবারণী সভা, মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরী এবং বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি।

তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব', 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত', 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা', 'সেকাল আর একাল', ইত্যাদি হল প্রধান।

১৮৯৯, ১৮ সেপ্টেম্বর দেওঘরে তিনি পরলোকগমন করেন।

শিবচন্দ্র দেব

২০ জুলাই, ১৮১১ হুগলী জেলার কোন্নগরে শিবচন্দ্র দেবের জন্ম হয়। পিতা ব্রজকিশোর দেব। গ্রাম্য পাঠশালাতেই প্রথম পড়াশুনা শুরু হয়। ১০ বছর বয়সে, এক আত্মীয়ের সাহায্যে ইংরেজি শিক্ষা শুরু করেন। ১ আগস্ট ১৮২৫ হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। ডিরোজিওর অন্যতম প্রধান শিষ্য। চাকরি জীবনের প্রথমে ৩০্ টাকা বেতনে জি টি. সারভে অফিসে কম্পিউটারের কাজে নিযুক্ত হন। পরে উড়িষ্যার বালেশ্বরে (১৮৩৮) এবং ২৪ পরগনার আলিপুরে (১৮৫০) ডেপুটি কালেক্টরের কাজে যোগ দেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় কোন্নগর হিতৈষী সভা (১৮৫২), কোন্নগর ইংরেজি স্কুল (১৮৫৪) এবং বাংলা স্কুল (১৮৫৮), বালিকা বিদ্যালয় (১৮৬০), কোন্নগর ডাকঘর (১৮৫৮) এবং হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় (১৮৮৩) স্থাপিত হয়।

মেদিনীপুর ব্রাহ্ম সমাজ (১৮৪৬) এবং কোন্নগর ব্রাহ্ম সমাজের (১৮৬৩) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনিই।

১২ নভেম্বর, ১৮৯০ তাঁর মৃত্যু হয়।

শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়

প্রথম চাকরি জীবনে জনাই ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ১৮৫৯-এ শান্তিপুরের ডেপুটি ইনস্পেক্টর অব্ স্কুলস পদে যোগ দেন। ১৮৬৩-র মে মাস পর্যন্ত তিনি শান্তিপুরেই ছিলেন। পরে নদীয়ার ডেপুটি ইনস্পেক্টর অব্ স্কুলস পদে বদলি হন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ঐ পদেই নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৭৭-এর ৩. জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি বেথুন সোসাইটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় শোক প্রকাশ করে বলা হয়ঃ—

"আমরা নদীয়ার ডেপুটি ইনস্পেক্টার অব্ স্কুলস শ্রীপতি মুখার্জীর মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখিত। ভদ্র ব্যবহার ও নিজের চরিত্রগুণে তিনি সবার কাছে প্রিয় ছিলেন এবং কর্মদক্ষতার জন্য চাকরি স্থলে ত'ার যথেষ্ট সুনাম ছিল। বর্তমানে নিম্নতম সরকারী বিভাগে দক্ষ লোকের খুবই অভাব, তাঁর মৃত্যুতে সেই স্থান পূর্ণ হওয়ার আশা কম।"

রচিত গ্রন্থ 'বাল্যবিবাহ নাটক' (১৮৬০)। 'জ্ঞানদর্শন' (১৮৫ .) নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১৮৮২-এর ১২ ফেব্রুয়ারি ২৪ পরগনার নিমতা গ্রামে সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। পৈতৃক বাস ছিল বর্ধমান জেলার চুপী গ্রামে। পিতা রজনীনাথ দত্ত এবং পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্ত। ১৮৯৯-এ কলিকাতা সেণ্ট্রাল স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং ১৯০১-এ জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ থেকে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা' ১৯০০-র ১৩ জুন প্রকাশিত হয়। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'সন্ধিক্ষণ', 'বেণু ও বীণা', 'হোমশিখা', 'তীর্থরেণু', 'ফুলের ফসল', 'কুহু ও কেকা', 'চীনের ধূপ' উল্লেখযোগ্য। ১৯২২-এর ২৫ জুন তিনি পরলোকগমন করেন।

নির্দেশিকা